স্বপন আদনান
অর্থশাস্ত্র ও নৈতিকতা: বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি

এম.এ. সাত্তার মন্ডল
কৃষির রূপান্তর, কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

হায়দার আলী খান
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্যফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও পরনির্ভরশীল দেশগুলোর সংকট

আবুল বারকাত
বিপর্যস্ত অর্থনীতি শাস্ত্র: বিপর্যয় কোথায় ও কী করা?

অজয় কুমার বিশ্বাস
অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র: প্রেক্ষিত মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

আবদুল আউয়াল মিন্টু
অর্থনীতি ও নৈতিকতা

গীতা রানী দাস
অর্থনীতি ও নৈতিকতা

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ: কিছু নৈতিক প্রশ্ন

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
দূষণ অর্থনীতি, নৈতিকতা, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ

সাজ্জাত আলম খান
অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন
শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি: টেকসই উন্নয়নে এ যেন এক অশনি সংকেত

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের পর্যালোচনা)

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ
রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১: শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা)

হান্নানা বেগম
জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
নারী নিগ্রহ, ন্যায্যতার সংকট এবং নারীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
চিকুনগুনিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি: আমাদের অর্থনীতিতে এর অভিঘাত ও কিছু নৈতিক প্রশ্ন

ISSN 2227-3182

BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

VOLUME 33 NUMBER 2
DECEMBER 2017

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

ISSN 2227-3182

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 33, NUMBER 2, DECEMBER 2017

Abul Barkat
Editor

Bangladesh Economic Association
4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000
Phone : 9345996, Fax : 880-2-9345996
E-mail : bea.dhaka@gmail.com
Website : www.bea-bd.org

// বাংলাদেশ জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি

তেত্রিশ খণ্ড, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদক

ড. আবুল বারকাত

সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটি

অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেন

অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	কার্যকরী সম্পাদক
অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভুঁইয়া	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মামুন	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০

টেলিফোন ঃ ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬

ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com

ওয়েব সাইট : www.bea-bd.org

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 33, NUMBER 2, DECEMBER 2017

Editor
Dr. Abul Barkat

Editorial Advisory Board
Professor Dr. Amartya Sen
Professor Dr. Nurul Islam
Professor Dr. Anisur Rahman
Professor Rehman Sobhan
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Professor Sanat Kumar Saha
Professor Dr. Muinul Islam
Professor Dr. Ashraf Uddin Chowdhury
Professor Dr. M. A. Sattar Mandal

Editorial Board

Professor Dr. Abul Barkat	Editor
Professor Dr. Ayubur Rahman Bhuiyan	Member
Professor Tofazzal Hossain Miah	Member
Professor Dr. Mohammad Mamoon	Member
Professor Dr. M. Moazzem Hossain Khan	Member
Professor Subhash Kumar Sengupta	Member

Bangladesh Economic Association

- Bangladesh Journal of Political Economy is published by the Bangladesh Economic Association.
- No responsibility for the views expressed by the authors of articles published in the Bangladesh Journal of Political Economy is assumed by the Editors or the Publisher.
- Bangladesh Economic Association gratefully acknowledges the financial assistance provided by the Goverment of the People's Republic of Bangladesh towards publication of this volume.
- The price of this volume is Tk. 200, US $ 15 (foreign). Subscription may be sent to the Bangladesh Journal of Political Economy, c/o, Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000. Telephone: 9345996. Website : www.bea-bd.org E-mail : bea.dhaka@gmail.com Members and students certified by their concerned respective institutions (college, university departments) may obtain the Journal at 50% discount.

Cover design by:
Syed Asrarul Haque (Shopen)

Printed by:
Agami Printing & Publishing Co.
27 Babupura, Nilkhet,
Dhaka-1205, Phone: 01971 118 243

BEA Executive Committee 2018-19

President
Abul Barkat

Vice- Presidents
A Z M Saleh
Hannana Begum
Mohmmad Abul Hossain
A.F.M. Shariful Islam
Md. Abdul Hannan

General Secretary
Jamaluddin Ahmed

Treasurer
Md. Mostafizur Rahman Sarder

Joint Secretary
Md. Liakat Hossain Moral
Badrul Munir

Assistant Secretary
Md. Mozammel Haque
Sahanara Begum
Meherunnesa
Nawshad Mustafa
Sk. Ali Ahmed Tutul

Members
Ashraf Uddin Chowdhury
M. Moazzem Hossain Khan
Mohammad Mamoon
Md. Saidur Rahman
Syeda Nazma Parvin Papri
Md. Alamgir Hossain Bhuiya
S M Rashidul Islam
Md. Jahangir Alam
Syed Asrarul Haque
Nesar Ahmed
Md. Habibul Islam
Monsur M. Y. Chowdhury
Subhash Kumar Sengupta
Partha Sarathee Ghosh

সম্পাদকীয়

আমাদের যাপিত জীবনে, কর্মে-মননে বোধোয়নের প্রথম পাঠ নৈতিকতা। আক্ষেপের বিষয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবন থেকে সুনীতি এখন নির্বাসিত। পরিবর্তে স্থান পেয়েছে কু-নীতি, অনাচার ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি। এই কালোছায়া সবার চেতনার আঙিনায়। এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির উপায় কী?

এই সীমাবদ্ধতা জেনেই মুক্তির উপায় অন্বেষণে এবং সঠিক নির্দেশনার প্রয়োজনে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হলো "বাংলাদেশ জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি ২০১৭"।

শুধু প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, বরেণ্য গবেষক নন, তরুণ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর লেখায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। সমাজ বিজ্ঞানের নানা শাখায়-স্তরে যাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, নীতি-নৈতিকতা নিয়ে অহর্নিশ ভাবেন তাঁরাই এতে লিখেছেন, অনাগত কোনো শঙ্কায় কিংবা নিষ্কলুষ প্রত্যাশায়। নিজ অবস্থান থেকে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নৈতিকতাকে তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন অনুপুঙ্খ। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁদের কেউ কেউ ঈর্ষণীয় শ্রদ্ধার অধিকারী। এই জার্নালেও নানা মাত্রিকতায় বর্ণিল-সমৃদ্ধ তাঁদের লেখা সুনীতি এবং কুনীতির বিশেষ পরিক্রমা।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁদের মননদীপ্ত প্রকাশভঙ্গি, লেখার এই বৈচিত্র্য, উদ্ভাস আমাদের আশান্বিত, আলোকিত করবে। অজস্র আপন ভাবনার এই অন্যপ্রকাশ নিঃসন্দেহে মনন-চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পথচলায় সঠিক নির্দেশনা দেবে। গ্রহণ-বর্জনের নিশ্চিত বিষয়টিও মনে করিয়ে দেবে বাংলা ভাষায় লেখা সমিতির এই জার্নাল। নিরেট তত্ত্ব ও তথ্যের বুনোট, এই উজ্জ্বল লেখাগুলোর জন্য লেখকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অর্থনীতিশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের শুধু অন্যতম শাখা নয়; এর শেকড় দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের অনেক গভীরে প্রোথিত, সুবিন্যস্ত। সেই অর্থে, অর্থনীতি চর্চায় নীতি-নৈতিকতা কতটুকু আলিপ্ত এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। নিজস্ব উপলব্ধির প্রতিফলন এইসব লেখা সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই দারুণ সংকটে, বিশেষ কাল-পর্বে কর্মময় জীবনে নৈতিকতার চর্চা নিয়ে ভাবতে শেখাবে। যে-কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনে, যুগের ইতিহাস বদলানোর জন্য লেখকরা মনের বৃহত্তর আঙিনায় চেতনার, অন্তর্জগতের আলো ফেলেছেন ওই প্রত্যাশায়।

স্বতোৎসারিত ভাবনার নির্যাসে অভিসিঞ্চিত এইসব লেখার কোনোটিই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়; সেটিই স্বাভাবিক। অনেক প্রবন্ধই অগণন লেখার ভিড়ে কখনোই হারিয়ে যাওয়ার নয়। লেখায় অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে অর্থশাস্ত্র ও নৈতিকতা: ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অর্থনীতি, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্যফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ। বিপর্যস্ত অর্থনীতিশাস্ত্র সম্পর্কে প্রবন্ধকার তথ্যনিষ্ঠ সন্ধান করেছেন বিপর্যয়ের উৎস ও সমাধানের উপায়। এছাড়াও, অর্থনীতিশাস্ত্রে নৈতিকতার বিধিমালা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এমন বিষয়ে নৈতিকতার গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে কারো কারো লেখায়। এখন প্রকৃষ্ট সময় নির্দ্বিধায় স্বীকার করার: আমাদের নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এই উপলব্ধিবোধ আগামী দিনে পথ দেখাবে।

শুধু এদেশে নয়, বিশ্বজুড়েই এখন নৈতিকতার গভীর সংকট, দারুন অবক্ষয় চলছে যা অর্থনীতিশাস্ত্রের নিরলস চর্চায় আমাদের আশাহত-উদ্বিগ্ন করে, বিরামহীন প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাই, এই জার্নালে প্রাধান্য পেয়েছে সুনীতির গুরুত্ব। এই লেখাগুলো যেন একটি প্রধান নদীর নানা টুকরো, কিন্তু অভিন্ন গতিপথ 'নৈতিকতা'। নদী যুগে যুগে স্থান বদলায়, এমনকি পালটে যায় তার উৎসমুখ। নৈতিকতার ধারণাও তেমনি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে; আমরা প্রতিনিয়ত সরে যাচ্ছি সঠিক অবস্থান, সুনীতির চর্চা থেকে।

নৈতিকতা নিয়ে এক ঝাঁক লেখক জার্নালের পাতায় তুলে ধরেছেন আপন ভাবনা; অভিনন্দন তাঁদের। সমিতির সম্মানিত সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি এবং শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা। এই সংখ্যায় গ্রথিত সবকটি প্রবন্ধ যথারীতি পর্যালোচিত এবং সম্পাদকীয় পর্ষদের অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা হলো। এই জার্নাল হোক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গর্ব ও ঐশ্বর্য।

সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি ও
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষান্মাসিক জার্নাল
Bangladesh Journal of Political Economy
প্রকাশনার নীতিমালা

১। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়নের জন্য প্রবন্ধকারদেরকে অনুরোধ জানানো হবে। ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় রচিত প্রবন্ধ জার্নালের জন্য গ্রহণ করা হবে।

২। Initial screening নির্বাহী সম্পাদকের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে, তবে প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহায়তা তিনি নেবেন। নির্ধারিত format মোতাবেক সংশোধনের জন্য এই পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে short-listed প্রবন্ধসমূহ প্রবন্ধকারের কাছে প্রেরণ করা হবে।

৩। অভ্যন্তরীণ reviewer সাধারণত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত হবেন। বহিঃস্থ reviewer সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রবন্ধের বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত হবেন, তবে তিনি দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে অবস্থান করতে পারেন। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্য reviewer হতে পারবেন। তৃতীয় reviewer প্রয়োজন হলে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত করা হবে।

৪। ক) সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো referral প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জার্নালের জন্য বিবেচিত হবে।

খ) বিভিন্ন সময়ে সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত আমন্ত্রিত প্রবন্ধসমূহ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।

৫। অর্থনীতি সমিতির সদস্য এবং সদস্য-বহির্ভূত যে কোন আগ্রহী প্রার্থী জার্নালের গ্রাহক হতে পারবেন। তবে সদস্যদের ক্ষেত্রে গ্রাহক ফি (subscription fee) পঞ্চাশ শতাংশ রেয়াত দেয়া হবে।

৬। জার্নালের footnoting এবং writing style এতদ্সঙ্গে সংযোজিত হলো (জার্নালের শেষাংশ)।

৭। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদেরকে বছরে দু'বার সম্পাদনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৮। ক) তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মুদ্রক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

খ) প্রথম proof প্রেস দেখবে, পরবর্তীতে softcopy তে প্রবন্ধকার ফাইনাল proof দেখে দেবেন।

বাংলাদেশ জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি

তেত্রিশ খণ্ড, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০১৭

সূচীপত্র

১. অর্থশাস্ত্র ও নৈতিকতা: বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি ১
স্বপন আদনান

২. কৃষির রূপান্তর, কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ২৭
এম.এ. সাত্তার মন্ডল

৩. সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্যফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও পরনির্ভরশীল দেশগুলোর সংকট ৩৩
হায়দার আলী খান

৪. বিপর্যস্ত অর্থনীতি শাস্ত্র: বিপর্যয় কোথায় ও কী করা? ৫১
আবুল বারকাত

৫. অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র: প্রেক্ষিত মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ৬১
অজয় কুমার বিশ্বাস

৬. অর্থনীতি ও নৈতিকতা ৭৫
আবদুল আউয়াল মিন্টু

৭. অর্থনীতি ও নৈতিকতা ৯৫
গীতা রানী দাস

৮. বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ: কিছু নৈতিক প্রশ্ন ১০৩
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

৯. দূষণ অর্থনীতি, নৈতিকতা, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ ১১৭
মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার

১০. অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ১৬৩
সাজ্জাদ আলম খান

১১. শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি: টেকসই উন্নয়নে এ যেন এক অশনি সংকেত ১৭৭
মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন

১২. বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের পর্যালোচনা) ১৯১
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

১৩. রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১: শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা ২২৩
বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ

১৪. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা) ২৩৫
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

১৫. জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা ২৬৫
হান্নানা বেগম

১৬. নারী নিগ্রহ, ন্যায্যতার সংকট এবং নারীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ২৮৫
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

১৭. চিকুনগুনিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি: আমাদের অর্থনীতিতে এর অভিঘাত ও কিছু নৈতিক প্রশ্ন ২৯৭
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 001-026
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থশাস্ত্র ও নৈতিকতা: বাংলাদেশে ভূমি গ্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি

স্বপন আদনান*

১. ভূমিগ্রাস, ধনার্জন ও নৈতিকতা

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত বৈষয়িক স্বার্থে পরিচালিত হয়ে। তবে, তার মধ্যেও সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে। বিদ্যমান আইন ও ন্যায়নীতির কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগসহ অর্থব্যবস্থার (economy) যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের এই আদর্শ চিত্র এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান অনেক। দুর্নীতি এবং অন্যান্য কার্যকলাপ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অর্থশাস্ত্রের (economics) সাথে সুনীতি (ethics) ও নৈতিকতার (morality) সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আজকের আলোচনায় আমি বিশেষ করে ভূমিগ্রাসের (land grabs) নানাবিধ প্রক্রিয়া এবং কলাকৌশলের দিকে নজর দেবো। ভূমিগ্রাস বা হস্তান্তরের ফলে সার্বিক ভূমি বণ্টনে (distribution) পরিবর্তন ঘটে। পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার (redistributive land reform) যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভূমিসত্ব এবং ভূমি অধিকারে সমতা আনার চেষ্টা করে, সেখানে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় তার ফলাফল উল্টো। যেহেতু ভূমিগ্রাস করতে পারে শক্তিশালী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ, সেহেতু এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণত সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মানুষ। ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া সাধারণত সম্পদ বণ্টনে (asset distribution) বৈষম্য সৃষ্টি করে, যার ফলে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়তে পারে। এই যুক্তিতে ভূমিগ্রাসকে সাধারণভাবে অনৈতিক (unethical) বিবেচনা করা যায়।

এই সিদ্ধান্তটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং কলাকৌশল আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এ জন্য আলোচনায় ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় শক্তি ও সহিংসতার ব্যবহার, এবং দুর্নীতি ও জালিয়াতির প্রভাব, বিশ্লেষণ করবো। এর ফলে এসব কলাকৌশলের সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ভূমি সংক্রান্ত আইনকানুন ও ভূমি অধিকার বণ্টন এবং পুনর্বণ্টনের ক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতেই ন্যাস্ত। অন্যদিকে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নানাধরনের কায়েমী স্বার্থ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ কোনো শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মকাণ্ড

* প্রাক্তন অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর।

বৈষম্যমূলক এবং অন্যায্যভাবে পরিচালিত হতে পারে। অতএব, ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা কতটুকু নৈতিক ও ন্যায্য তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীও ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগ করে সহিংসতা কিংবা জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ভূমি দখলের অভিযোগ আছে। অতএব, ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভূমি দখল করার পেছনে নানা ধরনের স্বার্থ কাজ করতে পারে। সমাজের যাবতীয় শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ও ভূমিকার সাথে বিভিন্ন ধরনের ধনার্জনের (accumulation) প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গেলে রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, আদি ধনার্জন (primitive accumulation), পুঁজিবাদী ধনার্জন এবং অন্যান্য ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) মধ্যে পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা দরকার। এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে বহু বিচিত্র ধরনের ভূমিগ্রাসের ঘটনাকে একটি বিশ্লেষণের ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতে পারে।

এসব প্রাথমিক প্রস্তাবনার ভিত্তিতে আমি সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনা শুরু করছি। এখানে নৈতিকতা ও ধনার্জন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে প্রশ্ন ও বিবেচনাগুলো তুলে ধরা হলো, প্রবন্ধের শেষ অংশে সেগুলো নিয়ে আমার বিশ্লেষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করবো।

২. ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক পরিবর্তন

বাংলাদেশে বহুকাল ধরেই ভূমি দখল ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলে আসছে বিভিন্ন কায়দায়। লাঠিয়াল বাহিনীর জোর খাটিয়ে চর দখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি খাটিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার দায়ে কৃষকের বন্ধক রাখা জমি মহাজনের হাতে চলে যাওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক।

ভূমিগ্রাসের এসব প্রচলিত পদ্ধতির সাথে আরও নতুন কিছু কলাকৌশল যোগ হয়েছে সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের (neoliberal globalization) প্রভাব বাড়তে শুরু করার পর থেকে ভূমির দাম এবং ভূমি ব্যবহারের (land use) ধরনেও বেশ কিছু গুণগত (qualitative) পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার (economy) ওপর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (structural adjustment) কর্মসূচির বিভিন্ন শর্ত আরোপ শুরু করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund), বিশ্বব্যাংক, এবং অন্যান্য বিদেশী দাতা সংস্থা (সোবহান ২০০৭: ৩৩২-৩৩৩; আদনান ২০১৩: ১০৫)। এর ফলে যেসব নয়াউদারবাদী নীতির প্রবর্তন হয় তার মধ্যে ছিলো বাণিজ্য উদারীকরণ (liberalization), অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধ ক্রমশ শিথিল করা (deregulation) এবং সম্পদ ও উৎপাদনব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা (privatization)।

অর্থব্যবস্থার পরিচালনায় এসব নীতিগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলো রপ্তানীমুখী (export-oriented) বাণিজ্যিক উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় জমি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা এবং জনসাধারণের বসতবাড়ি ও জমিজমা বাণিজ্যিক

খামার এবং শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত করার জন্যে ব্যাপক সরকারি কর্মসূচি নেয়া হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভূমি ব্যবহারে এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান বসতি বা কৃষি জমি ক্রমশ বাণিজ্যিক এলাকায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এ কারণে ভূমির বাজার দাম বেড়ে যেতে থাকে এবং জমিজমা একটি মূল্যবান বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়। ফলত ভূসম্পত্তি (real estate) কেনাবেচার দালালী (brokering) ও ফটকাবাজী (speculation) বেশ লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয় (ওয়াকার ২০০৮; লেভিয়েন ২০১২; আদনান ও দস্তিদার ২০১১; আদনান ২০১৩)।

এই বিশ্ববাজারমুখী ও নয়াউদারবাদী নীতি পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র ভূমির ব্যবহার নয়, ভূমি দখলের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলেও কিছু অভিনব পদ্ধতি সংযুক্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে তাই নতুন ও পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি উভয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এ বিষয়ে তথ্য উপাত্তের (empirical) ভিত্তিতে আলোচনা করতে গেলেই তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) এবং ধারণা (concept) অপরিহার্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) চিন্তাধারায় ভূমিগ্রাস বা হস্তান্তরকে সাধারণত মার্ক্সের (১৯৭৬: ৮৭৩-৮৯৫) 'আদি ধনার্জন' (primitive accumulation) ধারণার আওতায় বিবেচনা করা হয়। তবে মার্ক্সের উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাভাবনাকে বর্তমানের নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের যুগের উপযোগী করার লক্ষ্যে হার্ভে (২০০৩: ১৪৪-১৬১) 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জনের' (accumulation by dispossession বা ABD) ধারণাটি প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া, মনে রাখা দরকার যে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আদি ধনার্জন নয়, পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার কারণেও ঘটতে পারে। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ভূমি দখলের ঘটনা কি ধরনের ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) আওতায় পড়বে তা অনুধাবনের জন্য তাত্ত্বিক কাঠামো ও নির্ভুল বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সেজন্যে ভূমিগ্রাস ও হস্তান্তরের তথ্যাবলীকে প্রথমে যে বিশ্লেষণের ছকে ফেলা হবে তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য এই প্রবন্ধের শেষ অংশে আলোচনা করবো।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন উঠে আসে যেগুলো এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই:

১. সমকালীন বাংলাদেশে কি কি ভিন্ন ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া দেখা যায়? সেগুলো কি একটা বিশ্লেষণের ছকে সাজানো সম্ভব?
২. ভূমিগ্রাসের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা কি অপরিহার্য? নাকি, বলপ্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য পন্থায় এই একই লক্ষ্য অর্জন করা যায়?
৩. সরাসরি ভূমি গ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াও অন্য ধরনের পরোক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি জমি হস্তান্তর ঘটতে পারে?
৪. সমকালীন ভূমিগ্রাসের মাধ্যমে কি পুঁজিবাদী ধনার্জন (capitalist accumulation) না আদি ধনার্জন (primitive accumulation) প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নিচের আলোচনায় দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হবে। এভাবে যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হবে তার ভিত্তিতে আরও বিস্তারিত বিবরণমূলক (descriptive) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical) আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য, এই প্রবন্ধে ভূমিগ্রাসের সব প্রাসঙ্গিক ও তাত্ত্বিক (theoretical) দিকগুলো বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে, কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি যাতে আলোচনার সামগ্রিক ব্যাপ্তি গোড়াতেই বুঝিয়ে দেয়া যায়।

প্রথমত: ভূমি গ্রাসের পেছনে শ্রেণিগত সংঘাত ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও নীতি, সাম্প্রদায়িক (communal) বিদ্বেষ, এবং অপরাধচক্রের (criminal) তৎপরতাও কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত:, যাদের জমি বেদখল হওয়ার আশংকা থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের দরকষাকষি (negotiations) কিংবা প্রতিরোধ (resistance) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিগ্রাস রুখবার চেষ্টা করতে পারে। তার সাথে উভয় পক্ষের বৈধতার (legitimacy) সংগ্রামও চলে। এসব জটিল ও বহুমাত্রিক (multi-dimensional) প্রক্রিয়া জমি দখলের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীচের আলোচনায় বিভিন্ন বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে ভূমিগ্রাসের এই জটিল মাত্রাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করবো।

এই প্রবন্ধের বাকি অংশ কয়েকটা পরিচ্ছেদে (section) ভাগ করা হয়েছে। পরের (৩নং) পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার জন্য যেসব অনুমান ও ধারণার প্রয়োজন হবে সেগুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের দখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের মধ্যে প্রকারভেদের (typology) একটা ছক উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পরের পরিচ্ছেদগুলোতে (৪, ৫, ৬ ও ৭ নং) এই প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার কলাকৌশল বাস্তব দৃষ্টান্তের তথ্যাদিসহ তুলে ধরা হয়েছে। শেষ (৮নং) পরিচ্ছেদে এই বিশ্লেষণের মূল সিদ্ধান্তগুলোকে একত্র করে উপসংহার টানা হয়েছে। তার সাথে ভূমি গ্রাসের মাধ্যমে সমকালীন বাংলাদেশে কি কি ধরনের ধনার্জন প্রক্রিয়া (accumulative process) পরিচালিত হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

৩. আলোচনার ছক

ভূমি বেদখলের সংজ্ঞা

ভূমিগ্রাস নিয়ে আলোচনার জন্য যে ধারণাগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন সেগুলো গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

কোনো এক পক্ষের জমি অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হবার প্রক্রিয়া প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঘটতে পারে অথবা আইনবহির্ভূত বা সহিংস কৌশলেও হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় ঘটে সেগুলোকে ভূমি 'দখল' বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর বিপরীতে, যেসব ক্ষেত্রে জমি জোর করে বা অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোকে ভূমি 'বেদখল' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। জমি দখল এবং বেদখল উভয় প্রক্রিয়াকে একসাথে নির্দেশ করার জন্য 'ভূমিগ্রাস' (land grabs) শব্দবন্ধটি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

এখানে 'ভূমি' বলতে আবাদী জমি ছাড়াও বনভূমি, চারণভূমি, জনবসতি, জলাভূমি, ভূগর্ভস্থ পানি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এসব সম্পদ বেদখল হলে তা ভূমি গ্রাসের (land grab) ধারণার আওতায় আসবে। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে (special case) পরিবেশ রক্ষার যুক্তিতে ভূমিগ্রাস করা হয় সেগুলোকে 'green grabs' বা 'প্রাকৃতিক দখল' বলা হয়ে থাকে (ফেয়ারহেড ও অন্যান্য ২০১২)।

সমকালীন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই জমিজমার সঠিক দালিলিক প্রমাণাদি থাকে না। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভূমি অধিকারের প্রচলনও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, এজমালি, প্রথাগত (customary), সম্মিলিত বা সর্বজনের (common) এমন নানা ধরনের জমি মালিকানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া, অনেক জমির রেকর্ড করা মালিকানা এক পক্ষের নামে থাকলেও বাস্তবে অন্য কোনো পক্ষ সে জায়গাটা দখল করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন, অনেক সরকারি খাস জমি কার্যত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের দখলে রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দালিলিক অধিকারের বদলে সামাজিক ও প্রথাগত রীতি অথবা মৌখিক চুক্তি বা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জমির নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এসব বিভিন্ন কারণে জমিগ্রাসের সকল ঘটনা শুধুমাত্র মালিকানাসত্ত্ব (*de jure* ownership rights) দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে পুরোপুরি বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দখলিসত্ত্বের (*de facto* possessory or occupancy rights) ভিত্তিতে ভূমি হস্তান্তর ঘটে। নিচের আলোচনায় জমির মালিকানাসত্ত্ব কিংবা দখলিসত্ত্বের যে কোনো একটার হস্তান্তর ঘটলেই সেটাকে ভূমিগ্রাস হিসেবে গণ্য করা হবে।

বর্তমানে বহু ধরনের দেশিবিদেশি এবং সরকারি ও বেসরকারি শক্তি বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসে লিপ্ত। সরকারি দখলদারদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী, উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি। অন্যদিকে, যেসব বেসরকারি (private বা non-state) শক্তি ভূমি গ্রাসে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে আছে কিছু দেশি ও বিদেশি কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়িক এনজিও (NGO), তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণির এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, শাসক গোষ্ঠী (elites), ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রায় সর্বজনীন। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রতিবেশী, পাড়াপড়শী, বা গ্রামবাসীর হাতেও সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গাজমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সব সময় চলমান প্রক্রিয়াকে 'প্রাত্যহিক ভূমিগ্রাস' (everyday land grabs) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (ফেল্ডম্যান ২০১৬, ফেল্ডম্যান ও গাইসলার ২০১২: ৯৭১)।

ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের প্রকারভেদ

ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ পড়লে অনেক রকমের কলাকৌশল বা পদ্ধতি চোখে পড়ে। এসব দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণের ছকে আনতে গেলে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার কয়েকটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা দরকার।

প্রথমত: দেখতে হবে যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস করা হচ্ছে কি না। অনেক ক্ষেত্রে জবরদখল করার জন্য লাঠিয়াল বা মাস্তান বাহিনী ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে সহিংস (violent) শক্তিপ্রয়োগ বলা যায়। কিন্তু, খোলাখুলি সহিংসতা ছাড়াও শক্তি প্রয়োগ ঘটে যখন রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারি নিয়মনীতি প্রয়োগ করে 'পরিচ্ছন্ন আইনি কায়দায়' কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার হরণ করা হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় কোনো শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই অন্য কৌশল ব্যবহার করে ভূমিগ্রাসের বাস্তব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ (direct) অথবা পরোক্ষ (indirect) হতে পারে। যখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের জমি *সরাসরি* নিয়ে নেয় সেটাকে *প্রত্যক্ষ* ভূমিগ্রাস বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাঠিয়াল দিয়ে চর দখল করা। অথবা রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন করে কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকার বাতিল করে সেগুলো রাষ্ট্রের আওতায় নিয়ে আসা। এর বিপরীতে, এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ভূমিগ্রাস নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর কার্যকারণে (structure of causation) যে ঘটনাপরম্পরা সৃষ্টি হয় তাতে শেষ পর্যন্ত সেই গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার অন্য কারও হাতে চলে যেতে পারে। এ ধরনের কার্যকারণ প্রক্রিয়াকে *পরোক্ষ* ভূমিগ্রাস বলা যায়। বাংলাদেশে এমন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে ।

এই দুই জোড়া মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করলে চার ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি প্রকারভেদের (typology) ছক দাঁড় করানো যায় (আদনান ২০১৬: ৭):

ওপরের ছকে বল প্রয়োগ করে যেসব কায়দায় ভূমিগ্রাস করা হয়, সেগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে পুনরায় ভাগ করা (sub-divide) হয়েছে। অনুরূপভাবে, বল প্রয়োগ ছাড়া ভূমিগ্রাসের বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ

ভূমি গ্রাসের ধরন	প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া	পরোক্ষ প্রক্রিয়া
বলপ্রয়োগসহ	১. প্রত্যক্ষ ও বলপ্রয়োগসহ	২. পরোক্ষ ও বলপ্রয়োগসহ
বলপ্রয়োগ ছাড়া	৩. প্রত্যক্ষ ও বলপ্রয়োগ ছাড়া	৪. পরোক্ষ ও বলপ্রয়োগ ছাড়া

ও পরোক্ষ পদ্ধতির ভিন্নতাও ওপরের ছকে স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভূমিগ্রাসের অভিজ্ঞতায় এই চার ধরনের প্রক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিচের আলোচনায় বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভূমিগ্রাসের এই ক'টি মৌলিক প্রক্রিয়া এবং সেগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস

প্রত্যক্ষভাবে শক্তি প্রয়োগ করাটাই সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের সবচেয়ে প্রধান ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই বলপ্রয়োগ কখনও সহিংস রূপ নেয় এবং কখনও হয় প্রশাসনিক ও আইনি পদ্ধতির (administrative and legal procedure) মাধ্যমে। এ রকম বলপ্রয়োগ করে ভূমিগ্রাসের পদ্ধতি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা উভয়েই ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের ভূমিকা প্রথমে আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সচরাচর যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে প্রধান দু'টো হচ্ছে: অধিগ্রহণ (acquisition) এবং নিরাপত্তায়ন (securitization)।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ঘটে যখন সরকার আইন ব্যবহার করে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জমি নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসে। সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা উভয়ের জন্যেই রাষ্ট্রের প্রশাসন এভাবে অধিগ্রহণ করে জায়গার ব্যবস্থা করে থাকে।

এই কাজের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন হচ্ছে ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ'। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ-দমন (counter-insurgency) কর্মসূচির

প্রেক্ষাপটে আরও একটা কঠোর আইন ব্যবহার করা হয়: ১৯৫৮ সালের '(ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন' ('Regulation')। এছাড়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির (CHT Regulation 1900) বিভিন্ন ধারাও এই অঞ্চলে ভূমি অধিকার হস্তান্তরের প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[১]

এসব বিভিন্ন অধিগ্রহণ আইনের অন্তর্গত একটি মৌলিক নীতি (principle) হলো ভূমি সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা এখতিয়ার সর্বোচ্চ (eminent domain)। এই ক্ষমতার বলে যে কোনো জমির ওপর বিদ্যমান সব অধিকারকে নাকচ করে দিয়ে রাষ্ট্র 'জনস্বার্থে' (public purpose) সেই এলাকা নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যাদের জমি নেয়া হয় রাষ্ট্র তাদের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণের পর সেই জায়গা অন্য যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি (প্রাইভেট) প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দ (allot) করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের রয়েছে।

অবশ্য, এসব আইনে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় তাদের জন্য সীমিত ক্ষতিপূরণের (compensation) এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, বিকল্প জায়গায় আংশিক পুনর্বাসনের (rehabilitation) ব্যবস্থা থাকতে পারে। তবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা থাকলেও সেটার বাস্তবায়নে কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। যাদের মালিকানাসত্ত্বের (ownership rights) দলিল প্রমাণাদি আছে সরকারি আইনে শুধুমাত্র তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। ফলে, যাদের শুধুমাত্র দখলিসত্ত্ব (possessory or occupancy rights) আছে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকার করে না। এছাড়া, যাদের মালিকানা বা দখলিসত্ত্ব কোনোটাই নেই, কিন্তু যারা অধিগ্রহণকৃত জমি তাদের জীবিকার জন্য ব্যবহার করে (যেমন, গরু চরানো, মাছধরা বা কাঠখড় কুড়ানো), বিদ্যমান আইন তাদেরও ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচনা করে না। উপরন্তু, মালিকানাসত্ত্বের ভিত্তিতে যাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া স্বীকৃত তাদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের চেয়ে কম হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় কিংবা দুর্নীতির মারপ্যাঁচে ফেলে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় (আদনান এবং অন্যান্য ১৯৯২:৪১-৪৫; ১৯৯৪:৩৬-৩৯)।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে রাষ্ট্র ভূমি অধিগ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো সরকারি সংস্থাসমূহের প্রকল্প এবং কার্যক্রমের স্থাপনার জন্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকারের বন বিভাগ হচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহত্তম ভূমি দখলকারী সংস্থা। বিগত দশকগুলো একসাথে ধরলে পার্বত্য চট্টগ্রামেই বন বিভাগ ২ লক্ষ একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বেআইনীভাবে উৎখাত করে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৮-৫৬)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, কক্সবাজার, বান্দরবান, পাবনা এবং নোয়াখালী জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমের জন্য ব্যাপক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ২০১৭; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। এটাও বেশ আশ্চর্য যে, আইনের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ করার এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সেটা মেনে চলে না (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৫-৬০)। ভূমি অধিগ্রহণের সময় যেসব

১. এসব বিদ্যমান আইনের বদলে ভূমি অধিগ্রণের জন্য একটি নতুন এবং 'আধুনিকায়িত' বিধি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এর সম্ভাব্য শিরোনাম হবে: 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭'।

সরকারি সংস্থাগুলোর আইন রক্ষা করার কথা তারাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে রক্ষকের বদলে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের 'বিশেষ' (special) অর্থনৈতিক অঞ্চল বা জোন (Zone) স্থাপনের জন্য নির্ধারিত এলাকা দখল করা বা কিনে ফেলা। এ অঞ্চলগুলো সরকারি অথবা বেসরকারি মালিকানায় ও উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone or SEZ), রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone or EPZ), চিংড়ি মহাল (Shrimp Zone), ইত্যাদি।

মূলত ১৯৮০-র দশক থেকে বাংলাদেশে এ ধরনের বিশেষ অঞ্চলের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয় (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১০)। ইদানিং, দেশে ১০০টা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে সরকারের মুখপাত্রেরা। ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বেসরকারি (প্রাইভেট) উদ্যোগে গোটা দশেক বিশেষ অঞ্চল গঠনের ঘোষণা পাওয়া গেছে (প্রথম আলো, ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আয়কর থেকে সাময়িক রেয়াতসহ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা (concessions) ও প্রণোদনা (incentives) ঘোষণা করেছে (মির্জা ২০১৫: ৫৩)। এ ছাড়া, অঞ্চলগুলোর (জোনের) সীমানার মধ্যে নানাবিধ বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা স্থাপনের পর যে বাড়তি জায়গাজমি থাকবে সেগুলোতে 'পেজান' কর্তৃপক্ষ ও ডেভেলপাররা (developer) বিত্তশালীদের জীবনযাত্রার (life-style) সাথে মানানসই বিনোদন ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। যেমন: অভিজাত আবাসিক এলাকা, শপিং মল বা সুপার মার্কেট, বিলাসবহুল হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, গল্ফ (golf) ও অন্যান্য ক্রীড়ার জন্য নির্ধারিত এলাকা, প্রাইভেট হাসপাতাল এবং স্কুল, কলেজ ইত্যাদি (সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; প্রথম আলো, ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এ ধরণের ভূমি ব্যবহার (land use) বৃদ্ধি পেলে এই বিশেষ অঞ্চলগুলোর ভেতরে এবং চারপাশে বাণিজ্যিক ভূমি বেচাকেনা এবং ভূসম্পত্তি (real estate) নিয়ে ফটকাবাজী (financial speculation) একই সাথে উৎসাহিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২০০৩ সালে নোয়াখালীতে চিংড়ী মহাল (Shrimp Zone) ঘোষণার পর বেদখলকৃত জমির একাংশ সম্ভাব্য রিয়াল এস্টেট কেনাবেচা এবং ফটকাবাজীর মুনাফার আশায় দখলদার গোষ্ঠীকে ফেলে রাখতে দেখা যায় (আদনান ২০১৩: ১২০-১২২)। ভারতেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (Special Economic Zones) জন্য অধিগ্রহণ করা ভূমি এবং তার চারপাশে উচ্চবিত্তের আবাসন নির্মাণ ও লগ্নী পুঁজির ফটকাবাজীর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় (সাম্পাত ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮৮-৫৮৯; লেভিয়েন ২০১২: ৯৩৪; আদনান ২০১৪: ২৯)।

সরকারি সংস্থা ছাড়া প্রাইভেট কোম্পানী ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার জন্যেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র জমি অধিগ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সরকার প্রথমে তার সর্বোচ্চ এখতিয়ারের (eminent domain) ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং জনস্বার্থের (public interest) যুক্তি দেখিয়ে জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীতে, রাষ্ট্র সেই জমি কোনো বাণিজ্যিক বা প্রাইভেট সংস্থাকে চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করে বা ইজারা দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রথমে স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। তারপরে সেই জমি বহুজাতিক কর্পোরেশন ইউনোকাল (Unocal)-কে ইজারা (lease) দেয় প্রশাসন। পরবর্তীতে, ইউনোকালের কাছ থেকে গ্যাসক্ষেত্রের এলাকাটি শেভ্রন (Chevron) নামের আরেকটি বহুজাতিক কর্পোরেশেনের হাতে চলে যায় (গার্ডনার ২০১২: ৮৭; গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

ভূমি অধিগ্রহণের আইন প্রয়োগ ছাড়াও এই বহুজাতিক গ্যাস কোম্পানীকে নির্বিবাদে জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনী স্থানীয় মানুষের ওপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিবাদ মিছিল (protest demonstrations) এবং রাস্তা বন্ধ (road blockade) কর্মসূচিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে কঠোরভাবে দমন করা হয় (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬: ৫)। সে সময়কার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক পার্টির নেতাকর্মীবৃন্দ এবং সিলেটের জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এলাকার অধিবাসীদের ওপর একযোগে চাপ দেয় যাতে গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তাদের প্রতিরোধের (resistance) কারণে আটকে না যায়।

অনুরূপ ভূমিগ্রাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে, যেখানে একটি উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য রাষ্ট্র জমি অধিগ্রহণ করে এবং তা এশিয়া এনার্জী নামের একটি ভুঁইফোড় বিদেশি কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করে (মুহাম্মদ ২০১৬: ৩২-৩৩; নূরে মওলা ২০১৬: ২-৩)। এই উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য যে এলাকা বেদখল করা হয় তা ছিলো তিনফসলা আবাদী জমি। উপরন্তু, এই খনির জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। এসব কারণে ফুলবাড়িতে কয়লাখনি স্থাপন এবং জমি দখলের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর জোরালো প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য সরকার ও প্রশাসন সহিংস পুলিশী নির্যাতন চালায়, যার ফলে প্রতিবাদী মানুষের মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে (মুহাম্মদ ২০১৬, গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

এসবক্ষেত্রে, নয়াউদারবাদী রাষ্ট্রই প্রাইভেট কোম্পানির জন্য জমির দালালের (broker) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে (ভাদুড়ী ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮০; লেভিয়েন ২০১২: ৯৪১-৯৪৫; আদনান ২০১৩: ১১৭; ২০১৪: ২৯)। বস্তুত 'জনস্বার্থের' নামে এলাকাবাসী মানুষের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও সেই জায়গাগুলো পরবর্তীতে মুনাফাকামী প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থের জন্য তুলে দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অন্যায্য (unjust) এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়েছে (মির্জা ২০১৫:৫৩)। এ কারণে রাষ্ট্রের ভূমি অধিগ্রহণের বৈধতাও (legitimacy) প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্ষুণ্ন হয়েছে। রাষ্ট্রের এই ভূমিগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জন্মেছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত জনমানুষের প্রতিরোধ (people's resistance) আন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছে (আদনান ২০০৪; ২০১৩; ২০১৪)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্ভাব্য বিমানবন্দরের জন্য আরিয়াল বিলে ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রবল বিক্ষোভের কারণে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

নিরাপত্তায়নের নামে ভূমিগ্রাস

অধিগ্রহণ ছাড়াও যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যাপকভাবে ভূমিগ্রাস করেছে তা হচ্ছে নিরাপত্তায়ন (securitization) (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬)। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র (nation-state) যেসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীকে (ethnic group) নিয়ে গঠিত বলে ভাবা হয়, সেই 'কল্পিত জাতিসত্ত্বার'

(imagined community) (এ্যান্ডারসন ২০০৬) মধ্যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের দেশের প্রতি আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ হলে ক্ষমতাসীন দল বা সম্প্রদায় তাদেরকে জাতীয় নিরাপত্তার (national security) জন্য হুমকিস্বরূপ বলে দাবী করতে পারে। এবং সেই অজুহাতে তাদের জায়গাজমি আইনি কায়দায় বা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে জব্দ (confiscate) করে নেয়। এসব ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ধর্মীয় বা জাতিগত সম্প্রদায়কে সেই কল্পিত জাতিসত্ত্বার ধারণা থেকে বিযুক্ত বা বহিষ্কার করে এ ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার যথার্থতা (justification) এবং বৈধতা (legitimacy) তৈরির চেষ্টা করা হয়। সরকারি নীতি ও আইনকানুন পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনমতো রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের নিরাপত্তায়নজনিত ভূমিগ্রাস পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এভাবে আইন আর সরকারি নীতির মারপ্যাঁচে একটা সমগ্র জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দেশের 'শত্রু' বানিয়ে দেয়া হয়।

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে কোনো জনগোষ্ঠীর জমিজমা বাজেয়াপ্ত (confiscation) করতে পারে তা উপরোক্ত অধিগ্রহণ (acquisition) প্রক্রিয়া থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন, নীতি এবং শক্তিপ্রয়োগ ব্যবহার করে ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হলেও যাদের জমি নেয়া হয় তাদের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকে না। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের আলোকে রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা'-র সন্দেহবোধ দিয়ে পরিচালিত এ ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট করা যায়।

১৯৬৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়। তারপর থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে তাদের ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের সরকার 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত আইন ও অধ্যাদেশ (order) জারি করে হিন্দুদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারে নিয়ে আসে।[২] অনেকক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা প্রভাব খাটিয়ে তা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের আইন সংশোধন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জব্দ করা জমি ও সম্পদ তাদেরকে ফেরৎ দেয়া বা 'প্রত্যর্পণ' করার একটি উদ্যোগ নেয়।[৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি।

এসব ক্ষেত্রে 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক (discriminatory) আইনগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূসম্পত্তি কেড়ে নেয়ার 'পরিচ্ছন্ন আইনি কৌশল' হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার ব্যবহার করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।[৪] জাতীয় নিরাপত্তার নামে দেশের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে 'জাতির শত্রু' বানিয়ে রাষ্ট্র তাদের জমিজমা গ্রাস করার প্রশ্নবিদ্ধ 'যথার্থতাও' (justification) তৈরি করার চেষ্টা করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

---

২. এইসব আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছেঃ The Defense of Pakistan Ordinance; The Enemy Property (Custody and Registration) Order of 1965 and 1966; The East Palistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1966; The Bangladesh (Vesting of Propety and Assets) Order of 1972 (ফেল্ডম্যান ২০১৬: ৮-১০; ALRD 2015).

৩. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আইনের মধ্যে আছেঃ The Restoration of Vested Property Act 2001; The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) (Repeal) Act of 1974; The Vested Property Repeal (Amendment) Act, 2011.

৪. এসবক্ষেত্রে "ethnic belonging and nationalist exclusion are justifications for land grabs by the state" (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

নিরাপত্তায়নের (securitization) মাধ্যমে ভূমি গ্রাসের ভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে (খান ২০১৫: ২৫)। ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই পাহাড়িরা তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা ও আত্মপরিচিতি (ethnic identity) এবং ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দেনদরবার ও দরকষাকষি (negotiation) করে আসছিলো (মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ২০০৪)। কিন্তু এক পর্যায়ে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পাহাড়িদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। এর ফলে সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টিতে সমগ্র পাহাড়ি আদিবাসীরা বাংলাদেশ 'জাতিরাষ্ট্রের শত্রু' হিসেবে পরিগণিত হয়।

পাহাড়িদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-দমন রণনীতি (counter-insurgency strategy) অবলম্বন করা হয় তার একটি বিশিষ্ট কৌশল ছিলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পাহাড়িদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা থেকে উৎপাটিত করা। অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধকালীন সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই ভূমিগ্রাস ঘটে। এ কাজে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলো অধিকৃত জায়গাজমির ওপর পাহাড়িদের পূর্বতন (pre-existing) ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত (common) অধিকার (property rights) সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৬২-৬৪; আদনান ২০০৪: ৪৭-৫১)।

উপরন্তু, এই রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে উচ্ছেদকৃত পাহাড়িদের পরিত্যক্ত জমিজমা জোর করেই পুনর্বণ্টন করে দেয়া হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনকারী (in-migrating) বাঙালী বসতিস্থাপনকারী (settler) জনসমষ্টিকে, অথবা অনিবাসী (absentee) এবং শহরবাসী প্রভাবশালী মহলের (elites) মধ্যে। এভাবে ভূমিগ্রাস করার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পাহাড়িদের ঐতিহ্যলব্ধ (traditional) ভূমি অধিকার প্রায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে (রায় ১৯৯৫; মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ২০০৪; আদনান ও দস্তিদার ২০১১; খান ২০১৫)। পাহাড়িদের প্রথাগত জুমচাষ ও বনজসম্পদ সংগ্রহের এলাকাগুলো এভাবে পরিণত করা হয় বাঙালী সেটলারদের ঘরবাড়ি ও চাষবাসের জমিতে, কিংবা নগরবাসী প্রভাবশালীদের রাবার, কাঠ ও ফলমূলের বাগানে (plantation) (আদনান ২০০৪: ৪২-৪৩; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৭-৮১)। বহিরাগত বাঙালিদের কাছে পাহাড়িদের জায়গাজমি নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করার জন্য তদানীন্তন সরকার তাদের অধিকার রক্ষাকারী আইনকানুন একতরফাভাবে বাতিল বা পরিবর্তন করে দেয়। বিশেষ করে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে (CHT Regulation of 1900) ১৯৭১ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে তদানীন্তন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সরকার গুরুতরভাবে পরিবর্তন করে। তার ফলে বাঙালিদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে আগের আইনি রক্ষাকবচগুলো অনেকাংশে সরিয়ে ফেলা হয় (আদনান ২০০৪: ৪১)।

বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ

রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে ভূমি দখলের পর এখন বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী কিভাবে ভূমিগ্রাস করার জন্য নিজেরাই বলপ্রয়োগ করে তা তুলে ধরা দরকার। এধরনের ভূমিগ্রাসকারীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ, ক্ষমতাবান শ্রেণি ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী, প্রাইভেট কোম্পানী ও কর্পোরেশন, 'বাণিজ্যিক এনজিও' (NGO), রাজনৈতিক প্রভাবশালীবৃন্দ এবং মাস্তান বাহিনী ও অপরাধচক্র (criminal mafia) (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৮৮-৯৪; আদনান ২০১৩; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)। এসব দখলদারেরা সুবিধামতো পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতেও সিদ্ধহস্ত।

এ ধরনের বেসরকারি ভূমিগ্রাস বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই ঘটে আসছে। বড় বড় নদীর চর ভূমিতে এবং প্রত্যন্ত অববাহিকা অঞ্চলে লাঠিয়ালদের জোরে ভাগচাষীদের বসানোর জন্য নিরন্তর জমি বেদখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের ইতিহাসের অংশ (আদনান ও মনসুর ১৯৭৭; ডে উইল্ড ২০১১; আদনান ২০১৩: ১০১)।

শক্তি প্রয়োগ করে ভূমিগ্রাস করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতি নতুন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ যোগ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে রপ্তানীর লক্ষ্যে এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নোনাজলের চিংড়ী উৎপাদনের জন্য সহিংস (violent) কায়দায় 'ঘের দখলের' প্রচলন ঘটেছে (আদনান ২০১৩: ১০৫-১১০; পাপরকী ও কন্স ২০১৪)। প্রভাবশালী চিংড়ীঘের মালিকেরা মাস্তানবাহিনী দিয়ে জোর করে উপকূলীয় এলাকার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেটে লবণপানি ঢুকিয়ে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে স্থানীয় চাষীদের মিষ্টিপানির ফসল উৎপাদন বানচাল হয়ে যায়। তখন তারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের ফসলী জমি চিংড়ী ঘেরের জন্য নামমাত্র খাজনায় ('হাঁড়ির' টাকায়) ক্ষমতাশালী ঘের মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একবার চিংড়ী ঘেরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সেই জমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কখনই আগের কৃষকদের হাতে ফিরে আসতে পারে না।

এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমি (wetlands) যেমন, হাওর, বাওড়, জলাশয়ের ভূমিগ্রাস করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলমান (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮৪)। এ ধরনের জলাভূমি সাধারণত রাষ্ট্রীয় মালিকানার খাসজমি হলেও এগুলো ব্যক্তিগত ইজারাতে নেয়া কিংবা দখলি সত্ত্বের (possession) আওতায় আনার জন্য প্রভাবশালী মহল অত্যন্ত উদগ্রীব। এজন্য তারা প্রয়োজনমতো মাস্তান বাহিনী ব্যবহার কিংবা অন্যান্য অবৈধ কায়দায় জলাভূমি নিজেদের করায়ত্ত্ব করে। পুলিশ প্রশাসনকে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে এ ধরনের বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করে এসব প্রভাবশালী মহল।

শুধু প্রত্যন্ত চরাঞ্চল বা জলাভূমি নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের জ্ঞাতসারে শহর এলাকাতেও ভূমি বেদখলে সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী। তথাকথিত 'উন্নয়নের' সাথে তাল মিলিয়ে শহরের জমির দামও বাড়ছে। আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি, বিপনি বিতান ও 'শপিং মল' ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসার কিংবা ফটকাবাজীর (speculation) মুনাফার পরিমাণও বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলের জমি বেদখল করার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা এবং খুনখারাবি ঘটছে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২-৯৮৫)। ঢাকা মহানগরের করাইল কিংবা আগারগাঁওয়ের মতো বস্তীতে পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেই জায়গাগুলো নতুন মার্কেট বা এ্যাপার্টমেন্টের জন্য বেদখল করার প্রচেষ্টাও আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

ওপরে আলোচিত দৃষ্টান্তগুলো মূলত শ্রেণিস্বার্থ দিয়ে পরিচালিত ভূমি গ্রাসের নমুনা। তবে, এগুলো ছাড়াও জাতি ও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ছত্রছায়াতে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ার ভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় ভূমি গ্রাসের পাশাপাশি বিভিন্ন বাঙালি ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান পাহাড়িদের ভূমি বেদখলে ব্যাপকভাবে সক্রিয়। প্রভাবশালী সেটলার, বাগান মালিক (plantation owners), সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্ষমতাবান গোষ্ঠী নানাভাবে জোরজবরদস্তি করে পাহাড়ি আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল করে নিয়েছে (আদনান ২০০৪: ৮৯-৯৪; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭১-৯৯)। এছাড়া,

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমিগ্রাস করেছে (বারকাত ও রায় ২০০৪: ২২৫-২৩১; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় বাঙালিরা সশস্ত্র আক্রমণ এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মুন্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও এবং অন্যান্য আদিবাসী জাতির ভূমি জবরদখল করেছে (ডেইলি স্টার, ২১ জানুয়ারি ২০১৫)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান, এ ধরনের বেসরকারি ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণি এবং প্রধান (dominant) ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ। এটাও লক্ষণীয় যে ভূমিগ্রাসীদের আক্রমণ ও বলপ্রয়োগের সময় আক্রান্ত শ্রেণি, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও নিরাপত্তাবাহিনীর কাছ থেকে যথাযথ সুরক্ষা পায়নি (আদনান ও দস্তিদার ২০১১)।

৫. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ ভূমিগ্রাস

এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বলপ্রয়োগ করে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখবো কিভাবে শক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক লক্ষ্য অন্য কিছু হলেও তার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত মানুষ ভূমি হারাতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে (indirectly) কাজ করে। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের ঘটনাপরম্পরায় কিংবা সম্প্রদায়িক সংঘাতের অঘোষিত (undeclared) কিংবা অনির্ধারিত (unintended) পরিণতি হিসাবে এ ধরনের পরোক্ষ ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

এরকম একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় ১৯৯২ সনে যখন নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশ সরকার চিংড়ী মহাল বিধি (Shrimp Zone Rules) প্রবর্তন করে। ২০০৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নোয়াখালী জেলায় চিংড়ী মহালের জন্য নির্ধারিত এলাকার ঘোষণা দেয় (আদনান ২০১৩: ১১৭-১২২)। লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের উদ্যোগে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য রপ্তানির জন্য লবণজলের চিংড়ী উৎপাদন করা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু চিংড়ী মহাল নীতিতে বাণিজ্যিক খামারের জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি খাস জমি ইজারা দেবার ঘোষণা থাকার ফলে তাদের জন্য ভূমি দখল করার একটি অনুমোদিত পথ খুলে যায়।

উপরন্তু, বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল এই সুযোগে চরাঞ্চলের বিস্তৃত জমিতে চিংড়ী ঘের স্থাপনের অছিলায় সেখানে বসবাসরত ভূমিহীন ও নদী শিকস্তী পরিবারদের উচ্ছেদ করে তাদের জায়গাজমি দখল করে (আদনান ২০১৩)। একবার চরের জমির উপর দখল (possesion) স্থাপন করার পর তারা ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা ও প্রশাসনের যোগসাজশে সেসব জমির বানোয়াট দলিলপত্র তৈরী করে আইনী মালিকানাসত্ত্ব (de jure ownership) অর্জন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ সবের পরিণতিতে চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষি ও মাছ চাষের (agribusiness ও agro-fisheries) জন্য অনেক বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ভূমি গ্রাসের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও ভূমিহীনেরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন দাঁড় করাতে চেষ্টা করে সেটা প্রভাবশালী দখলদারেরা লাঠিয়াল বাহিনীর মাধ্যমে দমন করে (আদনান ২০১৩ : ১০৫-১১৫)।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসকল নয়া উদারবাদী নীতির বরাত দিয়ে বাংলাদেশে চিংড়ী মহাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় সেগুলো প্রবর্তিত হয়েছিলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক (regulatory) প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার চাপে (ওয়াকার ২০০৮: ৫৭৩-৫৭৪; আদনান ২০১৩: ১০৫-১০৬)। এসব আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও নীতিনির্ধারক সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাকে নয়া উদারবাদী পথে পরিচালিত করা এবং সেই নিমিত্তে চিংড়ী রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বাড়ানো। কিন্তু তাদের এই নীতির বাস্তবায়নের সময় যে ব্যাপক ভূমি দখল ঘটে সেটা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। সেজন্য চিংড়ী মহাল স্থাপন করার ঘটনাপরম্পরায় যে ভূমিগ্রাস ঘটে তাকে একটি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা যায়।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে ভূমিগ্রাসের আরেকটি পন্থা হচ্ছে সামাজিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়, শ্রেণি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে আতংক ও অনিশ্চয়তা (insecurity) সৃষ্টি করা। এভাবে তাদেরকে নিজেদের জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করাই এই কৌশলের চূড়ান্ত লক্ষ্য (আদনান ও দস্তিদার ২০১১; আদনান ২০১৬)।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের (Partition) সময় থেকে ধর্মীয় সংঘাত এবং দাঙ্গার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের জমিজমা ফেলে, কিংবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং অনিশ্চিয়তা সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছে। এর ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত (ethno-religious) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের জায়গাজমি ছেড়ে ক্রমাগতভাবে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শঙ্কা ও আতংক সৃষ্টি করার একটা প্রচলিত পন্থা হলো ভিন্নধর্মী মানুষের উপাসনালয় কিংবা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করা। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কক্সবাজার জেলার রামু ও উখিয়ায় ২০১২ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকে পরবর্তী ৩৬ ঘন্টায় পর্যায়ক্রমে কয়েক ডজন বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তিস্থাপনা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া কিংবা ভাঙ্গচুর করার ঘটনায় (বড়ুয়া ২০১৩:৩৪০-৩৪৪)। এই পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞের পর আক্রান্ত এলাকার সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। অনেক পরিবারই নিরাপত্তার খাতিরে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান কিংবা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন।

এভাবে ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করে ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত আরও আগে থেকেই দেখা যায়। কয়েক বছর ধরে হুমকি দেয়ার পর ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত বাঘাইহাট নিকটবর্তী বৌদ্ধদের বনানী মৈত্রী বনবিহার জোর করে পুড়িয়ে দেয়া হয় (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৩-৭৪)। এই বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন আশেপাশের জায়গাগুলো বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা (settlers) অনেক দিন থেকেই বেদখল করার চেষ্টা করছিলো। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নাকের ডগাতে এই আক্রমণ ঘটলেও বৌদ্ধমন্দিরটি রক্ষা করার জন্য কোন কার্যকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বস্তুত, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থাপনার ওপর আক্রমণ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে প্রায়ই ঘটছে । ২০১০ সালের ছয়মাস ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত আক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করে গৌতম (২০১৫:৭৫-৮২) দেখিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ফলশ্রুতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমিগ্রাস করা হয়েছে।

সামাজিক আতংক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে ভূমিগ্রাস করার আরও একটি বহুলপ্রচলিত পন্থা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে কোনো গোষ্ঠীর নারীদের ওপর যৌন হামলা ও হয়রানী করা। মহিলাদেরকে নিশানা করে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণ করা হলে তাঁদের নিকট আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র সম্প্রদায়ই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের আতঙ্ক আরও ঘনীভূত হয় যদি সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি দেয়া না হয়, এবং তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিচারের আওতার বাইরে দায়মুক্তি উপভোগ করতে থাকে।

এধরনের যৌন হামলার শিকার যেসব নারীরা, এবং তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়, সকলকেই নিজেদের ইজ্জত বা মানসম্মান হারানোর আতঙ্ক ও আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাতে হয় (সর্বজনকথা ২০১৪:৫-৬)। এহেন সামাজিক চাপের মুখে কোনা এক পর্যায়ে তাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তাদের জমিজমা হামলাকারীসহ অন্যান্য প্রভাবশালীরাও বেদখল করে থাকে। ২০১৪ সালের ৪ আগষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর ওপর স্থানীয় বাঙালী দখলকারীদের আক্রমণ অনুরূপ একটি ঘটনা। নারীদের ওপর এ ধরনের যৌন হামলা বর্তমান বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ঘটছে, যার আড়ালে অনেক ক্ষেত্রে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়াও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলেছে (মোহসীন ১৯৯৭: ১৭৮; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৯৬-৯৭; সর্বজনকথা ২০১৪: ৫-৬)।

যখন কোন সম্প্রদায়ের জায়গাজমি দখল করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর নানা ধরনের হামলা করা হয়, তখন সেটাকে বৈধতা দিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে যাদের জমিজমা নিশানা (target) করা হয় সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ভূমিদখলকারীরা নানাভাবে নিজেদের থেকে ভিন্ন (other) কিংবা 'শত্রু' স্থানীয় হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। এ ধরনের 'ভিন্নকরণ' (othering) প্রক্রিয়া সৃষ্টি এবং প্রচার করা হয় নানাভাবে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং মতাদর্শের বিকৃত প্রয়োগ। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতা এই 'ভিন্নকরণ' ও 'শত্রু-উৎপাদন' প্রক্রিয়ার মালমসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৬. বল প্রয়োগ ছাড়াই প্রত্যক্ষ ভূমি দখল

এরপর দেখা যাক শক্তি প্রয়োগ না করেও কি কি ভাবে ভূমি দখল করা হয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে। এ সব ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু শক্তিপ্রয়োগ করা হয় না, সেহেতু এই প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে কোনো প্রকাশ্য বিরোধ না ঘটে। যারা ভূমি হারান তাদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা আপোষের মাধ্যমে, ভূমি দখল করা হয়। এই ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হলো।

এরকম ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা বা দখলীসত্ত্ব কেনা, অথবা শর্তসম্বলিত চুক্তিতে জমি ইজারা (lease) নেয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাজারের মাধ্যমে কেনার দাবী করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন ও আবাসন কোম্পানী (প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০১৬)।[৫] তাছাড়া নানা ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্যও জমি কেনার হিড়িক পড়েছে দেশের বিভিন্ন নগর ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং

৫. অবশ্য বাস্তবে এসব জমি 'কেনা' বা 'ভাড়া' নেয়ার সময় কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়েছিলো কিনা তা উদ্বৃত সংবাদ সূত্রে বলা হয়নি। আমাদের পক্ষেও সব ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা সরেজমিনে পরখ করা সম্ভব হয়নি।

শিল্পাঞ্চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: সুন্দরবনের চারপাশের রক্ষিত এলাকায় ইতিমধ্যেই আনুমানিক ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ১০ হাজার একর জমি কেনা হয়েছে (সর্বজনকথা ২০১৬: ৪)। এসব জমির ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী (প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০১৭)।

এ ছাড়া, দখলীসত্ত্বের (right of possession) কোন আইনী স্বীকৃতি না থাকলেও বাস্তবে এ ধরনের ভূমি সত্ত্ব খোলাখুলি বেচাকেনা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দখলীসত্ত্বের সক্রিয় ভূমি বাজার বিদ্যমান। নোয়াখালীর চরাঞ্চলে ভূমিদস্যুরা তাদের করায়ত্ত্ব জমির দখলীসত্ত্ব বিক্রি করে থাকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থার কাছে (আদনান ২০১৩: ১১৬)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় সরকারি প্রশাসন থেকে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদেরকে (settlr) 'আর-হোল্ডিং' (R-Holding) নামে যে কবুলিয়ৎ দলিল দেয়া হয়েছিলো সেগুলো তারা অনেকেই পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়। তারপর থেকে এই ভূমিসত্ত্বের সনদগুলো (titles) অবাধে কেনাবেচার সাক্ষ্য দিয়েছেন বম্‌ নেতা জুম লিয়ান আমলাই (আদনান ও দস্তিদার ২০১১:৬৫-৭০)। বিশেষ করে কয়েকটি কোম্পানী, ব্যবসায়িক এনজিও (NGO) এবং ভূমি দখলদারেরা এই রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভূমিসত্ত্বের সনদ কিনে নিয়েছে এবং তা দিয়ে বসবাসকারী পাহাড়ি ও বাঙালি উভয়ের ভূসম্পত্তির ওপর মালিকানা দাবী করছে।

সরাসরি বলপ্রয়োগ না করে ভূমি বেদখলের আরেকটি পন্থা হচ্ছে জমির দলিলপত্র ও রেকর্ড জাল করা কিংবা অবৈধভাবে বদলে দেয়া (বারকাত ও রায় ২০০৪: ১৯২-২২৪)। ভূমিগ্রাসীরা সাধারণত প্রভাব খটিয়ে ও ঘুষ দিয়ে তহশিলদার, দলিল লেখক, এবং ভূমি অফিসের কর্মচারীদের যোগসাজশে এ ধরনের জাল দলিলপত্র বানায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির আসল মালিকদের অজান্তেই এমন জালিয়াতি ও প্রতারণা ঘটে থাকে। ভুয়া দলিলপত্র তৈরী করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র পরিচালিত ব্যবসা চালু আছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভূমি অফিসে চাকুরীরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও এসব অপরাধচক্রে জড়িত থাকে। এরকম জাল ভূমিসত্ত্ব কেনাবেচার সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নোয়াখালী জেলা (আদনান ২০১৩: ১১৬) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ১০০-১০১)।

এমনকি, ঢাকা মহানগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে একটি অপরাধচক্র বিভিন্ন আবাসন কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নামে প্রায় ১৫০ একর জমি জালিয়াতি করে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী, জমির দালাল এবং দলিল লেখকদের যোগসাজশে (প্রথম আলো ৮ নভেম্বর ২০১২)। এছাড়া, গাজীপুর জেলারই শ্রীপুর উপজেলায় তিনটি গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রায় হাজার খানেক একর জমি জালিয়াতি করে বেদখল করা হয়েছে চারটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামে। এই অবৈধ ভূমি দখল করা হয় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এবং প্রয়োজনমত ঘুষ দিয়ে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ২০১৪; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। নানা ধরনের জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং জলনিয়ন্ত্রক অবকাঠামোর সরকারি জায়গাজমি প্রভাবশালীরা বেদখল করেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২)।

কোনো বিরোধ ছাড়া নির্বিঘ্নে ভূমি দখল করার আর একটি চতুর কৌশল হচ্ছে জনমত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা। এ জন্য 'দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য ভূমি প্রদান করা দরকার' বলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে

প্রচার করা হয় এবং ছলেবলে কৌশলে কোনো প্রতিরোধ করা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখা হয়। দেশী-বিদেশী উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার সময় সাধারণ মানুষের মগজধোলাই করার জন্য এ ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এ প্রক্রিয়ার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পর এলাকাবাসীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়ার কলাকৌশলে। যদিও শেভরন (Chevron) নামের বহুজাতিক কোম্পানী মুনাফা বানানোর জন্যেই গ্যাস উত্তোলন করছে, তবু তারা বিবিয়ানার স্থানীয় মানুষকে নানভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের 'জাতীয় উন্নয়নের' জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু, এ প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত ভূমির 'প্রতিদান' হিসাবে তারা এলাকাবাসীর জন্য সামান্য কিছু স্কুল, প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেছে, এবং সেগুলোকে 'উন্নয়নের উপহার' (development gift) হিসাবে এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে সম্প্রচার করেছে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৮; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৯; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

এ ধরনের 'উপহারের রাজনীতির' ('politics of the gift') মাধ্যমে এই কোম্পানী তাদের ভূমি বেদখল কার্যক্রমকে বৈধতা (legitimacy) প্রদান করার চেষ্টা করেছে। উপরন্তু, এলাকাবাসীকে 'আধুনিকতা এবং উন্নয়নের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়ে' তাদেরকে গ্যাসক্ষেত্র প্রকল্পের বিরোধিতা না করে বরং সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

লক্ষণীয় যে, এসব কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রচারণা জোরদার করার জন্যে শেভরন কর্পোরেশন জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি কয়েকটি সংস্থার (NGO) সাথে 'অংশীদারিত্বের' (partnership) চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে, নিজেদের কোম্পানীর ভাবমূর্তিটাকে 'উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সহায়তার মোড়কে মুড়ে' তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডকে 'নতুন ছাপ' (rebranding) দেয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ (public relations) ও বিজ্ঞাপন (advertising) প্রচারের মাধ্যমে শেভরন এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'জনসেবামূলক' কর্মকাণ্ডকে নিজেদের 'কর্পোরেট কার্যক্রমের সামাজিক দায়বদ্ধতার' (corporate social responsibility or CSR) নির্দশন হিসেবে তাদের বিদেশী শেয়ার মালিক এবং বাংলাদেশী নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করেছে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৬-৭ ; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৭-১০)।

উল্লেখ্য যে, শেভরন এলাকাবাসীকে যেসব সুবিধা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেয়ার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্থানীয় অধিবাসীদের পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দেয়া কিংবা এ এলাকায় কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা, কোনোটাই এ বিদেশী কোম্পানীর এখতিয়ারে ছিলো না (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩)। এ সত্ত্বেও এসব মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় মানুষের সম্ভাব্য প্রতিরোধ নিবৃত করে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কর্পোরেশনটি এ ধরনের পরিকল্পিত প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিলো।

এভাবে বিতর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমিগ্রাসের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার আরও দৃষ্টান্ত বর্তমানে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকারক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপনাকে বৈধতা দেয়ার জন্যে টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন ও সাজানো কথোপকথনের (talk show) কৌশলী ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭. বল প্রয়োগ ছাড়া পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় ভূমি দখল

ভূমি দখলের এ বিশেষ প্রক্রিয়াটি সহজে চোখে পড়ে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে কেউ সরাসরি বলপ্রয়োগ করে না এবং জমি হারানোর ঘটনাগুলো ঘটে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিচালিত কাজের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে এ প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ধারণাটি পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ, স্লুইস (sluice), পোল্ডার (polder) জাতীয় অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। দেশের সরকার ও বিদেশী দাতাসংস্থার উদ্যোগে এই অবকাঠামোগুলো তৈরীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বন্যা থেকে জনবসতি এবং কৃষি জমি রক্ষা করা (আদনান ও অন্যান্য ১৯৯২; ১৯৯৪)। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই এই বন্যা রক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনামতো কাজ করেনি। ত্রুটিপূর্ণ বাঁধের ভাঙনের ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব এলাকা 'রক্ষিত' থাকার কথা ছিলো সেরকম জায়গাতেও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অথবা স্লুইস অকেজো হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা (আদনান ১৯৯১: ৬২-৭২) যশোরের ভবদহ স্লুইসের গেটগুলো অচল হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক জলাবদ্ধতা ঘটেছে স্থাপনাটির চারিদিকে। ১৯৯০ এর দশকে বিল ডাকাতিয়ার পোল্ডারে সারা বছর ধরে পানি জমে থাকা এরকম অপরিকল্পিত ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত (আদনান ১৯৯১; ১৯৯২; ১৯৯৪; ২০১৬খ)। এসব বন্যাকবলিত কিংবা জলাবদ্ধতায় আটকে যাওয়া জনগোষ্ঠী অভাবের তাড়নায় তাদের জমিজমা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এ ধরনের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো দখলদারের বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; আদনান ২০১৬খ)। যদিও বন্যাকবলিত মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজ জমি থেকে উৎপাটিত হয়েছে, তা ঘটেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ব্যর্থতার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসাবে। যেহেতু বন্যানিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ভূমিগ্রাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেজন্য এই ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ হিসাবে গণ্য করতে হয়।

অনুরূপ পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ভূমি হারিয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিতভাবে পূর্বেকার খাল, নর্দমা ও জলনিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ করে দেয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। অনেক ক্ষেত্রেই এসব এলাকার ভূমি মালিকেরা তাদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে (আদনান ১৯৯১: ৭৩-৭৫; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১২)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডেভেলপার কোম্পানী এবং ফটকাবাজেরাই এ ধরনের জলাবদ্ধ জমি কিনে তার সংস্কার করে পরবর্তীতে অন্যদের কাছে তা বিক্রি করেছে প্রচুর মুনাফাসহ।

ভূমিগ্রাসের কোনো সচেতন বা পূর্বতন উদ্দেশ্য না থাকলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সংকটের কারণে এরকম বিপর্যয় ঘটে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় নিতান্ত বাঁচার তাগিদে এলাকাবাসী মানুষকে তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটি ও জমিজমা বাধ্য হয়ে বিক্রী করে দিতে হয় ('distress sale') (আদনান ২০১৬ খ)।

৮. উপসংহার: ভূমিগ্রাস ও ধনার্জন

ওপরের আলোচনায় বাংলাদেশে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে শক্তির ব্যবহার থাকা বা না থাকা, অন্যদিকে প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ, এই বৈশিষ্ট্যগুলো

সমন্বিত করে চার ধরনের ভূমি দখল প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ছক তৈরী করা হয়েছে। এবং বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রত্যেক ধরনের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বড় ধরনের এ প্রকারভেদের (typology) প্রতিটি প্রক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিভাজন করা যায় কোনো বিশেষ ঘটনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ওপরের আলোচনায় প্রত্যক্ষ বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কায়দা ও ভূমিকার তফাৎ দেখানো হয়েছে।

তবে বলা দরকার যে, যদিও এক এক ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বাস্তবে একাধিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একইসাথে কাজ করতে পারে। অনুরূপভাবে, ভূমিগ্রাসে একাধিক প্রতিষ্ঠানও জড়িত থাকতে পারে যেগুলোকে সমন্বিত করে প্রধান দখলকারী শক্তি বা সংস্থা। ভূমি বেদখলের আরও জটিল ঘটনাগুলোতে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে। সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে, এবং সাম্প্রতিককালে বাঁশখালির বিদ্যুৎকেন্দ্রে এবং গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করে জমি জবরদখল করা এ ধরনের বহুমাত্রিক (multi-dimensional) ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার নিদর্শন।

লক্ষণীয় যে, ভূমিগ্রাস সবক্ষেত্রে বিনা বাধায় ঘটতে পারে না। বাস্তবে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (resistance) ও সংগ্রাম (struggle) হতে পারে। যেসব জনগোষ্ঠী বা শ্রেণির জমিগ্রাস করা হয়, কিংবা যাদের জমি হারানোর আশঙ্কা থাকে, তারা নিজেদের জায়গা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে (আদনান ২০১৩:৯৭-৯৮)। এসব ক্ষেত্রে দখলদার এবং প্রতিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সহিংস সংঘাত ছাড়াও দরকষাকষি (negotiation), সালিশী, আদালতে মামলা, অথবা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপোষ করা, এরকম বিভিন্ন ধরনের পরিণতি ঘটতে পারে।

ভূমি সংঘাতে লিপ্ত প্রতিটি পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে সঠিক বলে ঘোষণা করে এবং নিজস্ব দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এসব পরস্পরবিরোধী ভূমি অধিকারের মধ্যে বৈধতা (legitimacy) স্থাপনের সংগ্রামও চলে। এ কারণে ভূমি অধিকার নিয়ে সংঘাতের (struggle) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও মতাদর্শিক (ideological) মাত্রাও (dimension) গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিগ্রাসের এই প্রতিটি মাত্রার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণের আওতায় আনা দরকার।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান যে, ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্ন ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যথা, নির্বাহী প্রশাসন (executive), আইনসভা (legislature), এবং বিচারব্যবস্থা (judiciary) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে (আদনান ২০১৩; ১১৪- ১১৫; ২০১৪: ১৭)। এছাড়া, যে সার্বিক ক্ষমতা কাঠামো (power structure) রাষ্ট্র, সমাজ ও শ্রেণিবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে তার প্রভাবও অন্যতম নির্ণায়ক (determinant) ভূমিকা পালন করে থাকে (আদনান ২০১৩: ১১৮)। সোজা ভাষায়, যাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জোর বেশি, জমি দখলের ক্ষেত্রে তাদের সফল হবার সম্ভাবনাও অধিক।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ভূমিগ্রাসের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের মধ্যে সবগুলোতে না হলেও কোনো কোনোটিতে অনৈতিক আচরণ ঘটে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ঘটে এবং সহিংসভাবে ভূমি বেদখল হয় সেসব পদ্ধতির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনুরূপভাবে জালিয়াতি, দুর্নীতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে যেসব ভূমিগ্রাস ঘটে সেগুলোও অনৈতিক।

লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের ভূমিকাতেও অনৈতিক আচরণ রয়েছে। যেমন, 'জনস্বার্থে' ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় বটে, তবে সেই জমি যখন প্রাইভেট মুনাফাকারী গোষ্ঠীকে প্রদান করা হয় তখন রাষ্ট্রের কথা ও কাজের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। নিরাপত্তায়নের নামে যে ভূমিগ্রাস ঘটে সে ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কোনো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সরাসরি বৈষম্যমূলক আচরণ করে যা দেশের সংবিধান ও আইন বিরোধী এবং অনৈতিক। যেসব ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মাস্তান বাহিনী কিংবা দলীয় ক্যাডার দিয়ে জোর খাটানো হয় সেসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের আচরণে ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ থাকে না।

রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ব্যবসায়িক কোম্পানী বা এনজিও কর্তৃক জোর খাটিয়ে ভূমি বেদখলের দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দেখিয়ে ভূমিগ্রাসের লক্ষ্যার্জন করেছে বিভিন্ন বেসরকারি গোষ্ঠী ও প্রাইভেট কোম্পানী। এসব ক্ষেত্রেও ভূমিগ্রাসের পন্থাগুলো পরিস্কারভাবে অনৈতিক।

সুতরাং, এটা প্রতীয়মান যে, সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের অনেকগুলোই নৈতিকতার ধার ধারে না। বরঞ্চ, এসবের পেছনে কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা শ্রেণির স্বার্থ কাজ করে যা অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক। এমনকি আইন ও নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার, তাদেরকেও ক্ষেত্র বিশেষে এর বিপরীত আচরণ করতে দেখা যায় ভূমি বেদখল করার স্বার্থে।

ভূমিগ্রাসের পেছনে যে ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করে সেগুলোও সব ক্ষেত্রে এক নয়। বেদখল করে নিজের জমির পরিমাণে বাড়ানোকে এক ধরনের accumulation বা ধনার্জন প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়। ভূমিগ্রাসভিত্তিক ধনার্জন প্রক্রিয়ার ভেতরে আরও তফাৎ আছে যেগুলো তাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত: যখন কোনো প্রাক-পুঁজিবাদী (precapitalist) বা অ-পুঁজিবাদী (non-capitalist) সংস্থা, সম্প্রদায় বা শ্রেণির ভূমি বেদখল করে সেগুলো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা হয় তখন সেই ভূমিগ্রাসটি আদি ধনার্জনের (primitive accumulation) আওতায় পড়ে। সমকালীন নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের যুগেও এই 'আদি' প্রক্রিয়াটি চলমান এবং এজন্য নতুন নতুন কলাকৌশলেরও উদ্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্য ক্রমাগতভাবে ভূমি, শ্রমশক্তি এবং অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা। সমকালীন বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে যে ধরনের অভিনব ভূমিগ্রাস ঘটছে সেসব প্রক্রিয়াকে 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জন' (accumulation by dispossession) অভিহিত করে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছেন হার্ভে (২০০৩: ১৪৪-১৬১)।

তবে ভূমিগ্রাসের সব ঘটনা আদি ধনার্জন কিংবা বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জনের আওতায় পড়ে না। এর একটি নিদর্শন হচ্ছে কোনো পুঁজিবাদী খামার বা সংস্থার (capitalist enterprise) জমি অনুরূপ আরেকটি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়া। এই প্রক্রিয়া আদি ধনার্জন নয়। বরঞ্চ, এই প্রক্রিয়া হচ্ছে পুঁজির কেন্দ্রীভবন (centralisation of capital), যা পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) অন্তর্গত। বিশেষ করে কৃষি ও অন্যান্য ভূমিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য পুঁজির কেন্দ্রীভবন একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত (কাউটস্কি ১৯৭৬, ১৯৮৮; আদনান ১৯৮৫)।

এগুলো থেকে ভিন্ন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা চর দখলের মতো ভূমিগ্রাসের ঘটনা। এগুলো পুঁজিবাদী বা আদি ধনার্জন কোনটারই আওতায় পড়ে না। এসব ক্ষেত্রে অধিকৃত জমিগুলো কোনো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয় না। দৃষ্টান্তরূপ, জোতদাররা যখন চর দখল করে তখন সেই জমিগুলো

তারা ভূমিহীন বর্গাদার দিয়ে চাষ করিয়ে খাজনা বা prcapitalist ground rent আদায় করে। কাজেই, কোনো বিশেষ ভূমিগ্রাসের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দখলকৃত জমিটা কি ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে ন্যাস্ত হচ্ছে তা বোঝা দরকার। তার ভিত্তিতেই নিরূপণ করা সম্ভব যে এই ভূমিগ্রাসের ঘটনাটি কি আদি বা পুঁজিবাদী ধনার্জনের আওতায় পড়ে, নাকি প্রাক-পুঁজিবাদী খাজনা আদায়ের জন্য ভূমি দখল প্রক্রিয়ার অংশ।

এটা প্রতীয়মান যে, ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর (theoretical framework) প্রয়োজন যা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) এবং ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) মধ্যে গুণগত ও বিশ্লেষণাত্মক (analytical) পার্থক্য সনাক্ত করতে পারে। এ প্রবন্ধে উপরোক্ত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলেও বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না সময় এবং পরিসরের অভাবে। তবে পরবর্তীতে ভূমি দখলের এসব তাত্ত্বিক (theoretical) ও তথ্যভিত্তিক (empirical) দিকগুলো আরও বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি।

তথ্যসূত্র

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য ২০১৪। (Ain O Shalish Kendro o annyana: ASK, NK, ALRD, TIB, Bangladesh Adivasi Forum, BLAST, BELA, and BAPA*),* আইনবিধি, মানবাধিকার ও জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কৃষি জমি, বনভূমি দখল, অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন উপস্থাপন। ঢাকা: সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৩ নভেম্বর ২০১৪।

২. আদনান, স্বপন ১৯৮৫। (Adnan, Shapan) 1985a, "Classical and Contemporary Approaches to Agrarian Capitalism", Economic and political Weekly, Vol. XX, No.30, pp.PE-53-64.

৩. আদনান, স্বপন ১৯৯১। *(*Adnan, Shapan), *Floods, People and the Environment: Institutional Aspects of Flood protection programmes in Bangladesh, 1990.* Dhaka: Research and Advisory Services (RAS).

৪. আদনান, স্বপন ২০০৪। (Adnan, Shapan), *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh,* Dhaka: Research and Advisory Services.

৫. আদনান, স্বপন ২০১৩। (Adnan, Shapan), Land grabs and primitive accumulation in deltaic Bangladesh: Interactions between neoliberal globalization, state interventions, power relations and peasant resistance. *The Journal of Peasant Studies*, 40:1, 87-128.

৬. আদনান, স্বপন ২০১৪। (Adnan, Shapan), Primitive accumulation and the transition to capitalism' in neoliberal India: Mechanisms, resistance, and the presistence of self-employed labour. Chapter 2 in Barbara Harriss-White and Judith Heyer (eds,) *Indian Capitalism in Development*, London: Routledge, pp. 23-45.

৭. আদনান, স্বপন ২০১৬ক। (Adnan, Shapan), Alienation in Neoliberal India and Bangladesh: Diversity of Mechanisms and Theoretical Implications, *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* [Online], 13. Online since 06 April 2016, URL: http://samaj.revues.org/4130

৮. আদনান, স্বপন ২০১৬খ। বিল ডাকাতিয়ার গণ আন্দোলন'। সর্বজনকথা ৩:৯, নভেম্বর, পৃ ৬৫-৭০।

৯. আদনান স্বপন ২০১৭ ক। (Adnan, Shapan) 2017, "Land grabs, primitive accumulation, and resistance in neoliberal India: Persistence of the self-employed and divergence from the "Transition to Capitalism"?, Chapter 3 in Anthony D'Costa and Achin Chakraborty (eds) The Land Question in India: State, Dispossession and Capitalist Transition, Oxford: Oxford University Press, pp. 76-100.

১০. আদনান, স্বপন ২০১৭ খ। (Adnan, Shapan) বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র, সর্বজনকথা, ৩:৪, আগস্ট-অক্টোবর, পৃ ২১-৩১।

১১. আদনান, স্বপন ও আহসান হাবিব মনসুর ১৯৭৭। (Adnan Shapan and Ahsan Habib Mansoor), Land, power and violence in Barisal Villages, *Policical Economy,* 2(1), 125-143.

১২. আদনান, স্বপন এবং অন্যান্য ১৯৯২। (S. Adnan, A. Barrett, S.M.N. Alam, A. Brustinow, Aminur Rahman and Abu M. Sufiyan), *People's Participation and the Flood Action Plan.* Dhaka: Research and Advisory Services and Oxfam-Bangladesh.

১৩. আদনান স্বপন এবং অন্যান্য ১৯৯৪ (আদনান, স্বপন. এ. ব্যারেট, এস.এম. নরুল আলম, এ. ব্রুস্টিসভ, মো. আ. রহমান ও আ.ম. সুফিয়ান)। জনগণের অংশগ্রহণ: ফ্যাপ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকা। ঢাকা: রিসার্চ এ্যাণ্ড এ্যাডভাইজরী সার্ভিসেস ও অক্সফ্যাম-বাংলাদেশ।

১৪. আদনান, স্বপন ও রণজিৎ দস্তিদার ২০১১। (Adnan, Shapan and Ranajit Dastidar), *Alienation of the Lands of Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Dhaka:* Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) and Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

১৫. আহাসান, আবু ও কেটি গার্ডনার ২০১৬। (Ahasan, Abu and Katy Gardner), Dispossession by Development': Corporations, Elites and NGOs in Bangladesh. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* [Online] 13 2016, URL: http://samaj-revues. org/4136.

১৬. টন, আর এম ১৯৯৭। (Eaton, R.M), *The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760.* Delhi: Oxford University Press.

১৭. এ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট ২০০৬। (Anderson, Benedict), *Imagined communities.* London: Verso.

১৮. ওয়াকার, ক্যাথি লে মনস ২০০৮। (Walker, Kathy Le Mons), Neoliberalism on the ground in rural India: Predatory growth, agrarian crisis, internal colonization, and the intensification of class struggle*: Journal of Peasant Studies,* 35 (4), 557-620.

১৯. কাউটস্কি, কার্ল ১৯৭৬। Kautsky, K. 1976. Summary of selected parts of Kautsky's The Agrarian Question. *Economy and Society*, 5(1), 1-49. Summarized by JairusBanaji.

২০. কাউটস্কি, কার্ল ১৯৮৮। Kautsky, K. 1988. *The Agrarian Question*, Volumes I and II. London & Winchester Mass: Zwan Publications.

২১. খান, মোহাম্মদ তানজিমুদ্দিন ২০১৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্পের নিরাপত্তাকরণ। *সর্বজনকথা* ১:৪, আগষ্ট, পৃ ২৫-২৭।

২২. গার্ডনার, কেটি ২০১২। (Gardner Katy), *Discordant Development:* Capitalism and the Struggle for Connection in Bangladesh. London: Pluto Press.

২৩. গার্ডনার, কেটি ও ইভা গেরহার্জ ২০১৫। (Gardner, Katy and Eva Gerharz), Land, Development and Security in Bangladesh and India: An Introduction. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online*], 13/ 2016, URL:http:\\samaj.revues.org/ 4141.

২৪. গার্ডনার, কেটি, জহির আহমেদ, মোহাম্মদ মাসুদ রানা ও ফাতেমা বাশার ২০১৫। (Gardner, Katy, Zahir Ahmed, Mohammad Masud Rana and Fatema Bashar), Field of Dreams: Imagining Development and Un-Development at a Gas Field in Sylhet. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online],* 9. URL: http:\ samaj.revues.org\ 3741.

২৫. গৌতম, দীপংকর ২০১৫। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সংগঠিত হামলাঃ ছয় মাসের প্রতিবেদন। *সর্বজনকথা* ১:২, ফেব্রুয়ারী, পৃ ৭৫-৮২।

২৬. ডে উইল্ড, কে (সম্পাদক) ২০১১। de Wilde, K., (ed.), *Moving coastlines: Emergence and use of land in the Ganges–Meghna– Brahmaputra Estuary*. Dhaka: University Press.

২৭. পাপরকী, কাশ্যা ও জেসন কন্স ২০১৪। (Paprocki, Kasia and Jason Cons), Toward a political geography of food sovereignty: Transforming territory, exchange and power in the liberal sovereign state. *Journal of Peasant Studies,* 41 (6).

২৮. ফেয়ারহেড, জেমস, মেলিসা লীচ ও ইয়ান স্কুনস ২০১২। (Fairhead, James, Melissa Leach and Ian Scoones), Green Grabbing: A new appropiation of nature? *Journal of Peasant Studies,* 39(2), 237-261.

২৯. ফেল্ডম্যান, শেলী ২০১৬। (Feldman, Shelley), The Hindus as Other: State, Law, and Land Relations in Contemporary Bangladesh*, South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online],* 13/2016, URL: http://samaj.revues.org/4111.

৩০. বড়ুয়া, জ্যোতির্ময় ব্যারিষ্টার (সম্পাদক) ২০১৩। (Barua, Jyotirmoy Barrister (ed.)) *রামু: সম্প্রদায়িক সহিংসতা সংকলন* । ঢাকাঃ দ্রিক (DRIK)।

৩১. বারকাত, আবুল ও প্রশান্ত কে, রায় ২০০৪। (Barkat, Abul and Prosanta K. Roy), *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A case of colossal national wastage.* Dhaka: Association of Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

৩২. ভাদুড়ী, অমিত ২০০৮। (Bhaduri, Amit) Predatory growth*. Economic and Political Weekly,* 43 (16), pp.10-14. (19 April*)*

৩৩. মার্ক্স, কার্ল ১৯৭৬। (Marx, Karl) *Capital: A critique of political economy.* Volume 1. London: Penguin.

৩৪. মির্জা, মাহা ২০১৫। (Mirza, Maha), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ ভারতের অভিজ্ঞতার একটি স্ন্যাপশট। *সর্বজনকথা*, ১:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫।

৩৫. মুহাম্মদ, আনু ২০১৬। (Muhammad, Anu), ফুলবাড়ীর গল্প । *সর্বজনকথা* ২:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৩২-৪৫।

৩৬. মোহসীন, আমেনা ১৯৯৭। (Mohsin, Amena), *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.* Dhaka: University Press Limited.

৩৭. রহমান, মওদুদ ২০১৬। (Rahman, Modud) বাঁশখালির সাইরেন। *সর্বজনকথা* ২:৪, আগষ্ট, পৃ ২২-২৪।

৩৮. রায়, রাজা দেবাশীষ ১৯৯৫। (Roy, Raja Devasish), Land Rights, Land Use and Indigenous Peoples in the CHT,' in Philip Gain (ed). *Bangladesh: Land, Forest and Forest People.* Dhaka: Society for Environment and Human Development (SEHD).

৩৯. লেভিয়েন, মাইকেল ২০১২। (Levien, Michael) The land question: Special economic zones and the political economy of dispossession in India. *The Journal of Peasant Studies,* 39: 3-4, 933-969.

৪০. সর্বজনকথা, ২০১৪। (Sarbojankatha), আদিবাসী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর ওপর বর্বর নির্যাতন: ভূমি দস্যুতা এবং নারী নির্যাতন যেখানে একাকার। *সর্বজনকথা* ১:১, নভেম্বর, পৃ ৫-৬।

৪১. সর্বজনকথা, ২০১৫। (Sarbojankatha), ভূমি আগ্রাসনের চিত্র। *সর্বজনকথা ১:২ ফেব্রুয়ারী*, পৃ ৭-৮।

৪২. সর্বজনকথা, ২০১৬। (Sarbojankatha), সুন্দরবন ঘিরে ১৫০ শিল্প প্রকল্প। *সর্বজনকথা*, ৩:১, নভেম্বর, পৃ ৪।

৪৩. সাম্পাত, প্রীতি ২০০৮। (Sampat, Preeti), Special Economic Zones in India. *Economic and Political Weekly,* 43 (28), 25-29, 12 July.

৪৪. সোবহান, রেহমান ২০০৭। (Sobhan, Rehman), *The political economy of malgovernance in Bangladesh: Collected works of Rehman Sobhan, Volume 3.* Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

৪৫. হার্ভে, ডেভিড ২০০৩। (Harvey, David), *The New Imperialism.* Oxford; Oxford University Press.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 027-032
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

কৃষির রূপান্তর, কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম. এ. সাত্তার মন্ডল*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে কৃষির বৈচিত্রায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস ও ক্ষুধা নিরসন এবং গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি - এসবই এখন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এর পেছনে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারণ অনন্য অবদান রেখেছে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও সবিশেষ ভুমিকা পালন করেছে। কৃষি রূপান্তরের সূচকগুলো নানাভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠলেও এই পরিবর্তনের নিয়ামকগুলোর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে অতটা পরিস্ফুট বা আলোচিত হয়নি। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও খণ্ডায়িত খামার-বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে নতুন নতুন লাভজনক প্রযুক্তি ব্যবহার ও উৎপাদন বিকাশের পটভূমি বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে জোরালোভাবে বলা হয়েছে, কৃষি উৎপাদন ও গ্রামোন্নয়নে যে বিরাট প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তার জন্য বাংলাদেশ সবুজ বিপ্লবের একমাত্র পথ হিসেবে ভর্তুকি ও বৃহদাকার যান্ত্রিকায়ন নির্ভর পাঞ্জাবী মডেল গ্রহণ করেনি। না নীতি প্রণয়নে, না কৃষি প্রযুক্তি কৌশল নির্ধারণে। বাংলাদেশ কিছু ভর্তুকি সহায়তা দিয়ে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সুলভ ও চলনসই কৃষি প্রযুক্তি প্রসারণের পথ বেছে নিয়েছে। এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য; যা খামারের ব্যবস্থাপনাগত আকার বৃদ্ধি, কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতির দাম ওঠানামা, প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তন ও কৃষি পণ্যের বাজারমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য।

২. কৃষির বৈশিষ্ট

বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার আগে কৃষির ওপর একটু আলোকপাত করা যাক। এখানে দেড় কোটির বেশি কৃষক পরিবার। সবাই ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের গড় খামার আয়তন এক একরের মত। এদের ৮৫ ভাগের আবাদী জমির পরিমাণ এক একরের নিচে। কৃষিতে মোট কর্ম-সংস্থান কিছুটা বাড়লেও পুরুষ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান কমেছে; কিন্তু নারী শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। অ-কৃষি খাতে কর্ম-সংস্থান বেড়েছে নারী ও পুরুষ উভয়ের। কৃষি থেকে অ-কৃষি খাতে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত

* ইমেরিটাস অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

গতিতে। এটি কৃষির বাণিজ্যিকরণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধারণাটি কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র এশিয়ার দেশগুলোতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কৃষি শ্রমিকের অভাবজনিত কারণে দ্রুত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। সেই সঙ্গে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি কর্মের সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় করে দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং ফসলের নিবিড়তা বাড়াতেও সাহায্য করছে। এবার কৃষি পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়ামকগুলোর আলোচনায় আসি।

৩. রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন, ছাত্র শিক্ষক সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার আহবান–এসবই কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়নের প্রতি দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রমাণ। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সহজলভ্য কৃষি ঋণ ও ভর্তুকিমূল্যে ব্যয় সাপেক্ষ সেচ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ কৃষি উন্নয়ন নীতি আলোচনার মূখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়, বিশেষ করে ১৯৭০ এর জলোচ্ছ্বাসে গবাদি-পশুর ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে ট্রাক্টর ও টিলার বিতরণ ও এসব যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল বিভাগকে যুক্ত হওয়ার আহবান জানানো হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করার ওপরও জোর দেয়া হয়। এজন্যে প্রথম পরিকল্পনায় অপ্রতুল সম্পদ প্রাপ্যতা সত্ত্বেও এক কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৪. প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষমতা

বাংলাদেশের শিল্পায়নের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর, সৈয়দপুর রেলওয়ে প্রকৌশল ওয়ার্কশপ, পাটশিল্পের বিকাশ–এসবের দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন গ্রাম পর্যায়ে পাওয়ার পাম্প ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে ইরি ধানের আবাদের জন্য সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি যন্ত্রপাতি টেষ্টিং ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কমিটির মাধ্যমে ইঞ্জিন টেষ্টিং বেড স্থাপন করে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল অনুষদ এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ওই সময়ে জাপান থেকে আমদানীকৃত ইয়ামাহা কুবোতা ইঞ্জিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্টিফিকেশনের কাজ করতো। পরে আশির দশকের শেষে বৃহত্তর পরিসরে কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের স্বার্থে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন উঠিয়ে নেয়ার পর সুলভ চাইনিজ ইঞ্জিন গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, এটা কোন বড় চাইনিজ প্রকল্পের অংশ হিসেবে বা স্থানীয় সরকারের কোন বিশেষ উদ্যোগে ঘটেনি। এটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বেসরকারিকরণ নীতি সমর্থন ও বেসরকারি আমদানীকারকদের ব্যবসায়িক উৎসাহে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে সরকারের আরও কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত যেমন সেচ নলকূপের মধ্যেকার দূরত্ব ও ইঞ্জিন ব্রান্ড সম্পর্কিত আইন বাতিল, আমদানী শুল্ক উঠিয়ে নেয়া, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ ইত্যাদি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। স্থানীয়ভাবে প্রথমে মিলনার্স কোম্পানী ও পরে বগুড়া হাব থেকে প্রস্তুতকৃত পাম্প সেচ কার্যক্রম প্রসারে বিশাল ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও অনেক সাহায্য সংস্থা ও এনজিও ক্ষুদ্র হস্তচালিত সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারিত করে, যা দরিদ্র কৃষকদের উফশী ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দান করে। এর সঙ্গে বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠা

যন্ত্র প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলো গ্রামীণ মেকানিক তৈরি ও স্থানীয় পর্যায়ে ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

৫. পানি মাটি আবহাওয়া

বিশাল জনবহুল দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা এমনিতেই অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত তাগিদ অব্যাহত রেখেছে। এর সঙ্গে সহায়ক হয়েছে দেশের উর্বর মাটি, মৌসুমি বৃষ্টিপাত, পানির প্রাপ্যতা, কৃষিতাত্ত্বিক জ্ঞানের সমাহার ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি-আবহ অঞ্চলে উফশী ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। যেহেতু দেশটি নদীমাতৃক, সুলভে প্রাপ্য ক্ষুদ্র ইঞ্জিন নৌ-পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তীকালে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার বিস্তৃতির ফলে ক্ষুদ্র ইঞ্জিন সড়ক পরিবহনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

৬. কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা

বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও গ্রামোন্নয়নে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে আলোচনা হয় ও প্রায়ই সঠিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয় না। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটরা সরাসরি কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কাজে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কৃষি ব্যবসা যেমন সার, বীজ, সেচ, যন্ত্রপাতি, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে কৃষি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ কমে গেলেও বাংলাদেশে এখনও উচ্চতর কৃষি শিক্ষার আবেদন কমেনি; বরং কৃষির বাণিজ্যিকায়ন প্রসারের সাথে সাথে কৃষি একটি লাভজনক পেশা হিসেবে এর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এটাও বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় দেড় ডজন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর গবেষণা কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিশাল ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার প্রথম দিকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রমাণ করে।

৭. বৃহত্তর শিক্ষাজাগতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা গোড়া থেকেই স্পন্দমান একাডেমিক আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ পেয়েছে। অসংখ্য গবেষণা, মাঠ পর্যায়ের জরিপ, সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। ১৯৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্মসূচী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমবায় খামার বিষয়ে গ্রামভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রথম বারের মত মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভূমিহীনতা ও বর্গা প্রথার ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সংগঠন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন বিতর্ক, আলোচনা ও মতামত প্রদান অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন

গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৬২ গ্রাম জরিপ, যা মাহাবুব হোসেন শুরু করেছিলেন, কৃষি, গ্রাম ও সামাজিক পরিবর্তনগুলো অনুধাবন করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ধানসহ অন্যান্য ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, আধুনিক চাষ পদ্ধতি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার মৎস্য চাষ ও প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা ও প্রকাশিত জার্নাল, প্রবন্ধ, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ ও পরিবীক্ষণ কাজে সহায়ক হয়েছে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের সেরা অর্থনীতিবিদ ও পেশাজীবীদের নিয়ে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এটাও বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য যে শুরু থেকেই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনের নিরিখে নীতি-কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের এক ইতিবাচক অন্তর্নিহিত শক্তি।

৮. অবকাঠামো, যোগাযোগ ও শক্তি

সুবিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন, পরিবহণ, কৃষি যন্ত্রপাতির স্থানান্তর সহজতর ও ব্যয়সাশ্রয়ী করেছে। এ জন্যে গ্রামীণ উদ্যোক্তারা কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ের অবস্থার আলোকে নানা রকমের ভাড়া ও চুক্তিব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে। এতে একদিকে গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপর দিকে এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মসংস্থান বাড়ছে।

বাংলাদেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভার, যা ইউরিয়া সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ প্রথমেই দুটো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি হচ্ছে প্রাপ্তব্য গ্যাস রপ্তানি না করে দেশের শিল্পায়ন, পরিবহন ও কৃষি উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা; এবং অন্যটি হচ্ছে 'চয়েস অব টেক্‌নিক' যার মাধ্যমে সেচ পাম্প, ট্রাক্টর, থ্রেসার মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনায় ডিজেল ফুয়েল এর ব্যবহার। এখন অবশ্য কৃষিতে বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য সৌরশক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৯. কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন

বাংলাদেশের কৃষির বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খোরপোস কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর। ক্ষুদ্র কৃষকও এখন বাজারের কথা মাথায় রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন করে। কৃষি শ্রমিকের ঘাটতির ফলে গ্রামাঞ্চলেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে কৃষকের মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি ও শিল্পের বিনিময় হার কৃষির বিপক্ষে। এ অবস্থায়, কৃষি কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। দেশে বর্তমানে ৩৫ হাজার ট্রাক্টর, ৭ লক্ষ পাওয়ার টিলার, ৪ লক্ষ শক্তিচালিত থ্রেসার, ১৫ লক্ষ অগভীর নলকূপ, ২ লক্ষ পাওয়ার পাম্প, ৩৫ হাজার গভীর নলকূপ চলছে। সর্বশেষ সংযোজন ধানের চারা রোপণ যন্ত্র, রিপার ও কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টার, যার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এর ফলে বাড়ছে উৎপাদন। চালের উৎপাদন এখন স্বাধীনতার সময়কাল থেকে প্রায় চারগুণ বেড়েছে। খাদ্যশস্য, গম, ভুট্টা, শাকসব্জির উৎপাদনে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটা কিছুটা ওঠানামা করে, এটা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, কৃষকের লাভটা কতটুকু এবং তা কতখানি টেকসই করা যায়। উত্তরটা জটিল এবং চিরচেনা। এ বছর কোন ফসলে ভালো লাভের মুখ দেখলো তো পরের বছরই ক্ষতি। তবে ঐ বছরেই হয়ত অন্য আরেক ফসলের দাম ভালো, কৃষকের মুখে হাসি। যেমন, এই মৌসুমেই আলু-মুলায় মুখ কালো, ফুল

কপিতে হাসি। এটাকে অনেকে 'কবওয়েব থিওরি' দিয়ে মৌসুম নির্ভর কৃষি পণ্যের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীন অবস্থায় দামের ওঠানামা ব্যাখ্যা করেন। বড় পরিসরে দেখলে এটা মেনে নেয়া যায়, অবশ্য যদি বাজারের সব খেলোয়াড় নিয়ম মেনে চলতো। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক:

প্রথম: ধানের কথা ধরা যাক। ভরা মৌসুমে দাম পড়ে যায়, গরীব চাষীর যখন তখন বিক্রি করা দরকার। সরকার সংগ্রহমূল্য ঘোষণা করে প্রায়শ দেরিতে, তাও আবার বাজার মূল্যের চেয়ে খুব বেশি নয়। সংগ্রহ কেন্দ্রের ঝক্কি ঝামেলা তো আছেই। ভেজা ধান, অল্প পরিমাণ, চিটা ধান নানা কারণে সংগ্রহ মূল্যের সুবিধা কৃষক পায় না। ফড়িয়া বেপারি ও চালকল মালিকদের পোয়াবারো। এখানে অনৈতিকতার দায় কার? নিশ্চয়ই কৃষকের নয়। এ বছর অবশ্য ধান চালের দাম ভালো, আমনে লাভ হয়েছে। আশা করা যায়, এ দাম টিকে থাকলে বোরো চাষে কৃষকের উৎসাহ থাকবে অর্থনৈতিক যৌক্তিক কারণেই।

দ্বিতীয়: উদাহরণটি বেশ অস্বস্তিকর। সেটা হচ্ছে এবারের আলু। দাম একেবারে পড়ে গেছে। আলু চাষী কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বের করছে না, খরচ উঠছে না বলে। নতুন আলু উঠে আসবে শীঘ্রই। তারা পড়েছে দোটানায়, না পারছে গুদাম খালি করতে, না পারছে নতুন আলু রাখার জায়গা করতে। এখানে নীতি নৈতিকতার প্রশ্নটি অজ্ঞাত। সবাই দোষ দিচ্ছে চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদনকে। আমাদের লাগে বছরে ৬০ লক্ষ টনের মত, রপ্তানি হয় ৪০ লক্ষ টনের মত। বাড়তি উৎপাদন নাকি ২০ লক্ষ টন। রপ্তানি নাকি আশানুরূপ হয়নি এবার। আমি মনে করি অনৈতিক যদি কিছু থেকে থাকে তা আলু চাষির নয়। এই তো ২০১৪ সালের কথা। নতুন আলুর পরিবর্তে ব্যকটেরিয়াল উইল্ট আক্রান্ত পুরানো আলুর কনসাইনমেন্ট রাশিয়া ফেরত পাঠায়। সেই থেকে ঐ দেশে আলুর রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ২০ শতাংশ রপ্তানি বোনাস নেয়ার পর এই অপকর্মটি অনৈতিকতার উদাহরণ। আর যেহেতু বেশি উৎপাদন হবে টের পাওয়া যাচ্ছিল, আগে থেকেই আলু কোন খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ হয়ত ছিল। কৃষকের অর্থনীতি বেশ ভঙ্গুর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

তৃতীয়: উদাহরণটি এবারের আমের। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও রপ্তানিকারকদের নিয়মিত পরামর্শ ও উৎসাহে চাঁপাইয়ের আম বাগানীরা আমের সুষ্ঠু পরিচর্যা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছে নিজের অর্থ খরচ করে। শেষ পর্যন্ত কী হলো; আমাদের প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন বিভাগ থেকে ছাড়পত্র মিললো না হয়ত যৌক্তিক কারণে। প্রধান আমদানীকারক ওয়ালমার্ট বাংলাদেশ থেকে আম নিতে অস্বীকার করলো। মার খেলো আমচাষী। এখানে কোন অনৈতিকতার প্রশ্ন আছে কিনা জানা নেই। তবে দাম কম থাকায় এবার পেট ভরে ল্যাংড়া, খিরসা পাতা, গোপালভোগ আম খেতে পেরেছে সাধারণ ভোক্তারা। রিচার্ড থ্যালার তো এবার অর্থনীতিতে নোবেলই পেলেন মানব আচরণের যৌক্তিক-অযৌক্তিকতা বিশ্লেষণের জন্যে।

চতুর্থ: সীড কোম্পানীগুলোও কি কম যান মাঝে মধ্যে? শাক-সবজি এমন কি হাইব্রিড ধানের বীজ সরবরাহেও কৃষকের প্রতারিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। কৃষককে সময়মত সঠিক জাত ও সঠিক মানের বীজ সরবরাহ না করে বীজ ব্যবসায়ীরা অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। আসলে জিরো সাম গেইম। পরিণামে দেশের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পঞ্চম: কৃষি ঋণের মামলা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক মিলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস করেছে গড়ে ৫০০০ টাকা ঋণ অনাদায়ের দায়ে। ১২,২৯২ জন কৃষকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৬২ কোটি টাকা। অথচ

জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪২০০ কোটি টাকা। মাত্র ছয় মাসে খেলাপির পরিমাণ বেড়েছে ১১০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোনো ঋণ খেলাপির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়েছে কিনা জানা নেই। অথচ তিনটিই রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। প্রথম দুটো গ্রামগঞ্জের কৃষকদের ব্যাংক, দ্বিতীয়টি ২য় বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ঋণ খেলাপিরা শহুরে রাঘব বোয়াল। এরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ অন্যটির অসহায় গ্রাহকরা মামলা হয়রানির শিকার। এটা তো কেবল অনৈতিক আচরণ নয়, বাণিজ্যিক কৃষি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়ও বটে।

সবশেষে, কৃষকের নিজেদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতার অভাব দেখা যায়। উদাহরণটা শাক-সবজি ফলমূলে কীটনাশকের ব্যবহার। শোনা যায়, কৃষক তার নিজের খাবার জন্যে অল্প কিছু জমিতে যে সবজি করে, তাতে কীটনাশক ছিটায় না। কিন্তু, যেটা বাজারে বিক্রির জন্যে বেশি পরিমাণে করে সেটায় ঔষধ ছিটায় ঠিকই, প্রায়শ অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি এবং বাজারে নেয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। এখানে কৃষকের অনৈতিক কাজটির জন্যে নাকি পেষ্টিসাইড কোম্পানীগুলোর সেল্‌স এজেন্টরা দায়ী। বেশি বেশি কমিশনের লোভে নাকি কৃষকদের অধিক পরিমাণে এবং কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় ঔষধ ছিটানোর পরামর্শ ও প্রয়োজনে বাকিতে বিক্রির ব্যবস্থাও করা হয়। মজার ব্যাপার হলো সেল্‌স এজেন্টদের এ ধরনের আচরণ যৌক্তিক, কেননা তারা তাদের কমিশন সর্বোচ্চ মাত্রায় নিতে চায়। কিন্তু কাজটি অনৈতিক, কারণ এটা কীটনাশক ব্যবহার নীতিমালা বিরোধী এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

পরিশেষে, প্রযুক্তি ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও নীতি নৈতিকতার বিষয়টি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বিচার্য। তবে, সঠিক নীতি সঠিক সময়ে প্রয়োগ এবং কর্মভেদে পুরষ্কার অথবা তিরষ্কারের ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। একেই তো আমরা সুশাসন বলি। অর্থনীতি চর্চার সব তত্ত্বই সুশাসনকে ধ্রুব বলে ধরে নেয়।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 033-050
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্যফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও পরনির্ভরশীল দেশগুলোর সংকট

হায়দার আলী খান*

ভূমিকা

বর্তমানের বিশ্ব পুঁজিবাদ যে গভীর সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সঠিক পথ কোন দিকে? মূলত এই জটিল আর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াটাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুত, এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং সাম্প্রতিককালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর, করপোরেট–চালিত প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন ন্যায়সংগতভাবেই বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবন্ধে সমালোচনাগুলোর মতাদর্শগত নির্মাণকে পাশ কাটিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনাগুলোকে বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গৃহীত স্বাধীনতাকেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিত ন্যায়-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা বৈশ্বিক ও স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাকে বর্ধিত করে। এটা দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বচ্ছ মূলনীতিভিত্তিক একটি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোই কাম্য। তবে বিশ্বায়নের বর্তমান চিড় ধরা প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি চিড় ধরা আঞ্চলিকতাবাদ বা এমনকি জাতীয় সংরক্ষণবাদ এবং দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে পারে।

তাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য, একটি ধাঁধা ব্যাখ্যা করা এবং সমাধানের এমন কৌশল বলে দেয়া, যা স্বাধীনতা-বর্ধক। ধাঁধাটি হচ্ছে বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বর, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএফআই) কাঠামোগত সংস্কার নীতিমালা এবং নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুসরণ সত্ত্বেও কেন আঞ্চলিকতাবাদ এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী সংরক্ষণবাদের দিকে একটি ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে? এর পেছনে এই প্রবন্ধে প্রধান যে যুক্তিটি দেখানো হয়েছে তা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়ন প্রকল্পের ভিত্তিমূলে একটি অসংগতি রয়েছে, যা বাস্তব পৃথিবীতে অসমতার প্রভাবগুলো অনুধাবনে প্রতীয়মান প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। অধিকন্তু, এটা তাদের বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল নীতিকে অগ্রাহ্য করার পথ করে দিয়েছে। ন্যায্যতার বিষয়গুলোকে উপেক্ষার মাধ্যমে বিশ্বায়নের বর্তমান নেতারা অর্থনৈতিক দক্ষতাকেও ক্ষতির সম্মুখীন

* জন ইভান্স ডিসটিংগুইশড ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর, জোসেফ করবেল স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র.

করার ঝুঁকি নিচ্ছেন। তাই আমার লক্ষ্য, 'বিশ্বায়ন এবং এর অসন্তুষ্টিগুলো'কে বোঝার চেষ্টা করা (স্টিগলিৎস ২০০২, ২০০৬; খান ১৯৯৪, ১৯৯৫a, ১৯৯৫b, ১৯৯৬, ১৯৯৭a, ১৯৯৭b, ১৯৯৭c, ১৯৯৮, ১৯৯৯a, ১৯৯৯b, ২০০৪a, ২০০৪b, ২০০৫, ২০০৭; খান এবং লিউ ২০০৮, খান ২০১৩a, ২০১৩b, ২০১৪) এবং সামনে এগোনোর কিছু দিকনির্দেশক মূল নীতি প্রস্তাব করা।

বরাবর ব্যবহারের ফলে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি ইতিমধ্যে একাডেমিক ক্লিশেতে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে, উৎপাদনের বিশ্বায়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের উৎপত্তি– এই দুটি প্রবণতা বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত গভীর রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। কিছু ক্ষেত্রে এই দাবিটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু, সম্প্রতি কয়েকজন পর্যবেক্ষক (হ্যারিস ১৯৯৮, খান ১৯৯৮, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬) উল্লেখ করেছেন, সাধারণ ব্যবহারে বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনাত্মক শ্রেণির, বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণির নয়। এছাড়া, বর্ণনাত্মক শব্দ হিসেবে এটি যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন। কিন্তু, বিশ্বায়নসংক্রান্ত সুবিশাল এবং ক্রমবর্ধমান রচনাবলিতে প্রায়ই এটি অনুপস্থিত থাকে। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এটাই প্রতীয়মান হয়, বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক একীভূতকরণের একটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া; যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। ব্রেটন উডস কাঠামোর উৎপত্তিকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বকে একীভূতকরণ এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলধনের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের একটি পথ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ব্রেটন উডস কাঠামোর পতন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট উদারীকরণের পথে গতি সঞ্চার করে, যা সাধারণত বর্তমান বিশ্বায়নের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক। তবে, এই প্রক্রিয়াও একেবারেই অস্থিতিশীল। এটি মেক্সিকোর ও আরও সাম্প্রতিক এবং এমনকি আরও নাটকীয় এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং অতি সাম্প্রতিক একুশ শতকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে। এমনকি আদর্শ নব্যধ্রুপদি হেকসার–ওলিন–স্যামুয়েলসন মডেলের মধ্যেও একই সময়ে বাণিজ্যের একীভূতকরণের ফলে উত্তরের অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পেতে পারে; ফলে সেখানে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে (ক্রুগম্যান ১৯৯৬, উড ১৯৯৪)। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণে আরও বেশি সমতা বিধান হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু, বাস্তবে এমনটি ঘটার খুব কম প্রমাণই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বরকে সতর্কতার সঙ্গেই মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বড় জোর, আমরা একটি 'চিড় ধরা' বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

যদিও কয়েক দশক ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা আন্তসীমান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে এবং বলতে গেলে একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলোর বিধিব্যবস্থা কমানোর সহায়তায় সংঘটিত বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ অর্থনৈতিক একীভূতকরণ এবং আঞ্চলিক জোট গঠনকে তরান্বিত করেছে (কুক এবং কার্কপ্যাট্রিক, ১৯৯৯, খান ২০১৭)। এক নতুন ধরনের শ্রম বিভাজন এবং গুণগতভাবে একটি ভিন্ন ধরনের সম্পদ ব্যবহার, উৎপাদন এবং মূলধন সঞ্চয়ের উৎপত্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে বৈশ্বিক আন্তনির্ভরশীলতা এবং একটি অসম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গ্রামের সৃষ্টি। সুতরাং, কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এখানে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১. উপরতলার বিশ্বায়ন এবং গণমুখী বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন বলতে বর্তমান বিশ্বে কী বোঝায়? গত চার দশকে এ বিশ্বায়ন পৃথিবীকে কোন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? বিশ্বায়নের ফলে পুঁজিবাদের যে বর্তমান সংকট চলছে, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং নিচের থেকে বিশ্বায়ন, এই দু'রকম বিশ্বায়নের পার্থক্য নির্ণয় করার প্রাথমিক প্রস্তাবনাই এ প্রস্তাবের মূল বিবেচ্য বিষয়। কাজেই প্রবন্ধের প্রথম লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা। পরে সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বায়নের বিকল্প হিসেবে অন্য ধরনের গণমুখী বিশ্বায়নের আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ্য, দু'ধরনের বিশ্বায়নকেই আমি Complex Systems Analysis বা জটিল গাঠনিক বিশ্লেষণ এবং একই সাথে দ্বান্দ্বিক শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করব।[২] এই দ্বান্দ্বিক জটিল গাঠনিক বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি সচরাচর চলমান এবং নানা রকম দ্বন্দ্বে আক্রান্ত। এই দ্বন্দ্বগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রবণতা আছে। বিশ্বায়নের যুগে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে তার উন্নততর এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির উঠতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট একটি নতুন রূপ ধারণ করেছে। একই সাথে দরিদ্র দেশগুলোর সংকট আরো বেড়ে গেছে।[৩] এর সাথে যুক্ত হয়েছে অধিকতর অগ্রসর হারে পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আশু ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাবলী।

১৯৭০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী মন্দার আশঙ্কা দেখা দেয়। একাধারে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের একটি দিক। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্থিতিশীলতার সন্ধানে যে পুঁজি শ্রমকে সে ছাড় দিয়েছিল, সেই সামাজিক চুক্তির অস্থিতিশীলতা। সত্তরের সংকটের সময় থেকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো শ্রেণি সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুঁজির স্বার্থ রক্ষার কাজে অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে এবং আশির দশকে Reagan–Thatcher -এর যুগে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূর্বোক্ত সামাজিক চুক্তির ওপর আঘাত নেমে আসে।[৪]

প্রায় একই সময়ে তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি পুঁজিবাদী উন্নয়নকামী দেশ বিদেশি ঋণের ভারে নত হয় পড়ে। লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, এশিয়ার ফিলিপিনস এবং আফ্রিকার নাইজেরিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই ঋণ-সংকট বা Debt-Crisis-এর সম্মুখীন হয়। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক প্রধানত স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন, ম্যাক্রোপলিসির রক্ষণশীলতা ইত্যাদিসহ সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য যে, তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশের শাসক এবং শোষক শ্রেণির সহযোগিতার ফলেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আশি ও নব্বইয়ের দশকে এই কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়।

বিশ্বায়ন অনেকাংশেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সোশ্যাল ডেমোক্রেসী বা সামাজিক গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতন্ত্র–এই দুই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রায় উনিশ শতকী উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি, রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক পাশ্চাত্যের উপরতলায় প্রায়-ধসে-যাওয়া কৃত্রিম কসমোপলিটান ও ভোগবাদী আদর্শকে স্থাপিত করাই ছিল এর সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি।

২. উপরতলার বিশ্বায়নের সংকট

নব্বই দশকের প্রথম ভাগটি ছিল পুঁজিবাদের এই নতুন কর্মসূচির অনেকটা অনুকূল। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের আমলে তৈরি শ্রমিকনেতারা পুঁজির বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। তদুপরি, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা– এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে সাহস ও শক্তি যোগায়। কিন্তু, ১৯৯৫-এর পর থেকেই বিশ্ব-পুঁজিবাদীদের অভ্যন্তরীণ সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে থাকে। আমি ১৯৮৫ সাল থেকেই পুঁজিবাদের সংকটের গভীরায়নের বিশ্লেষণ করে আসছি। আমার এই বিশ্লেষণের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই পুঁজির ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ২০০৭ সাল নাগাদ টেনে আনে আরও ঘনীভূত বিশ্ব-সংকট। এ সংকটের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বর্তমান বিশ্বায়নের তত্ত্ব অনুযায়ী বাজারকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করলেই এর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম যে পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই যে পরিমাণে সরকারি অর্থ খুবই স্বল্পহারে পুঁজিবাদী শ্রেণির হাতে এসেছে, এতে সত্যিকার বিনিয়োগ বেশি বাড়েনি; বরং, শেয়ার মার্কেটের কৃত্রিম উল্লম্ফন বেড়েছে মাত্র। সুতরাং, আমাদের বুঝতে হবে, বিশ্বপুঁজিবাদ এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং হয়তো পারবেও না। তাহলে বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কী রকম?

৩. বর্তমান সংকট: উপরতলার রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ

ইউরোজোনের সংকট (২০১১-) থেকে মনে হয় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রেণি মূলত নিজেদের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। একই সাথে অর্থনৈতিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে চটপট বড় বড় ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদিকে সাহায্য করতেও তাদের আপত্তি নেই। সুতরাং, বিশ্ব পুঁজিবাদের উপরতলার পুঁজিপতি, রাজনীতিবিদ, আমলাগোষ্ঠী, তাত্ত্বিকেরা এবং প্রচারমাধ্যমগুলো উদারনৈতিক পুঁজিবাদে বিশ্বাসী।

উপরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নব্য-উদারনৈতিক পুঁজিবাদ সংকট থেকে এই জটিল সিস্টেমকে রক্ষা করতে পারবে না। যেকোনো জটিল সিস্টেমের অনেক রকম পজিটিভ ও নেগেটিভ ফিডব্যাক লুপ থাকে। নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমকে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়। পজিটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমকে অস্থিতিশীলতার দিকে চালিত করে। উপরতলার বিশ্বায়ন স্বাভাবিকভাবেই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরসহ গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই এক ধরনের অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী কেইনসীয় পদ্ধতি চালু করা এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, যা নাকি পুঁজিপতিদের অধিকারকে অনেক খর্ব করতে বাধ্য। বর্তমানে পুঁজিপতি শ্রেণির অধিকারবোধ অত্যন্ত প্রবল। এসব দেখে মনে হয়, এই শ্রেণির পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলগার রাশ টেনে ধরা বেশ কঠিন, হয়তোবা অসম্ভব। তাহলে কোন রাজনৈতিক শর্তাবলির প্রয়োজন হবে আগামী বছরগুলোতে? যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের নির্বাচন কি ফ্যাসিজমের উত্থানের লক্ষণ?

৪. ফ্যাসিবাদী জাতীয়তাবাদ

২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্তমানে এই ২০১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে সংকটের ঘনায়মান রূপ অনেকাংশেই দৃশ্যমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত বিজয় এখন আর অতটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। নির্বাচনের ঠিক আগেই ট্রাম্প যে ওবামার উপরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ক্ষিপ্ত ওহাইয়ো, মিশিগান ও উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের শ্রমিকদের ভোটগুলো পাবেন সেটা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম। আর সে জন্যই হিলারির বৈদেশিক নীতির হঠকারিতামূলক দিকগুলো নির্দেশ করেও আমি হিলারীকে ভোট দেয়ার সপক্ষে Huffington Post–এ একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্ট্রাটেজিক দিক দিয়ে বিচার করলে ট্রাম্প কিংবা ল্যুপেনের উগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ আর হিলারি কিংবা ব্রিটিশ লেবার পার্টি, বিশেষ করে ব্লেয়ারের নিউ লেবার মতাদর্শ–অথবা জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এদের ভেতরে মূল তফাৎ সামান্যই।

পুঁজিবাদের সংকটের যুগে একদিকে যেমন নিজ নিজ দেশের শ্রমিক তথা আপামর জনগণকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছাড় দেওয়া কঠিন, অন্যদিকে জনগণের বিদ্রোহ এমনকি বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিজমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি আলোচনা যদিও এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়, তবু এতটুকু বলা দরকার, চীন-রাশিয়ার অপেক্ষাকৃত উত্থান – ১৯৯০ এর দশকের তুলনায় – এবং ন্যাটো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় ঘাটি গঠন ও সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ পৃথিবীকে আবার গভীর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকটের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় স্পষ্ট।

এক, বিশ্বময় এমনকি নড়বড়ে কেইনসীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক অর্থনীতি ও সীমিত গণতন্ত্র চালু করা প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতার বাইরে। এতদিন নব্য উদারবাদী মতাদর্শের জন্য এ বিষয়ে রাজনৈতিক ইচ্ছাও লক্ষ করা যেত না। এখন ইচ্ছা যদিও তৈরি হয় প্রধান দেশগুলোর পুঁজিবাদীদের স্বার্থ যা নাকি অন্যান্য দেশের উচ্চস্তরের পুঁজিবাদীদের স্বার্থ পরিপন্থী তাদেরকে খুব সম্ভবত বিরাজমান ও ভবিষ্যতের আরও উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বপুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাউটস্কীয় (অথবা বর্তমানের কাউটস্কীর মতো মার্কসবাদী) শান্তিপূর্ণভাবে ভাগাভাগি করে শাসনের সুযোগ ১৯৯০-এর দশকে যতটা ছিল ততটা আর থাকবে না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথমটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুঁজিবাদের এই সংকটের যুগে বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশগুলোতে–পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কমবেশি এরকমই এই একবিংশ শতকে–বর্ণবিদ্বেষ সংখ্যালঘুদের উপর দোষ চাপানো এবং বহুবিধ নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে অন্যত্র আমার লেখা দেখতে পাঠকদের অনুরোধ করব। সংক্ষেপে, পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত শান্ত পুঁজি জমানোর যুগে উদারনৈতিক রাজনীতি সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উগ্র ফ্যাসিজমকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু, সংকটের সময়ে উদারনৈতিক মতাদর্শ ও সংগঠন ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ ও সংগঠন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের কাছে মার খায়। অন্তত পক্ষে বিংশ শতকের সংকটের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

তাহলে এই সংকটের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? যদিও সবরকম প্রগতিশীল আন্দোলনই খুবই দরকার এবং এ আন্দোলনগুলোর যৌক্তিকতা সীমাবদ্ধ হলেও এর কার্যকারিতায় আমি আস্থা রাখি, ইতিহাসের রায় হচ্ছে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে নতুন সমাজে গণতন্ত্রের গভীরায়নে ব্যর্থ হলে পুঁজিবাদ-

বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বারবার মানবসমাজকে সংকটের ভেতর টেনে নেবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চরম এক প্রাকৃতিক সংকট। সুতরাং, পুঁজিবাদের বিকল্প প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবজাতির ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে নিচ থেকে বিশ্বায়নই হচ্ছে এই সংবর্ত কাটিয়ে সভ্যতাকে গড়ে তোলার প্রধান শর্ত। আসুন আমরা এবার এই দিকটিকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

৫. নিচ থেকে বিশ্বায়ন: বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি

এখানে প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, উপরতলার বিশ্বায়নই একমাত্র বিশ্বায়ন নয়। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবনচর্চা, ধর্ম ও দর্শন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে। অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন, কীভাবে ভারতীয় গণিতের 'শূন্য' সংখ্যা এবং ত্রিকোণিমিতির 'সাইন' ফাংশনটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসে। প্রাক্-পুঁজিবাদী যুগে বৌদ্ধ দর্শনও এভাবেই তিব্বত-চীন হয়ে পূর্ব এশিয়ায় এবং শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। কিন্তু, পুঁজিবাদের যুগে শ্রম ও পুঁজির রপ্তানি পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্বটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। মার্কস তার পুঁজি প্রথম খণ্ডের সংযোজন অংশে 'ফর্মাল ও রিয়াল সাবসাম্পশন অফ লেবার' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরে ঠিক সত্যিকার অর্থে মজুরি-শ্রম আনুষ্ঠানিক রূপ ধারণ করতে পারে না। অনেক প্রাক-পুঁজিবাদী শ্রম পুঁজিবাদের ফর্মের ভেতর উপস্থিত থাকে। কিন্তু, যতই পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ততই মজুরি-শ্রম সত্যিকার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সামাজিক বিবর্তনের অন্তত দুটি দ্বান্দ্বিক রূপ আছে। এক, পুঁজি ক্রমশ শ্রমকে গ্রাস করতে থাকে। দুই, শ্রম পুঁজিকে নিজের স্বাধীন সৃজন ক্ষমতার, এমনকি জীবিকার প্রয়োজনেরও বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখতে সক্ষম হয়। শ্রেণি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শ্রমিকদের নতুন শ্রেণিভিত্তিক এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ হয়। শত প্রতিকূলতার ভেতরেও শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্রদের আন্দোলনের একটা বাস্তব ভিত্তি গড়ে ওঠে।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ইতিহাস মার্কসের এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। বিশ্বায়নের যুগে তৃতীয় বিশ্বও আজ শিল্পায়নের পথে চলেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– বিশ্বপুঁজির নিয়ন্ত্রণে বেশির ভাগ দেশেই কৃষিতেও পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ ও শ্রমসম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে। অনেক স্থানীয় শ্রম-সম্পর্কের কিছুটা প্রাক্-পুঁজিবাদী-অবস্থান সত্ত্বেও এক অর্থে তার মধ্যে পুঁজিবাদী সম্পর্কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সারা বিশ্বেই নিচের থেকে আন্দোলন করার সুযোগ আগের চেয়ে বেশী। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দেখলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি মুঠোফোন থেকে আন্তর্জাল (Internet) পর্যন্ত দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে। ইতিমধ্যেই আশি ও নব্বই দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে শুরু করে এশীয় সংকটের প্র-ইন্দোনেশীয় আন্দোলন, লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই যুক্তিকে সমর্থন দেয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ীই আন্দোলন গড়ে উঠবে। তবে সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বায়ন পর্বে বিভিন্ন আন্দোলনের ভেতরে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষিত জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলোর মজলুম জনতার ভেতর একতাবোধ এবং শক্তির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ আন্দোলন গড়া শুরু হয়েছে। 'বিশ্ব সামাজিক ফোরামই এর একমাত্র নিদর্শন নয়; এমনকি প্রধান নিদর্শনও নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গত দশ বছরে যে সব আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে, সেগুলোর দিকে নজর দেয়াই বিশেষ দরকার। এসব আন্দোলনের দুটো দিক ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক দাবির সাথে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকটি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের মুক্তির আন্দোলনের সাথে নিচের দিক থেকে পরিবেশদূষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রামও এখন তীব্রতর হচ্ছে। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এমনকি আফ্রিকাতেও এই সংগ্রাম এখন স্পষ্ট হচ্ছে। এখনও এই সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদের বিপক্ষে নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সমাজব্যবস্থার দাবি প্রকট হয়ে উঠছে। আমার ধারণা, চুম্বক আকারে এ দাবি-দাওয়াগুলোকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানবাধিকার অর্জনের দাবিতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

২) এ দাবি অর্জনের সাথে বিশেষভাবে জড়িত বর্তমান বিশ্বায়ন বাণিজ্য ও মুদ্রাবিষয়ক নীতিমালা। নোবেল পুরস্কার জয়ী জোসেফ স্টিগলিটজ এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদ এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। কেবল গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেই এই দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমান বিশ্বের মুদ্রা পদ্ধতিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিপক্ষে। তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার সংস্কারের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নীতিমালাকেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থে সংশোধন করতে হবে।

৩) আন্তর্জাতিক পুঁজি ও বিনিয়োগ: বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী স্বার্থের এই বিনিয়োগ পৃথিবীতে আরও অসাম্যের সৃষ্টি করেছে। বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বড়জোর নিম্ন-মজুরীর কিছু কাজের সৃষ্টি করে, তাও আবার কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ তহবিল নামে নতুন সংস্থা সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার দাবি তুলতে হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলো অগ্রাধিকার পাবে। আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল পুঁজি সংকটের সৃষ্টি করে। তাই এই পুঁজি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা আশু প্রয়োজন।

৪) আন্তর্জাতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ: প্রাকৃতিক সংকটের ফলেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পতন হয়তো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, এই সংকটের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের এই বিশ্বে অতি বর্বর ডিসটোপিয়ান ভবিষ্যৎকেই হয়তো অনিবার্য করে তোলা হবে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ও বিশ্বব্যপী তাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিকে যুক্ত করতে হবে।

৫) সম্পদের পুনর্বণ্টন ও মানবিক উন্নয়ন: পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন অসাম্যকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। এর বিকল্পে গণভিত্তিক বিশ্বায়নকে কার্যকরি করতে হলে ভূমি, পুঁজি ও অন্যান্য সম্পদের পুনর্বণ্টন খুবই দরকারি শর্ত। অর্থনৈতিক সাম্যভিত্তিক পুনর্বণ্টন ছাড়া নিচের থেকে বিশ্বায়ন অসম্ভব।

৬) নারী-পুরুষের সাম্য: অতীতের সব প্রগতিশীল আন্দোলনই নারী-পুরুষের সাম্যের দাবী তুলেছে। এঙ্গেল্সের মতে যে কোনো সমাজের উন্নতির জন্য কেবল একটি সূচক ব্যবহার করতে নারী-পুরুষের অসাম্য সূচককেই ব্যবহার করা উচিত। বর্তমান বিশ্বের নারীআন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু নিপীড়িত জনতার মুক্তির সংগ্রামকে অবশ্যই নারীমুক্তির সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

৭) গণতন্ত্রের গভীরায়ন: আমরা শুরু করেছিলাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা দিয়ে। কিন্তু এই আন্দোলন শুধু ফর্মাল একাধিক দলভিত্তিক নির্বাচনের দাবিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গণতন্ত্রকে গভীরতর করতে হলে বেশ কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শর্তের উল্লেখ প্রয়োজন। কেবল এই শর্তাবলির সার্থক প্রয়োগই গণতন্ত্রকে গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। নিচে সংক্ষেপে কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত উল্লেখ করা হলো।

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী চালু করা। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনের এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। গণতন্ত্রের গভীরায়নের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূরীকরণের নীতি অপরিহার্য।

- এই প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার অর্থ হলো গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিকতাবোধের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে হবে।

- অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে সব নাগরিকের জন্য উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অমর্ত্য সেনের 'কুশলতার অর্থনীতির' দৃষ্টি থেকে বলা চলে, সামাজিক সক্ষমতার সাম্য দরকার। তবে এ জন্য যে অভ্যন্তরীণ সংকটের বিশ্লেষণ করে আসছি সেটা বোঝা দরকার। অন্যান্য প্রগতিশীল বিশ্লেষকের মতো আমিও পুঁজিবাদের সংকট-পূর্ণ অবস্থানের তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আস্থা পোষণ করি। কিন্তু, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি বিশ্লেষণে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং কর্মকাণ্ডের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। কেইনসীয় অর্থনীতির সত্তর দশকের আপাতব্যর্থতা নব্য-উদারনৈতিক বিশ্বায়নের আশির দশকের সফলতার একটি মূল কারণ হলেও, আশির দশকে প্রগতিশীল আন্দোলনের ব্যর্থতা রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এ প্রসঙ্গে না গিয়ে নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধের পুঁজিবাদের যে বিশ্ব-সংকট শুরু হয়েছে সে দিকেই আমি আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফাইনান্স ক্যাপিটালের যুগে পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রায়ন সংকটের ভেতর দিয়েই অগ্রসরমান। এ সংকট পৃথিবীকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভেতর টেনে নিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চীন-বিপ্লবের ভেতর দিয়ে পৃথিবী সমাজতন্ত্রের দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসরও হয়েছে। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পতন এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের সাময়িক বিজয় নব্য-উদারনৈতিক পুঁজিবাদী সিস্টেমকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এর প্রধান কারণ, বিশেষ করে মুদ্রা ও ফাইন্যান্সিয়াল বাজারগুলোকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা এবং দুর্বল দেশগুলোর অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে ফেলা। এ জন্য জটিল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে যে স্ববিরোধী প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো শুধু বাজার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না (খান ২০০৪)। এর সাথে যোগ করা যেতে পারে অতিকেন্দ্রীভূত পুঁজির পারস্পরিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং উন্নত বিশ্বে মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার ফলে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোতে পুঁজির রপ্তানি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৯৮ সালের রাশিয়া ও ব্রাজিলের সংকট অথবা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তৎকালীন সামাজিক সংকট অনেকটা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। এ সঙ্কটগুলোর সময়কাল অবশ্যই অনেক তাৎক্ষণিক ঘটনাবলির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, নব্য-উদার নীতির দশকের ভেতরে এসব সংকট কমবেশি দেখা দিতে বাধ্য।

এশীয় সংকটের পরেও বিশ্বপুঁজিবাদ সাবধান হতে পারেনি অনেকের সাবধানবাণী সত্ত্বেও।৭ অর্থবাজারে সংকটের পরে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টের দ্বারা অন্তত এই সেক্টরে মুনাফার হার বাড়ানো হয়। একই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের চেয়ারম্যান গ্রীনস্প্যানের উদার মুদ্রানীতি ফাইন্যান্সিয়াল এবং রিয়াল এস্টেট বাজারে পুঁজির পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বায়নের যুগে এসব নানাবিধ কারণে অধিকতর বিকল্প বিশ্বায়নের প্রয়োজন সেটা অমর্ত্য সেনের অনুসারীদের বিশ্লেষণে স্থান পায়নি।

- মতপার্থক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অবস্থান থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দল ও মতকে প্রকাশ করার আরও অধিকারের দাবি।
- সবচেয়ে নীচের ধাপের সামাজিক ও রাজনৈতিক দলকে একক হিসেবে ধরে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপরের স্তরগুলোর গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও এই গণতান্ত্রিক গভীরায়ন স্বীকৃত হবে।
- একেবারে মহল্লা পর্যায় থেকে শুরু করে উপরের সর্বস্তরব্যাপী গণতন্ত্রের গভীরায়নের সমস্যাবলি সম্পর্কে খোলা আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ থাকতে হবে।
- অন্যায় আইনের আন্দোলন, ধর্মঘট এবং অহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শনের সব উপায় জনগণের জন্য খোলা থাকতে হবে।
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতারা জনগণের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের শামিল হবেন, যেন গণবিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি না হয়।
- যতক্ষণ পর্যন্ত তা সরাসরি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবিরোধী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সব ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।
- স্বাধীন বিচার বিভাগ, যোগাযোগব্যবস্থা ও নির্বাচনী রিভিউ কমিটিগুলোকে বাধাহীনভাবে কাজ করতে দেয়া হবে।
- যেখানেই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি নির্ধারণ চালু করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে, যেমন নারী ও সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুতে রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা চালু থাকবে।
- সাধারণ নাগরিকদের সংঘবদ্ধভাবে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ, রাজনৈতিক দল গঠন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যক্তিগত সম্পদের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালনার অধিকার একটা সীমিত অংকের হবে এবং যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য লোপ পাবে, তখন সামাজিক সংগঠনই গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল মাধ্যম।
- গুপ্ত পুলিশ, নির্যাতন ও জুলুমের অবসান। যতটা সম্ভব, জননিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ নাগরিকদের সংগঠনের মাধমে করার উদ্যোগ।
- জনহিতকর কাজে সবার সাধ্যমত অংশগ্রহণ।
- সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য র‍্যাংকবিহীন (কিন্তু নেতৃত্বহীন নয়) নয়া গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী গঠন।

- নারী- অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অগ্রসর করে পিতৃ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং নারী-পুরুষ সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলা।

- শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া চালু করা। ফরাসী দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ দেলুজ এবং গুয়াত্তারি ব্যক্তি এবং গ্রুপ সাজেক্টিভিটির যে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেখান থেকে শুরু করে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের অসুস্থতা দূর করার পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অবশ্যই এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেলে নবতর সমাজ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো আরও গভীর ও উন্নত হবে।

- এমন ধরণের উন্নয়ন কৌশল এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবনা করতে হবে যাতে পরিবেশদূষণ এবং বিধ্বংসীকারী পথ থেকে সরে এসে প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে বসবাস করা সম্ভব হয়।

- সর্বোপরি, সমাজব্যবস্থার এমন ধরনের গণতান্ত্রিক ফিডব্যাক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়। একই সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্য হবে জনগণের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের গভীরায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, গণতান্ত্রিক গভীরায়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরের শর্তাবলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

প্রাসঙ্গিক আরও শর্ত অনেকে যোগ করতে উৎসাহী হতে পারেন। এটাও গণতন্ত্রের গভীরায়নের অংশ এবং একটি খোলা দিক। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশলের যুগে এসব বিষয়ে খোলা আলোচনা এবং মতবিনিময় একেবারে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। কিন্তু, আসল চ্যালেঞ্জ হলো সফল গণ-আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

এখন পর্যন্ত আধুনিক কালের নানা আন্দোলন যেমন, ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ থেকে শুরু করে আমেরিকান বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, প্যারিস কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীনের বিপ্লব, তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনসমূহ এবং অতিসাম্প্রতিক বিশ্বায়নবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। ভবিষ্যতের আন্দোলনও নানামুখী টানাপোড়নে আন্দোলিত হবে। এজন্যই গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা এবং গণতন্ত্রের গভীরায়নবিষয়ক শর্তাবলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতির নানান দিক বিশ্লেষণ করলে এই উপলব্ধিই হয় যে, গণতন্ত্রের গভীরায়ন ব্যতিরেকে বিকল্প বিশ্বায়ন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সবশেষে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, এই বিকল্প বিশ্বায়নের চিন্তা ইউটোপিয়ান কি না? এ প্রশ্নের উত্তর অন্ততপক্ষে দুভাবে দেয়া যেতে পারে। এক, উপরতলার বিশ্বায়নের সংকট আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, বর্তমান বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংকট দূর হওয়ার নয়। বরং, পৃথিবী প্রাকৃতিক দিক থেকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে। বস্তুত মানবপ্রজাতি এবং বেশ কয়েকটি অন্য প্রজাতির বর্তমান ব্যবস্থা আগামী শত বছর ধরে চালু থাকলে ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে যাবে সুনিশ্চিতভাবেই। আমাদের দ্বিতীয় উত্তর হলো, নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামই এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। গণতন্ত্র ও জনকল্যাণ আংশিকভাবে হলেও আধুনিক যুগে কিছুটা এগিয়েছে। এই অগ্রসর মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সংগ্রাম। বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকতা বোধের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক

সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে না পারলে এটি প্রমাণিত হবে যে, মানবজাতির সীমাবদ্ধতা এই পৃথিবীতে দূর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, ইতিহাসের রায় শুধু মানবজাতির বিভিন্ন অংশের সংগ্রামের ভেতর দিয়েই ঘোষিত হয়। আর তাই আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই চলমান সংগ্রাম আরও দানা বেঁধে উঠবে, এ সংগ্রামের অংশি হবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এবং তৈরি হবে আরও ব্যাপক ও গভীর কর্মসূচির। আমার ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সব সংগ্রামী পথিকদের উদ্দেশ্যে। বলাই বাহুল্য, তাদের সংগ্রামের পথের প্রাথমিক দিশা দেখানোর দায়িত্ব সবারই। সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলোর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থেকেই শিগগিরই আমাদের পথ নির্দেশক কর্মসূচি এবং চিন্তা-পদ্ধতি আরো আলোকিত হয়ে উঠবে।

টীকা:

১. এ বিষয়ে Stiglitz (2007), Chang (2007) এবং Khan (1998, 2007, 2008, 2007 a,b এবং 2012) দ্রষ্টব্য।

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে Khan (2008)–G Financial Crisis প্রসঙ্গে। Khan (2012) উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে Complex System Analysis ব্যবহার করেছেন।

3. Sobhan (1989) দ্রষ্টব্য। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরকার তথ্য আছে Johnson (2004)–G।

৪. দেখুন Henry (2005) এবং Khan (2006, 2007, 2008) এশীয় সংকটের বিশদ আলোচনা রয়েছে Khan (2004 A, b) - তে।

৫. এ বিষয়ে অনেক তথ্যই এখন প্রকাশিত। Harve (2005) এ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। Khan (1992, 1993 a,b; 1994, 1995, 1998, 2003, 2006, 2007, 2011) বিশদ আলোচনা রয়েছে। Falk (1997)-এ নিচের থেকে বিশ্বায়নের সমালোচনা রয়েছে।

6. Khan (1985), Imperialism as World Capitalism: Global self Expansion of Value প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পৃথিবীময় তৎপরতার তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ, অবাধ বাণিজ্য ও অব-উন্নয়ন বিশ্লেষণ রয়েছে।

৭. দেখুন Stiglitz (2007) এবং Khan (2004 a, b Ges 2011)

৮. দেখুন Khan (2004b) এবং Khan (2011)

৯. এখানে মিশেল ফুকো (1997-9, 1969, 1975, 1976) বইগুলো বেশ প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ফুকোর আলোচনায় Resistance-এর রূপরেখা সামাজিকভাবে কী হওয়া উচিত এবং তার গঠনমূলক কর্মসূচী কি হওয়া উচিত তা বাদ পড়ে গেছে। সেন (2000) এবং সেন ও নুসবাইউম (1993) সক্ষমতার প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু, ব্যাপক গণভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কথা– যাকে আমরা সামাজিক রাজনৈতিক সক্ষমতা বলতে পারি– নেই। এর সমালোচনায় ভিত্তিকেই Khan (2006, 2007, 2009 এবং সর্বোপরি 2012) রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচি ও সক্ষমতার উপর জোর দিয়েছেন। Gilbert (1990) রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা Khan (1998, 2012) এবং Albert and Hahnel (1991) বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

১০. এ বিষয়ে, দেখুন Deleuze (1990, 1991, 1994), Deleuze and Guettari (1977, 1986, 1987), Derrida (1966, 1981) এবং Guattani (1984)| Khan (1998, 2007, Ges 2012) - এর লেখায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। Barber (1984, 2003)- এর লেখাতেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। এ দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিশ্বায়নের আলোচনা দরকার (Cook and Kirkpatrick 1997)। বলা যেতে পারে এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আমার বইটির Khan (1998) জন্ম।

তথ্যসূত্র

1. Adelman, I. and Robinson, S. (1978). Income Distribution Policy in Developing Countries: A Case Study for Korea, Palo Alto: Stanford University Press.

2. Baker, Dean, Epstein, G. and Pollin, R. (1998) Globalization and Progressive Economic Policy, Cambridge: Cambridge University Press.

3. Barber, B. (1995). Jihad vs. McWorld, New York: Random House.

4. Bonvin, J. (1997). "Globalization and Linkages: Challenges for Development Policy," Development 40 (2): 39-42.

5. Bosier S. (1997). The Elusive Goal of Regional Development: Between the Black Box and the Political Agenda. Edificio CEPAL: Stantiago-Chile.

6. Chang, Ha-Joon (2007), Institutional Change and Economic Development, London: Anthem Press.

7. Cook, P. and Kirkpatrick, C. (1997). "Globalization, Regionalization and Third World Development," Regional Studies 31 (1): 55-66.

8. Falk. R. (1997). 'Resisting 'Globalization-from-above' through 'Globalization-from-below', New Political Economy 2 (1): 17-24.

9. Greenspan, A. (1997). `Statement Before the U.S. House of Representatives Committee on Banking and Financial Services', Washington, D. C. 13 November.

10. Gills, K. B. (1997). "Editorial: 'Globalization' and the 'Politics of Resistance'," New Political Economy 2 (1): 11-15.

11. Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton, New Jersey.

12. Griffin K. and Khan A. R. (1992). Globalization and the Developing World: An Essay on the Structural Dimensions of Development in the Post Cold War Era. UNRISD, Geneva.

13. Harris, Laurence. (1998). "The Dynamics of Globalization: Eight Skeptical Theses", Paper presented at the UNU/AERC Conference, Tokyo, August 3-4, 1998.

14. Hirst, P. (1995). Globalization in Question, Political Economy Research Centre Occasional Paper Number 11. Sheffield, England: The Political Economy Research Center.

15. James, J. and Khan, Haider A. (1993). "The Employment Effects of Income Redistribution", World Development (March): 817-28.

16. ---------. (1997). "Technolgy Choice and Income Distribution" World Development, (February): 153-165.

17. ---------. (1998). Technological Systems and Development, London: Macmillan.

18. Jomo, K. S. (1998). "Introduction: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia," in Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 1-23.

19. Khan, Haider Ali and Yi-bei Liu, 2008, "Globalization and the WTO Dispute Settlement Mechanism: Making a Rule-based Trading Regime Work", http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7613/.

20. Khan, Haider A. forthcoming 2017 The Future of Global Society, Cosmopolis: Revue de cosmopolitique, Geneva.

21. Khan, Haider A. (2014). Development and Women's Rights as Human Rights: A Political and Social Economy Approach within a Deep Democratic Framework, 42 Denver Journal of International Law and Policy Vol. 42, No. 3 (Aug. 2014).

22. Khan, Haider A. (2013a). Development Strategies: Lessons from the Experiences of South Korea, Malaysia, Thailand and Vietnam, in Augustin K. Fosu ed. Achieving Development Success, Oxford University Press, 2013:119-132.

23. Khan, Haider A. (2013b). Basel III, BIS and Global Financial Governance, Journal of Advanced Studies in Finance, Volume IV, Issue 2(8), Winter 2013.

Khan, Haider A. (2007), "A Theory of Deep Democracy and Economic Justice in the Age of Postmodernism", http://econpapers.repec.org/paper/tkyfseres/2007cf468.htm

24. ------ Value, Social Capabilities, Alienation: The Right to Revolt, Econ Papers, 2006.

25. Khan, Haider A. (1998). Technology, Development and Democracy: Limits to National Innovation Systems in the Age of Postmodernism, Aldershot, U.K.: Edward Elgar.

26. ----- 2004a, Innovation and Growth in East Asia: The Future of Miracles, Macmillan.

27. ------ 2004b, Global Markets and Financial Crisis: Asia's Mangled Miracle, Macmillan/ Palgrave.

28. ------2003, "Creating Social Capabilities in a POLIS", in Tom Misa et als. Eds. Technology and Modernity, The MIT Press.

29. ------ (1996). "Beyond Distributive Justice in the McWorld", Global Justice, Spring/ Summer, pp. 30-40.

30. Khan, Haider A. (1999a) "Corporate Governance of Family Businesses in Asia: What's Right and What's Wrong?" ADBI paper no. 3, Tokyo, 1999.

31. Khan, Haider A. (1999b) "Corporate Governance in Asia: Which Road to Take?" Paper presented at 2nd high level symposium in ADBI, Tokyo.

32. Khan, Haider Ali, 1994, "Does Bilateral Foreign Aid Affect Fiscal Behavior of a Recipient?" Journal of Asian Economies, March.

33. -----, 1995a, "Does the Policy-Maker Make a Difference?" paper presented at AEA/ASSA meetings, Washington D. C., January 1995.

34. -----, 1995b, "Does Japan's Aid Work?" unpublished paper, University of Denver.

35. Khan, Haider A. (1997a), "Does Japanese Bilateral Aid Work? Foreign Aid and Fiscal Behavior in a Bounded Rationality Model," Regional Development Studies, Vol. 3 (Winter, 1996/97), pp. 283-97.

36. Khan, Haider A. (1997b), Technology, Energy and Development: The South Korean Transition, Cheltenham: Edward Elgar.

37. Khan, Haider A. (1997c), African Debt and Sustainable Development, New York: Phelps-Stokes Foundation.

38. Khan, Haider A. (2002a), "Can Banks Learn to Be Rational?", Discussion Paper no. 2002- CF-151, Graduate School of Economics, University of Tokyo

39. Khan, Haider A. (2002b), "Corporate Governance: the Limits of the Principal–Agent Model", Discussion Paper, CIRJE, University of Tokyo.

40. Khan, Haider A. (2002c) "The Extended Panda's Thumb and a New Global Financial Architecture: An Evolutionary Theory of the Role of the IMF and Regional Financial Architectures, Working paper, GSIS, University of Denver.

41. ------, 2002d, "Does Aid Work? Japanese Foreign Aid, Development Expenditures and Taxation in Malaysia: some results from a bounded rationanlity model of fiscal behavior", Journal of the Centre for International Studies, Aichi Gakuin University, Vol. 4, pp. 1-19.

42. --------, 2002e, "What can the African countries learn from the macroeconomics of foreign aid in Southeast Asia ?", Aryeetey, E., Court, J., Nissanke, M. and Weder, B., Asia and Africa in the Global Economy, Tokyo, UNU Press.

43. Krongkaew, M. (1997). "An Alternative Interpretation of Economic Policy Determination in Thailand". Paper presented at the conference on `Asia's Development Experience', Tokyo, December 1-2.

44. Krugman, P. (1996). Pop Internationalism, MIT Press, Cambridge, MA.

45. Lauridsen, L. S. (1998). "Thailand: Causes, Conduct, Consequences," in Jomo, K. S. ed. Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 137-157.

46. Mc Grew A. (1992). The Third World in the new global order, in Allen T. and Thomas A. (eds.) Poverty and Development in the 1990s. Oxford University Press in association with the Open University, Oxford.

47. Ohmae, K. (1996). The End of the Nation State. Harper Collins Publishers: London.

48. Peraton, J. et al (1997). "The Globalization of Economic Activity," New Political Economy 2 (2) : 257-277.

49. Sen, G. (1997). "Globalization, Justice and Equity: A gender perspective," Development 40 (2): 21-26.

50. Siamwalla, A. (1997) "Can a Developing Democracy Manage Its Macroeconomy?" The Case of Thailand, Lecture delivered at Queen's University, Kingston, Ontario, Canada on October 15.

51. Sobhan, R (1989). “The State and Development of Capitalism: The Third World Perspective”, in Bharadwaj, K. and S. Kaviraj, eds. Perspectives on Capitalism, New Delhi: Sage Publications, pp. 247-258.

52. Stiglitz, J. 2002. Globalization and Its Discontents, New York: Norton.

53. ------2006. Making Globalization Work, New York: Norton.

54. ------2012. The Price of Inequality, New York: Norton.

55. Straubhaar, T. and Wolter, A. (1997). "Globalization, Internal Labor Markets and the Migration of the Highly Skilled," Intereconomics 32 (4): 174-180.

56. The Economist, “Mahathir, Soros and the Currency Markets: Amoral may be, but Currency Speculators are both necessary and productive” (September 7-October 3, 1997).

57. The Economist, “One World?” (October 18, 1997a).

58. Thurow, L. (1996). The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. Penguin Books: New York.

59. Ul, Haq, M., K. Inge and I. Greenberg (1996). (eds.) The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility. Oxford: Oxford University Press.

60. Wood, A. (1994). North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-driven World. Oxford. Clarendon Press.

61. Yeung, Y. and Lo, F. (1996). "Global Restructuring and Emerging Urban Corridors in Pacific Asia," in Yeung, Y. and Lo, F. (eds.) Emerging World Cities in Pacific Asia. United Nations University: Tokyo.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 051-060
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বিপর্যস্ত অর্থনীতি শাস্ত্র: বিপর্যয় কোথায় ও কী করা?

আবুল বারকাত*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি এবারের ২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একজন প্লেনারি বক্তা হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য সমিতিকে ধন্যবাদ। "অর্থনীতি ও নৈতিকতা" নিয়ে কি বলবো এ নিয়ে বেশ ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তার মধ্যেই থাকবো। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এ বিষয়ে আমার সীমিত জ্ঞান-এর সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আমারই লেখা এ বছরে প্রকাশিত "অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য"[১] শিরোনামের গ্রন্থে। তাই, ওই গ্রন্থে বিশ্লেষিত বিষয়গুলোর মধ্যেই আমার আলোচনা সীমিত রাখবো।

"অর্থনীতি ও নৈতিকতা" বিষয়টি বহুমাত্রিক ও জটিল। এটি মনে রেখেই আজকের প্লেনারি বক্তৃতায় অর্থনীতি ও নৈতিকতা কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই তা হলো: (১) অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্যের মর্মকথাটি কী? (২) অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য দূর করতে করণীয় কী হওয়া উচিত? এবং (৩) জ্ঞানশাস্ত্রের নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে পরিবর্তনের সম্ভাব্য পথনির্দেশনা কেমন হতে পারে? শুরুতেই বলে রাখি প্লেনারি বক্তৃতার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ তিন প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই (উল্লিখিত গ্রন্থে এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে) সেহেতু বক্তব্যও হবে অনুরূপ, সময়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। আবার শুরুতেই আমার উপসংহারিক মূল কথাটিও বলে রাখি: **"অর্থনীতিশাস্ত্র আজ বিপর্যস্ত। তবে পরিত্রাণের পথও আছে"।**

২. অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য: মর্মকথাটা কী?

আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদদের প্রথম দলের শুরুটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় টমাস বেকনসহ বেশ কিছু ধর্মযাজকের সমন্বয়ে। ষোড়শ শতকের এসব অর্থশাস্ত্রীর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল: কীভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন করা যায়? সেই থেকে আজকের একবিংশ শতক পর্যন্ত বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯৬০ দশকে নব্য-উদারবাদীদের

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

১. আবুল বারকাত (২০১৭), অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উত্থানের সময়টুকু বাদ দিলে পিছনের পাঁচশ' বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র মূলত দুটি বৃহৎ বর্গের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর অনুসন্ধান করেছে: (১) সম্পদের উৎস কী? কে সম্পদের স্রষ্টা? সম্পদ কোথায় সৃষ্টি হয়? (২) বাজার ব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা, মুক্তবাণিজ্য নাকি বাজারে ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-সম্রাট-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব থাকতে হবে? অর্থশাস্ত্রে অনুসন্ধানের অনুষঙ্গ হিসেবে এসব বিগত ৫০০ বছরের বিষয় নয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এগুলো বিগত আড়াই হাজার বছরের বিষয়।

অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসের বিগত সাড়ে পাঁচশ' বছর উল্লিখিত দুটি প্রধান বিষয়ের নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ-সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোতে সূত্রবদ্ধ কোনো সদুত্তর মেলেনি। সদুত্তর মেলেনি তার প্রধান কারণ সমসাময়িককালে অর্থনীতিশাস্ত্রের এসব বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর (তাঁদের) কালের ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-বাদশাহ-সম্রাট-প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীসহ সেকালের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণির (dominant class) শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী আজ্ঞাবাহক মাত্র। তাঁরা প্রধানত তাঁদের কালের শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছেন – মাত্রা, ধরন এবং তীব্রতা যা-ই হোক না কেন। কেউ কেউ আবার সমকাল ছাপিয়ে আগত-সমাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করেছেন। কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী যুগে আগত নতুন শ্রেণির, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন পুঁজিবাদের, কেউ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের, আবার কেউ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের। অধিকাংশেই তেমন যুগ-কাল নির্বিশেষে অর্থনীতি নিয়ে সার্বজনীন নির্মোহ তত্ত্ব বিনির্মাণের চেষ্টা করেননি। এসব কারণেই নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'বিপর্যয়' ও 'দর্শনের দারিদ্র্য' উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়েছে।

'দর্শন শাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ এবং তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়ার মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা (যাকে আমি "চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা" বলি) বুঝায় আর 'অর্থনীতিশাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি বুঝায় সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার-সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রগুলোর বিনির্মাণ–তাহলে সেক্ষেত্রে বিগত সাড়ে পাঁচশ' বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র এবং তার শাখা-প্রশাখা আসলেই "দর্শনের দারিদ্র্য" নির্দেশ করে। ব্যতিক্রম শুধু কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর অর্থনীতি সাহিত্য যেখানে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদ্ধতি (methodology) প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (social cosmology) আওতায় শুধু ঐতিহাসিক উত্তরণশীল আর্থ-সামাজিক গঠনতত্ত্বই (Theory of Socio-economic Formation) আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, যেকোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই স্থির-অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদ করেছেন। মার্কসের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের এ কাঠামোসূত্রে নির্মোহতা আছে, সমগ্রতা আছে, বস্তুনিষ্ঠতা আছে, ঐতিহাসিকতা আছে আর সর্বোপরি আছে সর্বজনীনতা। অন্যরা যে শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কথা ভেবেছেন মার্কস ঠিক তার বিপরীত পক্ষের স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছেন এটা ঠিক; কিন্তু, সে কারণে তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূর করতে পেরেছিলেন তা ঠিক নয়, যেটা সঠিক তা হলো দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে অর্থনীতিশাস্ত্র বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ প্রয়োগ–নইলে মার্কস কখনও মূল্যের শ্রমতত্ত্বে পণ্যমূল্য বা পণ্য বিনিময় মূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারতেন না (যে বিষয়টি ছিল হাজার হাজার বছর ধরে অনাবিষ্কৃত;

সিরিয়াস অর্থনীতিশাস্ত্রীদের গভীর চিন্তা-দুশ্চিন্তার বিষয়; অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধাঁধা), এছাড়া মার্কস কখনো এ উপসংহারে উপনীত হতে পারতেন না যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অনিবার্যতার কারণে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

মার্কসের আগে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনকে সুসংহত-সুসংবদ্ধভাবে অন্তত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও বাজারের জটিল বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে সূত্রবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। "প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থায়" (system of natural liberty) বিশ্বাসী এডাম স্মিথ একদিকে বলেছেন, "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market) "স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করবে" আবার অন্যদিকে বলেছেন, "ব্যবসায়ীদের মধ্যে জনস্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে"। এক্ষেত্রে স্মিথের "স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার" তত্ত্বের কি হবে? আবার তিনি বড় ভুল করে ফেলেছেন এ কথা বলে, "পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত।" আর তাই অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের শুরুটাই 'দর্শনের দারিদ্র্য' দিয়ে – এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

এডাম স্মিথের ধ্রুপদী অর্থনীতি দর্শনের অন্যতম ভ্রান্তিকে বলা হয় "এডামের বিভ্রান্তি" বা "এডামের যুক্তি-ভ্রান্তি" (Adam's Fallacy)। বিষয়টি এ রকম: এডাম স্মিথের আগে অর্থনীতিশাস্ত্র যখন সার্বভৌম সরকারগুলোকে বুদ্ধি পরামর্শ দিত যে কীভাবে সরকারি নীতিকৌশল বিশেষত সরকারি আর্থিক নীতি বিনির্মাণ করে বাজারের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা সরকারের পক্ষে বাড়ানো যায় সেখানে স্মিথ অর্থনীতিবিদদের এ ভাবনা-ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভাবলেন সমাজ কীভাবে আরো বেশি ফলপ্রদ, আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাজারসহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কটা কেমন হওয়া প্রয়োজন। তিনি বললেন, আধুনিক সমাজ বৃহৎ দুটি বর্গে বিভক্ত যার মধ্যে সংহতি থাকতে হবে: প্রথম বর্গ হলো ব্যক্তিজীবন, আর দ্বিতীয় বর্গ হলো সমাজজীবন। এরপর তিনি যা বললেন তা হলো এ রকম: অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির উদ্যোগ ও পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যক্তি-নির্ভরহীন সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা ব্যক্তির নিজস্বার্থ বা নিজস্ব স্বার্থের জন্য উপকারী; আর ব্যক্তির নিজস্বার্থকেন্দ্রিকতার বাইরে আছে রাজনীতি, ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাসহ সমাজজীবন। এডাম স্মিথের মূল কথা হলো ব্যক্তির নিজস্বার্থের সাথে সামাজিক জীবনের সংহতি (বা সম্মিলন) থাকা প্রয়োজন–আর এ সংহতির একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের নিমিত্ত 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (মুক্ত বাজার)। এ ক্ষেত্রে স্মিথের 'বিভ্রান্তি' (Adam's Fallacy) তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য যে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন একটি প্রণালী বা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বার্থপরতা অন্য সবার মঙ্গল বয়ে আনে। এখানে স্মিথের অবস্থানের নৈতিক ভ্রান্তি (moral fallacy) হলো বিমূর্ত ভালো (abstract good) কোনো কিছু পাবার প্রত্যাশায় তিনি আমাদের মূর্ত ও প্রত্যক্ষ (concrete and direct) মন্দকে বেছে নিতে বলছেন। আর যুক্তিগত ভ্রান্তি (logical fallacy) হলো স্মিথসহ কেউই এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমষ্টির জন্য ভালো হয়; আর স্মিথের যুক্তি মেনে নিলে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ফল হিসেবে বৈষম্য থেকে শুরু করে কমজোরি সবার উপর পুঁজিবাদের ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত মেনে নিতে হয়। এটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যর্থতা (psychological failure)।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিশাস্ত্রের মার্কস-পরবর্তী ধারাগুলো অর্থনীতিশাস্ত্রকে 'খণ্ডিত' ও 'কামরাভুক্ত' বা 'গণ্ডিবদ্ধ' করে (fragmentation and compartmentalization) যত

ধরনের উপযোগিতার তত্ত্ব (utilitarian concepts) বিনির্মাণ করা যায় তা দিয়ে ধ্রুপদী চিন্তা জগতের (classical schools) মূল্যের শ্রমতত্ত্বকেই বিসর্জন দিল (এখানে প্রধান গুরু হলেন জেরেমি বেন্থাম, ১৭৪৮-১৮৩২)। এসব করা হলো বেশ সচেতনভাবেই এবং এর ফলে অর্থনীতিশাস্ত্র যুক্তির জগৎ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে নিল, আর অর্থনীতি শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' মহাদারিদ্র্যে রূপান্তরিত হলো।

অর্থশাস্ত্রের পশ্চাদপসারণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তীকালে একমেরুর বিশ্বে বৈশ্বিক সব মৌল-কৌশলিক প্রাকৃতিক সম্পদে (জমি সম্পদ, জল সম্পদ, জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute control) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতবাদ (Neo-liberal doctrine)।

অর্থনীতিশাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদ কোনো সুস্থিত দর্শন নয়। আর বিশ্বে পুঁজি যখন কেন্দ্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা ধনী দেশে উদ্বৃত্ত তখনই এ মতবাদ নতুন করে শুধু মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেই নিশ্চুপ থাকে না, বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ববাজার, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন তৈরিতে সচেষ্ট। এবং শুধু তাই নয়, ঐসব একপেশে বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তির বিধান তৈরিরও দায়িত্ব তাঁরা নিজেই নিয়েছেন, ফলে দুর্বল দেশের– (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরীব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয় – প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। এ অবস্থাকে বলা চলে "অর্থনীতিশাস্ত্রের রাজনৈতিক স্বেচ্ছামৃত্যু" ("political euthanasia of economics")।

অর্থনীতি শাস্ত্রের রাজনৈতিক এই স্বেচ্ছামৃত্যু আকস্মিক নয়। প্রসঙ্গত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ-এর প্রণিধানযোগ্য একটি বক্তব্য উল্লেখ করি যেখানে তিনি বলছেন, "... **বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোনো নৈতিক চরিত্র**।... তারপরেও বাজার অর্থনীতি এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল, তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য।... পুঁজিবাদ যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা দিতে পারেনি, আর যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে – অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব এবং (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয় যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না।... (কিন্তু) শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নিচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা প্রাচীন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ।"[২]

অর্থনীতিশাস্ত্র গত পাঁচশ' বছরে যেভাবে এগিয়েছে এবং যা পেরেছে ও পারেনি তা থেকে বুঝা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা বলা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ করার কথা ভাবেনি অথবা বলা যায় 'জনকল্যাণ' বিষয়টি এ শাস্ত্রে **লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষ** হয়েছে অর্থাৎ 'জনকল্যাণ' এখানে অন্য

[২] দেখুন, Joseph Stiglitz, 2013. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. London: Penguin Books, পৃ. xxxix, xliii, l, xlvi. আর "মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কীভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা"– এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৬), বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ১৬১-১৭৫।

কোনো কিছুর অনুসঙ্গী মাত্র। নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের মর্মার্থ বিবর্তন-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমি মনে করি "অর্থনীতিশাস্ত্র ব্যর্থ" হয়েছে (failure of economics)। এ ব্যর্থতা তিন ধরনের:

১. *বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা (Intellectual failure):* মূলধারার অর্থশাস্ত্রে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা তার প্রধান উৎস হলো এ বিশ্বাস যে শেষ পর্যন্ত "বাজার নিজেই নিজেকে সংশোধন করে" অথবা "বাজারই সে ফিল্টার যা দিয়ে সবকিছু সংশোধিত হয়ে যায়" অথবা "বাজারের অদৃশ্য হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়" (যাকে বলে "markets are self-correcting")। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা নিয়ে তেমন ভাবনা নেই বললেই চলে। তা হলো 'অর্থনীতি' বললেই প্রায়ই 'বাজার'কে নির্দেশ করা হয়; অথচ ধারণা হিসেবে 'বাজার'-এর তুলনায় 'অর্থনীতি' অনেক ব্যাপক, গভীর ও জটিল বিষয়। প্রচলিত শাস্ত্রে এ অবস্থা শাস্ত্রের দৈন্যদশারই পরিচয়ক। 'অর্থনীতি' আর 'বাজার'-এ দুটি ধারণাকে প্রায় সবাই সমার্থক মনে করেন (যা আসলে নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের কথা) আর অর্থনীতিশাস্ত্রে "বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার" এটাই অন্যতম উৎস, সে কারণে বিষয়টির একটু বিশ্লেষণ দরকার। নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রীদের মতে, অর্থনীতি দেশকাল নির্বিশেষে "বহু ধরনের বিনিময় সম্পর্কের সমাহার" (যাকে বলে web of exchange relationships), যেক্ষেত্রে একক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য কেনেন, যা অনেক কোম্পানিতে উৎপাদিত হয় তবে তিনি তার শ্রম বিক্রি করেন একটি কোম্পানিতে; আর কোম্পানিরা কেনাবেচা করে অনেক ব্যক্তির ও অনেক কোম্পানির সাথে। এ কারণেই বলা হয় "অর্থনীতি" মানেই 'বাজার'। আসলে এ কথা ভুল। আসলে 'বাজার' হলো অর্থনীতিকে সংগঠিত করার অনেক পথ-পদ্ধতির একটি মাত্র। কারণ, কোম্পানির অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই কোম্পানির ভেতরেই ঘটে থাকে (যাকে বলে through internal directives); অর্থনীতির বড় এক অংশের উপর সরকারের প্রভাব আছে আর অনেক ক্ষেত্রে সরকার তা নিয়ন্ত্রণও করে; সরকারসহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) বাজার সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বানিয়ে বাজারের পরিধি নির্ণয় করে দেয়। আর অর্থনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদী স্কুলের প্রবক্তা হার্বাট সাইমন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাত্র ২০ শতাংশ 'বাজারের' মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সুতরাং, 'অর্থনীতি' মানেই 'বাজার' অথবা 'বাজার'ই 'অর্থনীতি' – এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

২. *নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা (Moral failure):* নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট এ ব্যর্থতার প্রধান উৎস "অর্থ অথবা টাকার জোরভিত্তিক সিস্টেম" অর্থাৎ যাকে বলা হয় "অর্থ-পূজাভিত্তিক সিস্টেম"-এ বিশ্বাস। বিষয়টি জন্ মেইনার্ড কেইনস্ উপস্থাপন করেছিলেন এভাবে: "বস্তুজাগতিক প্রগতি ঐ বিন্দু পর্যন্তই মানবকল্যাণ-মানবসমৃদ্ধি বাড়াবে, যখন তা নৈতিক-বস্তুর সংখ্যা কমাতে থাকবে" ("Material progress will increase the welfare of the universe upto the point when it starts to diminish the quantity of ethical goods")। অর্থশাস্ত্রে নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই "প্রবৃদ্ধি পূজা" করছি, "ভালো জীবনের" জন্য নয় (not for good life)। এ ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে, "অর্থনৈতিক জীবনসমৃদ্ধি" বললে আমরা বুঝি শুধু কিছু বস্তুগত পণ্যের সমাহার মাত্র। এ ব্যর্থতার মূল কারণ "বস্তুগত প্রগতির" সাথে "নৈতিক-প্রগতির"

সম্পর্ক না বুঝা অথবা মনে করা যে "বস্তুগত জীবনমান উন্নয়ন" হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই "নৈতিক-মূল্যবোধগত উন্নতিও" হয়ে যাবে। "চিরায়ত অর্থশাস্ত্র" এসব দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে; "উপযোগবাদ" তা বাড়িয়েছে; আর "নব্য-উদারবাদ" তা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত "নৈতিক মূল্যবোধ" বিষয়টিই প্রায় অবলুপ্ত।

৩. *প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা (Institutional failure)*: আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানই "ফলপ্রদ বাজার তত্ত্বে" বিশ্বাসী। এ তত্ত্ব অনুযায়ী তারা মনে করেন, আর্থিক বাজার অবিরতভাবে সম্পদের ভ্রান্ত-মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না এবং সে কারণেই অর্থবাজারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন নেই। আমার মতে, এ ব্যর্থতা উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যর্থতার প্রতিফল মাত্র।

অর্থনীতিশাস্ত্র এখন তিন ধরনের ব্যর্থতা (বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা) নিয়ে এগুনোর চেষ্টা করছে। বাজারের শক্তিতে অতি বিশ্বাস অথবা নির্বিচার বিশ্বাস এবং অনৈতিক অর্থ-পূজা সম্ভবত এ দুটো কারণেই এ তিন ব্যর্থতার সৃষ্টি। মানুষের জীবনসমৃদ্ধি এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে "বিপর্যস্ত অর্থনীতিশাস্ত্রকে" এসব নিয়ে ভাবতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এসবের কারণ-পরিণাম নিয়ে নির্মোহ ভাবনার খুবই প্রয়োজন। বিপর্যস্ত অর্থনীতিশাস্ত্রকে এ তিন ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৩. বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় রোধে অর্থশাস্ত্রের কী করার আছে?

মহাবিপর্যয় থেকে মানবসমাজকে রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও বিশ্বকে করায়ত্ব করার প্রক্রিয়া থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ইতিহাসের দ্রুত পরিসমাপ্তির দায়িত্ব অনেকের সাথে অর্থনীতিশাস্ত্রকেও নিতে হবে। অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে – যত না শাস্ত্রের প্রয়োজনে তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্ব-জনগণের ভবিষ্যৎ প্রাগ্রসর জীবনের প্রশ্নে। এখন অর্থনীতিশাস্ত্রের দায়িত্ব চরম বৈষম্যমূলক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামকগুলোর বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র' (New Unified Economic Science) বিনির্মাণ করা এবং তারই ভিত্তিতে 'নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন' (New Humane Development Philosophy) প্রণয়ন যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তথাকথিত নির্বিচার প্রবৃদ্ধি নয় অর্থাৎ – "non differentiated growth" অথবা (একই কথা) "unqualified growth" নয়। একীভূত অর্থশাস্ত্রীয় ঐ তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ একদিকে ধনী দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা রোধ করতে পারবে; আর অন্যদিকে একই সাথে দরিদ্র দেশের মানবিক উন্নয়ন-প্রগতি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এ দর্শনের লক্ষ্য হবে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট দেশের অথবা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সিস্টেমের অথবা সুনির্দিষ্ট শ্রেণির লাভ নয় – এ দর্শনের লক্ষ্য হবে 'বৈশ্বিক প্রগতি' বা "বৈশ্বিক লাভ"। আর এ লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রীদের অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রের হিপপোক্রাটিক নীতি অনুসরণে একটি শপথবাক্য (Oath অর্থে) পাঠ করা উচিত: "প্রথম কথা হলো – ক্ষতি করো না।"

বিষয়টি অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনগত তবে সমাধান রাজনৈতিক। যেহেতু মানুষের বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময়কাল কেটেছে সমতাভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে (আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায়); যেহেতু মানুষ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাস করে তা স্থির-অনড় নয় (static নয়) বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল (dynamic) এবং শেষ বিচারে প্রগতিমুখী; যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে

উত্তরোত্তর বেশিমাত্রায় আলোকিত করতে থাকবে; এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবশ্রম-দক্ষতাসহ উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান আপাতদৃষ্টিতে 'অসীম শক্তিধর' উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে—সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানবকল্যাণকামী বৈশ্বিক এ সমাধান কোনো আপ্তবাক্য নয়—ব্যাপারটা সময়ের। জটিল এ প্রক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তোবা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মতো 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) মতো 'মহাবিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) মত নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু, ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। বিষয়টি জ্ঞানতত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক– উভয়ই।

৪. তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা কার্যক্রম কী হওয়া বাঞ্ছনীয়?

একবিংশ শতকের অর্থনীতিশাস্ত্র এখন প্রধানত "ইনস্ট্রুমেন্টাল ইকনমিকস" যেখানে অর্থনীতির নীতি নেই, নেই দার্শনিক বিষয়াদি, নেই জনকল্যাণের বিষয়াদির অগ্রাধিকার। এ শাস্ত্রে এখন প্রাধান্য পাচ্ছে নীতি-নৈতিকতাহীন গণিতের ব্যবহার যাকে বলা চলে "প্রায়োগিক গণিতের শাখা মাত্র" (a branch of applied mathematics)। এ শাস্ত্রে এ দাপট দেখাচ্ছে নয়া-উদারবাদ যা আসলে অর্থশাস্ত্রের আদি নীতি-দর্শন থেকে বহু-যোজন দূরের। এ শাস্ত্র এখন এই শাস্ত্রের বিবর্তিত মৌলিক চিন্তাদর্শনের গুরুত্ব দেয় না। এ শাস্ত্রে এখনো বাজারের অদৃশ্য হাত-ই প্রধান, যার ভিত্তিতেই মনে করা হয় বাজার অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ এবং যার ভিত্তিতেই অনুরূপ নীতিমালা সুপারিশ করা হয়; এখনো বিশ্বাস করা হয় প্রত্যেকের নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দিলেই শেষ পর্যন্ত সবারই মঙ্গল হবে। এ বিশ্বাসের রূপ-প্রকৃতি যাই হোক না কেন অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিশ্লেষণে এ শাস্ত্র (বলা চলে) ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে এখন যে অর্থনীতি পাঠ করানো হচ্ছে এবং উচ্চ-উচ্চতর ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য কোথায়? আসলে তেমন কোনো মূল্য নেই—স্যুট-বুট পরা কেরানি বানানো ছাড়া। এ শাস্ত্রে এখন যারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছেন তাদের যেমন ফান লি, জেনোফনেস, চাণক্য, এ্যারিস্টটল, ইবনে খালদুন, টমাস একুইনাস, টমাস মান, উইলিয়াম পেটি, এডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস জানার প্রয়োজন পড়ে না তেমনি তাদের এখন মানুষ-সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য না জানলেও চলে। একজন অর্থনীতিবিদ 'মানুষ' নাকি যন্ত্রবিশেষ? এ প্রশ্নের সদুত্তর এখন খুব সহজ নয়!

এক সময়ের দর্শন ও নীতিশাস্ত্র থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে; স্থায়ী বিচ্ছেদ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতোই অর্থনীতিশাস্ত্র এখন 'খণ্ডিত' ও 'গণ্ডিবদ্ধ' (fragmented ও compartmentalized)। অবস্থাটা এমনই যে এখন চাহিদা-সরবরাহের চিরাচরিত বিধি এবং তার সাথে সম্পর্কিত গাণিতিক মডেল প্রণয়নের বাইরে বিচরণের প্রয়োজন হয় না। আর বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় এখন এ সবেই অতি আগ্রহী। এ এক মহাদুর্দশা! মহাবিপর্যয়! এ মহাদুর্দশা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। এ লক্ষ্যে আমার মনে হয় অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা কার্যক্রমের (curriculum) ধরন-বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নিম্নরূপ (আমি জানি আপাতত আমার প্রস্তাব গৃহীত হবে না, এবং এও জানি যে সময়ের সাথে সাথে আমার প্রস্তাবই ভাবনার বিষয় হবে)।

আমার প্রস্তাবটি উত্থাপনের আগে আরো একটা কথা বলে রাখতে চাই। তাহলো 'অনিশ্চয়তা' (uncertainity) এবং 'ঝুঁকি' (risk) সমার্থক নয়। সাধারণত দেখা যায়, যে অর্থনীতি যত উপরে যাচ্ছে

(প্রচলিত অর্থে 'উন্নতি' হচ্ছে) সে অর্থনীতি স্থিতিশীল (stable) করতে অথবা সে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা আনতে ও প্রবৃদ্ধি (growth) নিশ্চিত করতে অনিশ্চয়তার মাত্রা তত বেশি, এবং বিনিয়োগ বাজার (investment market) এবং আর্থিক বাজারে (financial market) এ মাত্রা সর্বোচ্চ। আর এ দুই বাজারের অনিশ্চয়তা (uncertainity) সমগ্র অর্থনীতিকে ঝুঁকিগ্রস্ত (risk) করছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যষ্টিক (micro economics) এবং সামষ্টিক (macro economics)–কোনো শাখাই আর এ সমস্যা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না (যাকে সাধারণ অর্থে বলে macro-micro mismatch)। তথাকথিত 'rational expectation'-সংশ্লিষ্ট অনুসিদ্ধান্ত কাজ করছে না। সম্ভবত যা কাজ করার কথা তা হলো এ রকম যে "বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে– যেমন উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতির হার, প্রবৃদ্ধি, মানব সমৃদ্ধি, আয় ও সম্পদ বৈষম্য, পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ভবিষ্যতবাণী, সামাজিক নির্ণায়কসমূহ স্থান-কালভেদে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত কাজ করে।"

উপরে যা বললাম এসবের নিরিখেই প্রশ্ন–তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার কোন পর্বে/কোন স্তরে কী কী বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে? এ নিয়ে আমি আমার প্রস্তাব (বলা যেতে পারে পুনর্গঠন প্রস্তাব) দুভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান (অনার্স) পর্বের জন্য, আর দ্বিতীয়টি মাস্টার্সসহ পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্বের জন্য। আমার প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্বের জন্য প্রস্তাব: আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি-যুক্তি হলো "অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়, অর্থনীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান"। আর তাই অর্থনীতিবিদকে যথাযোগ্য মাত্রায় দর্শন, ইতিহাস, গণিত, রাষ্ট্রনীতি, মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্ত্ব, এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানকে জানতে হবে। সুতরাং, অর্থনীতিশাস্ত্রে যারা প্রথম ডিগ্রি (৪ বছরের অনার্স অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তর) অর্জন করতে যাচ্ছেন, তাদের শুধু ম্যাক্রো ও মাইক্রো অর্থনীতির (যেখানে কিছুটা গণিতশাস্ত্র জানা প্রয়োজন হয়) জ্ঞান যথেষ্ট নয়। সমাজের জন্য উপযোগী অর্থনীতিবিদ হবার জন্য এ স্তরে যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক তা হলো: দর্শন (বিশেষত নীতিদর্শন), অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতি। অনার্স পর্বের শেষ বর্ষে কিছুটা 'বিশেষজ্ঞ' (specialist) বানানোর চেষ্টা হতে পারে তবে গণিতশাস্ত্রের ভার কিছুটা কমানো যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন শুধু গণিতের জ্ঞানের জোরে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান দখলের (যেমন প্রথম শ্রেণি ইত্যাদি) অপ্রয়োজনীয়তা কমবে আর অন্যদিকে আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি 'অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয় তা নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান'–শক্তিশালী হবার ফলে এ স্তরে একজন অর্থনীতিবিদ জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স (বা পোস্ট গ্রাজুয়েট) পর্বের জন্য প্রস্তাব: উচ্চতর এ পর্বে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো মাইক্রো ও ম্যাক্রো ইকনমিকস পঠন-পাঠনে এখনকার তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতি (কাঠামো) অবলম্বন করা। মাইক্রো ইকনমিকসের ক্ষেত্রে যা পড়ানো হয় তার সাথে ছোট ছোট অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক মডেল বিনির্মাণ ও তা টেস্ট করার পদ্ধতি শেখানো এবং এটা ব্যবসা-বাণিজ্য স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর ম্যাক্রো ইকনমিকসে যারা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একধরনের joint degree বা যৌথ ডিগ্রি-র ব্যবস্থা করা যেখানে অর্থনীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রকে মোটামুটি সমান গুরুত্ব দেয়া হবে। অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হতে পারে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো যারা ম্যাক্রো ইকনমিকস-এ মাস্টার্স বা উচ্চতর ডিগ্রি নেবেন তাদের যেন বাধ্যতামূলকভাবে দর্শন-ইতিহাস-এর শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে interact করানো হয় (এবং ওদেরকেও ম্যাক্রো ইকনমিকস শেখানো হয়)।

অর্থাৎ মাস্টার্স লেভেলে যারা ম্যাক্রো ইকনমিকসের বিশেষজ্ঞ হবেন তাদের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন-এর উপর সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির (policy অর্থে) প্রভাব-অভিঘাত (implications) জানলেই চলবে না, জানতে হবে ঐসব অর্থনৈতিক নীতিসমষ্টির সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব-নিহিতার্থ (social and ethical implications)। উচ্চতর পর্যায়ের মাইক্রো-ম্যাক্রো ইকনমিকসের এ বিভক্তি অন্যান্য সুবিধের মধ্যে আরো যে বড় ধরনের সুবিধে সৃষ্টি করতে সক্ষম তা হলো ম্যাক্রো ইকনমিস্টদের মন-মনন মাইক্রো ইকনমিকস-অভ্যাস (habit) মুক্ত করবে, এবং একই সাথে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনকে নিউটনীয় একরৈখিক সূত্র থেকে মুক্ত করবে।

শেষ কথা হলো, একদিকে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে হবে, আর অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও পুনর্গঠন করতে হবে। আমি এসবের উত্থাপক মাত্র। এসব নিয়ে এ মুহূর্তে তেমন কেউ ভাবছেন কী না তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে যুক্তি থাকলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে ভাবা হবে। তখন যারা ভাববেন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াগুলো নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবনা চিন্তার কথা বলবেন; আরো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেবেন। এ বিষয়ে আমি আশাবাদী। কারণ, সমাজ ও প্রকৃতি যেখানে স্থির নয় গতিময় (not static but dynamic) সেখানে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত কোনো শাস্ত্রও স্থির হতে পারে না, তাকে গতিময় হতেই হবে।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 061-074
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি ও নীতি শাস্ত্র: প্রসঙ্গ মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

অজয় কুমার বিশ্বাস*

সারকথা: *দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শাখা নীতিশাস্ত্রের তুলনায় অর্থনীতি নবীন হলেও উভয়ের অস্তিত্ব আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষের জীবন প্রণালিতেও বিদ্যমান ছিল। সেই অর্থে বিষয় দুটি সমকালীন, আদর্শবাদী বিজ্ঞান (normative science) এবং উভয়েরই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে।*

নীতিশাস্ত্র আদর্শবাদী বিজ্ঞান। তবে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই আদর্শবাদ (ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ প্রভৃতি বিচার) শ্রেণি-নিরপেক্ষ নয়। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে মালিকশ্রেণির প্রাপ্য মুনাফার উৎস উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ যা আবার শ্রমিক শ্রেণির জন্য ন্যায্যতা-পরিপন্থি।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে নীতিনিষ্ঠতার এই সংকট ছিল না। আধুনিক সাম্যবাদী সমাজেও তা থাকবে না। অর্থনীতি যেমন ইতিবাচক বিজ্ঞান (positive science) তার চেয়ে আরও বেশি আদর্শবাদী বিজ্ঞান (normative science)। কি উৎপাদন হচ্ছে, কীভাবে কোন কৌশলে উৎপাদন হচ্ছে এসব বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, কেন এসব উৎপাদন হচ্ছে? এসব উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রাণীজগৎ ও ভূমণ্ডলে কেমন হবে? এসব উৎপাদন করা কি উচিত? এসব উৎপাদন অব্যাহত থাকলে তা ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার জন্য সংকট না সম্ভাবনা বয়ে আনবে? তা বিচারের আরো বেশি আবশ্যকতা রয়েছে।

আজকের এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক কোম্পানি, তাদের পাহারাদার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা (WTO, IMF, IBRD ইত্যাদি) মুনাফার হার ঠিক রাখতে গিয়ে, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে, পরিবেশ বিধ্বংসী অর্থনীতি ও যুদ্ধ অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। বাজার দখল করতে গিয়ে নিজেরা এমন সব সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যা প্রাণী জগৎসহ ভূমণ্ডলের অস্তিত্বেও সংশয় সৃষ্টি করেছে। এই সংকট পুঁজিবাদ সৃষ্ট। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এর মীমাংসা সম্ভব নয়। এই সংকট নিরসনের জন্য উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এমন উৎপাদন সম্পর্ক সমৃদ্ধ উৎপাদন প্রণালী (Mode of Production) আবশ্যক যা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উৎপাদন প্রণালীতে দেখা যায়। এখানে উৎপাদনের উপকরণের (Means of production) ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বলে উৎপাদন

* অধ্যক্ষ, সরকারি নুরুন নাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ

সম্পর্কে (Production relation) বন্টন ব্যবস্থাও বৈষম্যমূলক নয়। ফলে উৎপাদন শক্তির বিকাশে (Production Force) উৎপাদন সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

সমাজ বিকাশের এই পর্যায়ে আদর্শবাদী অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়, উদ্ভব ঘটে সমতার অর্থনীতির। নীতিশাস্ত্র এই পর্যায়ে এসে অবমুক্ত হয় স্ববিরোধিতা থেকে। অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র যথাক্রমে সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো হিসেবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র

'যে শাস্ত্র ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দের যথার্থ সংজ্ঞা দেয়, তাকে নীতিশাস্ত্র বলে। সমাজ জীবনে কতগুলো আচরণ, কতগুলো অভ্যাস নিন্দিত ও প্রশংসিত এবং তাদেরই নীতি বলা হয়। মানুষের সমাজ জীবনের এই দিকটি সৎ বা অসৎ এই দু'ভাবে চিহ্নিত করা হয়, ঐ বিষয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকেই নীতিবিজ্ঞান বলে।'[১] ইংরেজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নীতিবিদ্যা। Ethics শব্দটি গ্রীক শব্দ Ethica থেকে এসেছে। Ethica শব্দটি এসেছে Ethios শব্দ থেকে যার অর্থ চরিত্র, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি বা অভ্যাস। Ehics কে moral philosophy বা নৈতিক দর্শন বলা হয়। Moral শব্দটি ল্যাটিন Mores থেকে এসেছে, যার অর্থ রীতিনীতি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, নীতিবিদ্যাকে মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

'সুতরাং, নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় উইলিয়াম লিলি বলেন: 'We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings lining in societies- a science which judges this conduct to be right or wrong to be good or bad or in similar way'. [২]

দার্শনিক অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ভাষায়, 'নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানবজীবনের আদর্শ অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান বা সাধারণ বিষয়।'[৩]

'নীতিবিদ্যা হল এমন একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞান যা মানবজীবনের পরম আদর্শ এবং আদর্শ লাভের সহায়ক নৈতিক নিয়মগুলো নির্ধারণ করে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণকে ভাল কি মন্দ তা বিচার করে। যেহেতু নীতিবিদ্যা আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে গভীর করে সেহেতু নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।'[৪]

নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ভালো-মন্দ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা। যদিও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এ ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের সাধারণ অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জীব-জগতে প্রায়ই দেখা যায়, যে কর্ম এক প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক সে কর্মই অন্য প্রাণীর জীবন সংহারের কারণ। 'নৈতিকতা কোন ধর্ম বা ধর্মগুলোর নিজ নিজ আঙ্গিকের সম্পদ নয়। এর ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বজনীন অবস্থান রয়েছে। মার্কসবাদ এই নৈতিকতা লালন করে।' [৫]

---

১. মোঃ আফছার আলী ও মোঃ রবিউল আউয়াল, 'সাধারণ নীতিবিদ্যা', কবির পাবলিকেশন্স পৃ.৩

২. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, 'নীতিবিদ্যা'। অকসর পাবলিকেশন, পৃ. ৪।

৩. মোঃ আফছার আলী ও মোঃ রবিউল আউয়াল, 'সাধারণ নীতিবিদ্যা', পৃ. ৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫. আখতার সোবহান খান, 'মার্কসবাদ ও ন্যায়পরায়ণতার ধারণা', প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত।

অর্থনীতি

'অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে (পৃ. ৫১ ও ৫২) আবুল বারকাত, দেশবিদেশের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার নির্যাস ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন অনুসারে স্বল্প ভাষায় বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন অর্থশাস্ত্র হলোঃ

১. "গার্হস্থ্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট বিদ্যা" (জেনোফেনস, খ্রি.পূ.৪৩০-৩৫৪; এ্যারিস্টটল, খ্রি.পূ.৩৮৪-৩২২)।

২. "সম্পদের বিজ্ঞান"(ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জনক এডাম স্মিথ, ১৭২৩-১৭৯৪; রবার্ট ম্যালথাস, ১৭৬৬-১৮৩৪; জে.বি. সেঁই, ১৭৬৭-১৮৩২; ডেভিড রিকার্ডো, ১৭৭২-১৮২৩; জন স্টুয়ার্ট মিল, ১৮০৬-১৮৭৩), এডাম স্মিথের মতে,'অর্থশাস্ত্র জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে'; জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য বলেছেন, 'অর্থশাস্ত্র হলো সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রায়োগিক বিজ্ঞান'

৩. **"কল্যাণের বিজ্ঞান"** (নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে; যাঁদের মধ্যে আলফ্রেড মার্শাল, ১৮৪২-১৯২৪; হার্বার্ট ডেভেনপোর্ট, ১৮৬১-১৯৩১; আর্থার সেসিল পিগু, ১৮৭৭-১৯৫৯)

৪. "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান" এতকালের এ প্রচলিত ধারণা বাতিল ঘোষণা করে লায়নেল রবিন্স (১৮৯৮-১৯৮৪) বললেন, অর্থশাস্ত্র মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্ক-বিষয়ক মানুষের স্বভাব-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫. "কর্মসংস্থান ও আয়-এ দুয়ের সম্পর্ক নির্ধারণী বিজ্ঞান"-এ কথা বলেছেন জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬)।

৬. "পছন্দের বিজ্ঞান" বা "বাছাই করে নেবার বিজ্ঞান" বলেছেন পল স্যামুয়েল সন (১৯১৫-২০০৯)।

GRAHAM, BANNOCK, R.E. BAXTER AND EVAN DA প্রণীত THE PENGUIN DICTIONARY OF ECONOMICS (Fifth edition)-এ Economics সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

Economics is the study of the production, distribution and consumption of wealth in human society. Economists have never been wholly satisfied with any definition of their subject. This one is as good as any. It should not be interpreted to restrict the subject-matter of economics to the positive aspects of material welfare alone.

ROBBINS has criticized this limitation by pointing out, for example, that the economy of war, which may destroy material welfare, is an aspect of choice in the use of resources and therefore a proper subject for economic inquiry. His definition was: 'Economics is the science whice studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.' In fact, no short definition can convey to the beginner the scope and flavour of the whole subject as it has evolved. The reader will gain a good notion of the scope of economics by examining the coverage of this dictionary, but the borderlines between such other disciplines as psychology, sociology, accounting and

geography are not easily defined and it is, perhaps, not particularly productive to attempt to do so. Political economy, an early title for the subject, now sounds old-fashioned but usefully emphasizes the importance of choice between alternatives in ceonomics which remains, despite continuing scientific progress, as much of an art as a science.

নীতিবিদ্যার স্বরূপ [৬]

নীতিবিদ্যা এক ধরনের বিজ্ঞান যা মানব আচরণের যথোচিত বা অযথোচিত ইত্যাদিকে নৈতিক মানদন্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করে থাকে। কিন্তু নীতিবিদ্যা মানদন্ড হিসেবে যেসব আদর্শকে মেনে নেয় তা অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে আলাদা। নীতিবিদ্যা সাধারণত আদর্শনিষ্ঠ বা নিয়মনিষ্ঠ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নীতিবিদ্যার স্বরূপ কী এ প্রশ্নের সঙ্গে মূলত কয়েকটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, সেগুলো হ'ল:

নীতিবিজ্ঞান কি বর্ণনামূলক (Positive science) বিজ্ঞান নাকি আদর্শনিষ্ঠ (Normative science) বিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞান কি তাত্ত্বিক (Theoritical) নাকি ব্যবহারিক (Practical) বিজ্ঞান? নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলোকে নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য উত্থাপিত হচ্ছে। নীতিদার্শনিক ও নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, নীতিবিজ্ঞান কি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মূলত 'আদর্শ'-এর অনুসন্ধান করে। বিপরীতক্রমে, নির্ধারিত আদর্শের আলোকে কোনোকিছুর মূল্যায়ন করাও এর লক্ষ্য। আমাদের মানব অভিজ্ঞতার জগতে তিন ধরনের আদর্শ কাজ করে,

১. সত্য (Truth): আমাদের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
২. সৌন্দর্য (Beauty): আমাদের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত।
৩. শুভ বা ভালো (Good): আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত।

এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সন্ধান মেলে

ক. সত্যের আদর্শ নিয়ে যুক্তিবিদ্যা
খ. সুন্দরের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে নন্দনতত্ত্ব।
গ. শুভ বা ভালোত্বের আদর্শ নিয়ে নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। 'নৈতিক মূল্য অবধারণ'-এর স্বরূপ, প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করাই নীতিবিদ্যার কাজ। সুতরাং, নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। ভালোত্বের আদর্শ নিয়ে কাজ বা আচরণের মূল্য বিচার করাই এর লক্ষ্য।

৬. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, 'নীতিবিদ্যা', প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০০৩, পৃ. ০৭-১১।

উইলিয়াম লিলির ভাষায়, সমাজে বসবাসকারী মানুষ ব্যতীত নৈতিক আচরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য নীতিবিদ্যার আদর্শিক ভিত্তি হ'ল সমাজ। এই বিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় সামাজিক আদর্শের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়। এদিক থেকে নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ব্যাখ্যা অনুসারে নীতিবিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানের মতো দুটি দিক রয়েছে। নীতিবিজ্ঞানের যেমন রয়েছে নৈতিক ঘটনা তেমনি রয়েছে আইন এবং আদর্শ। সুতরাং, প্রথম দিক থেকে নীতি সম্পর্কিত বিদ্যাটি একটি বিজ্ঞান আবার দ্বিতীয় দিক থেকে এটি আদর্শনিষ্ঠ। নীতিবিজ্ঞানের আদর্শনিষ্ঠ দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নীতিবিজ্ঞান

নৈতিক ঘটনা (ethical fact)

নৈতিক আদর্শ বা নিয়ম (ethical norms or ideal)

উপরের পর্যালোচনা অনুযায়ী নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, নীতিবিজ্ঞান কি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

নীতিবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানকে অনেক সময় বর্ণনামূলক বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও বলা হয়। এ ধরনের বিজ্ঞান প্রধানত 'ঘটনামূলক সত্য' (Factual truth) নিয়ে আলোচনা ও সেই সত্যের কারণ আবিষ্কার করে। "What it is" বা 'এটি কী' বা এর অবিকল বর্ণনা (as it is) দেয়াই বিজ্ঞানের কাজ। বস্তুনিষ্ট বিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে, অন্যান্য কিছুর সঙ্গে এর সম্ভাব্য সম্পর্কের ধরন কী রকম হবে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। কিন্তু নীতিবিদ্যা এ ধরনের বর্ণনা বা কার্যকারণিক সম্পর্কের তথ্য দেয় না। কিংবা মানব আচরণের স্বরূপ, প্রকৃতি, বিকাশ এবং মানবীয় কর্মকাণ্ডকে বিশেষ কোনো আইনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে না। অথবা আচরণের মধ্যে কোন প্রকার কার্যকারণিক সম্পর্ক আবিষ্কার করাও নীতিবিদ্যার লক্ষ্য নয়। নীতিবিজ্ঞান যে কাজটি করে তা হ'ল:

১. মানবীয় আচরণ যেভাবে আছে কিংবা এর প্রকৃতিগত বর্ণনা দেয়া নীতিবিদ্যার কাজ নয়।

২. নীতিবিদ্যা মূলত 'কীভাবে আচরণ করা উচিত' তার বিশ্লেষণ করে।

৩. নীতিবিদ্যা মানবীয় আচরণ প্রসঙ্গে কতকগুলো আদর্শের ভিত্তিতে মূল্য অবধারণ করে।

৪. নীতিবিদ্যা তথ্যমূলক অবধারণের চেয়ে মূল্যায়নমূলক অবধারণ নিয়ে বেশি আলোচনা করে। আর 'তথ্যমূলক অবধারণ' ঘটনা বা তথ্যের শুধু বিবরণ প্রকাশ করে। অন্যদিকে, অবধারণটি কীভাবে হওয়া উচিত তার স্বরূপ নিয়ে 'মূল্যায়নমূলক অবধারণ' আলোচনা করে। এ কারণে নীতিবিদ্যার অবধারণ হ'ল মূল্যায়নমূলক অবধারণ।

মূরহেড এর মতে, বিজ্ঞান কিছু অংশ তাত্ত্বিক এবং কিছু ব্যবহারিক। তিনি মনে করেন, ব্যবহারিক দিকের ভিত্তিতে নীতিবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করা হয়। কেননা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাত্ত্বিক। মূরহেড-এর ধারণা, জ্যোতির্বিদ্যা বা শরীরতত্ত্বের চেয়ে নীতিবিদ্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাছে। তিনি এ কথার দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, নীতিবিদ্যা একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এসব

দিক বিবেচনায় নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান। অনেক নীতিবিদ মনে করেন, নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ ও ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং কীভাবে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দেয়; সে অর্থে নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

এরিস্টটল বলেন, নীতি দার্শনিকদের স্থায়ী আগ্রহ একাধিক ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। নৈতিক অন্তদৃষ্টির গভীরতা অনুভব করে, সে দর্শন তার আগ্রহ ও মূল্যের দিক থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ই হয়ে থাকে।

সেথ-এর মতে, তত্ত্বকে অনুশীলন থেকে পৃথক করা চলে না, সে অর্থে নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ই। নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং যে বিজ্ঞান এই অন্তর্দৃষ্টি গভীরভাবে অনুসরণের কথা বলে, সেই বিজ্ঞান একাধারে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নীতিবিদ্যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালনার জন্য কোনো নিয়ম তৈরি বা সরবরাহ করে না। নীতিবিদ্যায় আলোচিত মতবাদগুলো তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন এই মতবাদগুলোর কোনো ব্যবহারিক যোগসূত্র থাকে।

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

মানুষের ক্রমবিবর্তনের ঊষালগ্ন থেকে অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় কর্মের উদ্ভব। আদিমকালের মানব সমাজের জীবন-যাপন প্রণালীর ব্যবচ্ছেদ করলে বিষয় দুটির উপস্থিতি অনুভূত হবে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষ মূলত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ এবং পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উৎপাদন কার্যক্রমের মত জটিল প্রক্রিয়ার উপযোগী ছিল না। তবে সে সময়ে মানুষের মধ্যে শ্রম বিভাজন ছিল, এ শ্রমবিভাজন প্রকৃতিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যেমন মেয়েরা শিশু লালন পালন ও ফলমূল সংগ্রহের কাজ করেছে এবং পুরুষেরা পশু শিকার ও শিকারের উপাদান সংগ্রহের মত কাজ করত। প্রকৃতিকে বুঝতে পারার সীমাবদ্ধতা, হিংস্রপ্রাণীর সাথে লড়াই করে টিকে থাকা, বৈরি প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষার কৌশল অনুসন্ধান ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টা আদিম মানব সমাজ যৌথভাবে চালিয়েছে। টিকে থাকার স্বার্থেই সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা বিদ্যমান থাকায়, সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর স্বল্পতা ও প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং প্রকৃতির বৈরি পরিবেশে দলবদ্ধভাবে টিকে থাকার উপায় হিসেবে খাদ্য ও অন্যান্য সংগৃহীত দ্রব্য সমান ভাগ করে ব্যবহার করার নীতির জন্ম হয়েছিল। কার্ল মার্কস এ জন্যই এ সমাজকে 'আদিম সাম্যবাদী মানব সমাজ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সমবন্টন ও গোষ্ঠীর সব সদস্যের ক্ষুধা মেটানোর প্রয়াস অর্থনীতি ও সুনীতির পারস্পরিক নির্ভরতার শর্ত পূরণ করে।

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের (আদিম সাম্যবাদী, দাস, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী সমাজ) সাথে সাথে শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের শাখা এ দুটি বিষয় আদর্শবাদী বিজ্ঞান এবং উভয়েরই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে (দাস, সামন্ত ও পুজিবাদী সমাজ) প্রভু/মালিক/শোষকদের সুনীতি দাস/ভূমি দাস/শ্রমিকদের জন্য কু-নীতি হয়ে পড়ে। এই জন্য শ্রেণিহীন সমতাভিত্তিক অর্থনীতিক সমাজে কেবল সবার গ্রহণযোগ্য সুনীতির দেখা মিলবে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ হলে শ্রেণিহীন সমাজে সুনীতির এ দ্বৈত চরিত্রের অবসান হবে।

'অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' (২০১৮: ৬৬) গ্রন্থে, আবুল বারকাত লিখেছেন, "মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ৫০ লক্ষ বছরের। আর আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বয়স তার চেয়ে একটু কম, এবং তাও ৪৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর। কিন্তু আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন কারও সাক্ষাৎ মেলা ভার এবং তখন অর্থনীতিশাস্ত্র ছিল মূলত নৈতিক দর্শনের অথবা নীতিশাস্ত্রীয় দর্শন অথবা ইতিহাস শাস্ত্রের (Moral Philosophy বা history) একটি শাখা মাত্র।" তিনি সেইসাথে পাদটিকায় লিখেছেন, "১৯02 সাল পর্যন্ত অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি দেবার প্রচলন ছিল না। ঐ সময় পর্যন্ত অর্থনীতি বিষয়টি নীতিশাস্ত্র অথবা ইতিহাস এর উচ্চতর পর্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তির শর্তাধীন একটি বিষয় ছিল। ১৯০৩ সালে, আলফ্রেড মার্শালের অনেক বছরের প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রির ব্যবস্থা করা হয়। এর পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ডিগ্রি প্রবর্তন হয়।" এ অর্থে অর্থনীতি একটা অর্বাচীন বিষয়।

মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানব সমাজ কাঠামো সবসময় সমাজ-মানুষের জীবন প্রণালী থেকে উৎসারিত। এটি গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কয়েকটি স্তর পেরিয়ে মানব সমাজ বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে। প্রতিটি স্তরের সমাজ কাঠামোর রূপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যথা:

১. আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক বা সাম্যবাদী সমাজ
২. দাস সমাজ
৩. সামন্তবাদী সমাজ
৪. পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ ও
৫. সমাজতান্ত্রিক সমাজ যার আরও বিকশিত রূপ হচ্ছে আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ।

সমাজ কাঠামো একটি অখণ্ড সত্তা যার অঙ্গিভূত প্রতিটি উপাদান পরস্পর নির্ভর ও সম্পর্কিত। সমগ্র সমাজ দুটি কাঠামোয় বিভক্ত। যেমন:

১। মৌল কাঠামো (Basic Structure)
২। উপরি কাঠামো (Super Structure)।

সমাজ কাঠামো দ্বিমাত্রিক। মার্কসের ভাষায় মৌল কাঠামো উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক তথা অর্থনীতি। উপরি কাঠামো মৌল কাঠামোর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে যার মধ্যে থাকে সংস্কৃতি ও সামাজিক দিক।[৭]

উৎপাদন প্রণালি/উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা:

উৎপাদন প্রণালি-পদ্ধতির (Mode of Production)[৮] প্রধান দুটি দিক হল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। আবার উৎপাদন শক্তির দুটি দিক হল উৎপাদনের উপায় বা উপকরণ যা আবার শ্রম সহায়ক

---

৭. মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ কে এম শওকত আলী খান, 'প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান', পৃ. ১৬২ ও ১৬৩।
৮. মনোরঞ্জন দে, 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি', পৃ. ৮ ও ৯।

উপকরণ ও শ্রম প্রয়োগের সামগ্রীতে ভাগ করা যায়। অন্যটি হল উৎপাদনের ব্যাপারে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের শ্রম শক্তি। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যথা: (১) উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার প্রকৃতি (২) সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং (৩) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বিতরণের প্রকৃতি।

উৎপাদন প্রণালি (Mode of production) তথা উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারা পাঁচটি পৃথক স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

(১) আদিম গোষ্ঠীগত বা সাম্যবাদী সমাজ (Primitive communal society) (২) দাস সমাজ (slave society) (৩) সামন্তবাদী সমাজ (feudal society) (৪) পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ (capitalist society) ও (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ (Socialist society) যার আরও বিকশিত রূপ আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ (Modern communist society)। এ পাঁচটি স্তরে পাঁচটি পৃথক উৎপাদন প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। একটি স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সাথে পরবর্তী ও পূর্ববর্তী স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কে প্রকৃতিগত ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। আবার কোনো একটি স্তরের সাথে অপর স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার প্রতিটি স্তরের উৎপাদন প্রণালীর উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তি প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ধাপ পরিলক্ষিত হয়।

অর্থাৎ মানব সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরের রয়েছে নিজস্ব উৎপাদন প্রণালী। নিম্নতর সামাজিক স্তরের উৎপাদন প্রণালী থেকে উন্নতর সামাজিক স্তরের উৎপাদন প্রণালীর গুণগত ও পরিমাণগত মান অপেক্ষাকৃ ত বিকশিত ও উন্নততর। আদিম সমাজবাদী সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের চেয়ে দাস সমাজব্যবস্থার উৎপাদন শক্তি যেমন, অপেক্ষাকৃত বিকশিত এবং উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদন প্রণালীর (Mode of production) প্রধান দুটি দিক উৎপাদন শক্তি (production foroce) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (production Relation)। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

উৎপাদন শক্তির দুটো দিকের একটি উৎপাদনের উপায় বা উপকরণ যা মানুষ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে অথবা নিজেরা তৈরি করে নেয়। উৎপাদন শক্তির দ্বিতীয়টি হল উৎপাদনের ব্যাপারে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের শ্রম শক্তি। এটির বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন মানুষ যত বুঝতে পারবে, উৎপাদন কর্মসহ জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পন্ন করতে করতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার সামাগ্রিক পরিবেশ উপলদ্ধিসহ শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঘটে।

উৎপাদন সম্পর্কের[৯] মধ্যে থাকবে (১) উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানার প্রকৃতি (যেমন, ব্যক্তিগত বা সামাজিক মালিকানা); (২) সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থান ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক

---

৯. কোনো সমাজের উৎপাদন উপকরণগুলোর মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক হয় তাকে বলে উৎপাদন সম্পর্ক। আদিম সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে উপকরণগুলোর সামাজিক মালিকানা বা যৌথ মালিকানার কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয় বৈষম্যহীন পক্ষান্তরে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান থাকায় যারা শ্রমশক্তি ছাড়াও অন্যান্য উপকণের মালিক এবং অন্য মানব গোষ্ঠী যারা কেবলমাত্র শ্রমশক্তিরই

যেমন পুঁজিবাদী সমাজে থাকে মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি, উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনকারী ও উদ্বৃত্ত সৃজনকারী; (৩) বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ বিতরণের বিভিন্ন প্রকৃতি (আদিম সাম্যবাদী ও আধুনিক সাম্যবাদী সমতার ভিত্তিতে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনের শর্ত বিদ্যমান থাকে; পক্ষান্তরে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজে সম্পদ বণ্টনে অসমতার শর্ত লক্ষ্য করা যায়)।

উৎপাদন প্রণালী বা পদ্ধতির বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, সমাজের এই মৌল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সমাজের উপরি কাঠামো তথা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, নীতি নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির অবয়ব ও প্রকৃতি নির্ণিত হয়।

যে সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন প্রণালীতে বা মৌলকাঠামোতে বা অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত সে সমাজে উদ্বৃত্ত শোষণও স্বীকৃত। এ জন্য সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণি শোষণ এবং তা মেনে নেয় এমন নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধের এই অবস্থানে কোনো অসুবিধা হয় না। সমাজের বিকাশে মৌল কাঠামোর (Basic structure) নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা থাকলেও উপরি কাঠামো (Super sturucture) মৌল কাঠামোকেও প্রভাবিত করে সমাজের আমূল পরিবর্তনে। মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় Mode of production structure অনেকটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রের মতই কাজ করে।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। পুঁজিবাদ পণ্য উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন এক স্তর যখন উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানা সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণির মানুষের হাতে থাকে। আর অন্য দিকে সমাজের বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী তাদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবনধারণে বাধ্য হয়। এ সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের মূলত দুটো স্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রাক একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্তর এবং অন্যটি একচেটিয়া পুঁজিবাদ। প্রথম স্তরে রয়েছে বাণিকতন্ত্র, কলকারখানার যুগ এবং শেষের স্তরে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ।

প্রায় সারা পৃথিবীর অর্থব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিশেষ করে, পৃথিবীর সব পুঁজিবাদী দেশে আজ একচেটি পুঁজিবাদী কারবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উদ্ভব হয়েছে ওলিগোপলি কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাষ্ট এবং কনসার্ন-এর মত বাণিজ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার।

পুঁজিবাদের বিকাশের এ পর্যায়ে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রিভূতকরণ ঘটেছে। শিল্প পুঁজির সাথে ব্যাংক পুঁজির সমন্বয় ঘটেছে, মূলধন রপ্তানি (পুঁজিবাদের প্রাক একচেটিয়া যুগে রপ্তানি হয় পণ্য কিন্তু একচেটিয়া যুগে পুঁজি রপ্তানি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়) প্রাধান্য পায়। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা একত্রিত হয়ে সংঘ গঠনের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এই বণ্টন হয় মূলত শক্তির ভিত্তিতে। তাই শক্তির হ্রাস- বৃদ্ধির কারণে এই বণ্টনও স্থায়ী হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে বিশ্ববাজার বণ্টন-পুনঃবণ্টনের নিমিত্তে সংঘটিত হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বহুজাতিক কোম্পানী। এদের শক্তি এত যে এদের

মালিক অর্থাৎ অন্যান্য উপকরণের মালিক নন তাদের মধ্যে দাসমালিক–দাস, সামন্ত প্রভু–ভূমিদাস ও মালিক- শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণিত হয়। উপকরণগুলোর মালিকানা মালিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে থাকার দরুন তারা অন্য শ্রেণির উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সবধরনের শ্রেণি শাসন জারি রাখতে সক্ষম হয়। শ্রেণিশোষণ ভিত্তিক সমাজগুলোর রাষ্ট্রব্যবস্থা এই বৈষম্যকে লালন করে; এটাই এসব সমাজ বা রাষ্ট্রের নীতি নৈতিকতার অসমতা ও অমানবিক দিক।

চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক রাষ্ট্রকেই অকার্যকরী রাষ্ট্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে খনিজ তেল উত্তোলন ও বিপণনে নিযুক্ত বহু জাতিক কোম্পানী ও অস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া কারবারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে প্রায় অকার্যকরী রাষ্ট্র করে ফেলে জনজীবনকে ধ্বংসাত্মক বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নেতৃত্বে লুন্ঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অনুষঙ্গমাত্র।

'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর'[১০] এ পর্যায়ে এসে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব (উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদন প্রণালী ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, সম্পদ বন্টণের ক্ষেত্রে গৃহীত হয় বৈষম্যমূলক বন্টন পদ্ধতি) এড়ানোর জন্য, মুনাফার হার ঠিক রাখার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের সেবা সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এমন সব পদক্ষেপ নেয় যা মানব সভ্যতাকেই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। এরা গোটা পৃথিবীর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। পশ্চাদপদ মূল্যবোধ, অন্ধত্ব, সংকীর্ণ জাতি-গোত্র-গোষ্ঠী-বর্ণবাদকে উস্কে দেওয়ার মত অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করছে। আবার এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সংকটই হল সমাজের আমূল পরিবর্তনের বা আরো বিকাশের objective Condition[১১] (নৈর্ব্যক্তিক শর্ত)। শোষিত নির্যতিত সর্বস্তরের মানবগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের এই পবিবর্তন সম্পন্ন হবে। আর এটিই হল পুঁজিবাদ-উত্তর বিকশিত উৎপাদন প্রণালী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি সৃজনের Subjective condition (কার্যগত শর্ত)।

নিরাপদ অর্থনীতির সন্ধানে

দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত পল সুইজির সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি গ্রন্থের 'পুঁজিবাদ ও পরিবেশ' নিবন্ধে লিখেছেন (পৃ. ১৬৭-১৬৮)[১২]:

"মানবজাতি যে আজ তার দীর্ঘ ইতিহাসের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এ-কথা স্পষ্ট। পারমাণবিক যুদ্ধ মানুষের এই সাজানো সংসারকে নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু, এই বিপর্যয়কে যদি এড়ানোও যায়, তবুও আজ আমরা যাকে সভ্য সমাজ বলে জানি তার টিকে থাকার ও বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থা বজায় থাকবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আমরা বেঁচে থাকি ও বাঁচার রসদ সংগ্রহ করি মাটি, জল এবং বাতাস দিয়ে তৈরি যে বাস্তব পরিবেশ থেকে, ঐতিহাসিকভাবে ধরে নেওয়া হয়, তার স্থায়িত্ব অনন্ত ও এবং তাকে যতোখুশি ব্যবহার করা সম্ভব। তার মানে কিন্তু এই নয় যে পরিবশকে ধ্বংস করা যায় না। ইতিহাসে পরিবেশের অংশবিশেষ ধ্বংস করার (অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলার) বহু নজির রয়েছে, যার জন্য দায়ী হয় প্রাকৃতিক ঘটনা, নয়তো মানুষেরই কার্যকলাপ। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু মোটেই দুস্তর নয়। বহু পরিবেশ পরিবর্তনই এই দুইয়ের (প্রাকৃতিক ঘটনা ও মানুষ) সম্মিলিত কাজের পরিণাম। তবে, বিশাল ভূতাত্ত্বিক

১০. 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর', লেনিন।

১১. সমাজের পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক দুটি শর্ত: যথা (১) Objective Condition ও (২) Subjective Condition.

১২. পল সুইজি, 'সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি' গ্রন্থের 'পুঁজিবাদ ও পরিবেশ, এবং 'আজকে, ১৫০ বছর পরে কমিউনিস্ট ইশতেহার' নিবন্ধ দুটি থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৭-১৬৮, ১৯৮-১৯৯, দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত।

পরিবর্তনের মতো কিছু পরিবর্তন আছে যাতে মানুষের কোনো ভূমিকাই নেই, এবং জঙ্গল কেটে উড়িয়ে দেয়ার প্রভাবের ক্ষেত্রে আবার মানুষের কার্যকলাপই কেবলমাত্র দায়ী।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এসব বদলে যেতে শুরু করলো। প্রথমে নতুন বোমাটা মূলত তৎকালীন অস্ত্রগুলোরই উন্নত রূপ বলে ভাবা হয়েছিল; কিন্তু,পরস্পর সংযুক্ত ঘটনা-পরম্পরা ধীরে ধীরে জনগণের চেতনায় আমূল পরিবর্তন আনলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন যা আশা করা গিয়েছিল তার অনেক আগেই বোমা বানিয়ে ফেললো, ফলে এই ধারণাও চুরমার হয়ে গেল যে, এই শক্তি একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তারপর এল হাইড্রোজেন বোমা, যার বিধ্বংসী ক্ষমতা বহুগুণ বেশি, এবং এরই পর শুরু হল মহাশক্তির দেশগুলোর মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যা প্রচুর কথাবার্তা এবং কিছু প্রধানত প্রতীকী চুক্তি সত্ত্বেও, আজও অব্যাহত। আজ এটা সবাই জানে যে, প্রতিটি শক্তিধর দেশই তার প্রতিপক্ষকে বেশ কয়েকবার নিশ্চিহ্ন করে দেবার শক্তি ধরে; এবং বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে চালু গবেষণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, এই প্রলয় যুদ্ধরত দেশগুলোর সীমা ছাড়িয়ে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে, তেজস্ক্রিয় বিষক্রিয়া ও পারমাণবিক শীতের মত বীভৎস চেহারা নিয়ে। অতএব, অর্ধশতকের মতো অভাবনীয় কম সময়ে মানবজাতি তার পরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কে তুরীয় আত্মবিশ্বাসের অবস্থান থেকে নিশ্চিত হয়েছে যে, মুহূর্তের পারমাণবিক হিংসার এক দমকা হাওয়াই তার অস্তিত্ব, তথা তার প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো রকম জীবনকে ধারণ করার ক্ষমতাকে, নিশ্চিহ্ন করবার পক্ষে যথেষ্ট।”

উল্লিখিত গ্রন্থের ১৯৮ ও ১৯৯ পৃষ্ঠায় পল সুইজি ‘আজকে, ১৫০ বছর পরে কমিউনিস্ট ইশতেহার’ নিবন্ধে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলেছেন “মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁদের ছিল এই গভীর প্রত্যয় যে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ও অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বগুলোই ক্রমবর্ধমান এবং শেষ পর্যন্ত সফল বিপ্লবী লড়াই এর জন্ম দেবে, যা এই ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে তার জায়গায় অনেক বেশি মানবিক ও ন্যায় সঙ্গত এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর কোন সম্ভাবনা বা তার বাস্তব রূপ কি আদৌ মেলে? আমার ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর বিতর্কাতীতভাবেই হচ্ছে না। ইশাতেহারের প্রথম দিকেই বস্তুত বুর্জোয়া ও সর্বহারা শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বহুল উদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছিল: আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত ও নীচুতলার মানুষ, ভূস্বামী ও ভূমিদাস, গিল্ড মালিক ও কারিগর এক কথায় শোষক ও শোষিত চিরকাল থেকেই পরস্পর বিরোধী হিসেবে, ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে গেছে, কখনো গোপনে, কখনো বা প্রকাশ্যে, এবং প্রতিবারই তা হয় সামগ্রিক সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনের মধ্যে, কখনো বা দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলোর সাধারণ সর্বনাশে।”...“ আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে দুনিয়ার মানুষের কাছে এই প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরা যায় যে, বুর্জোয়াতাত্ত্বিকরা যেমন আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন পুঁজিবাদই হচ্ছে, ‘ইতিহাসের অবসান’, তা নয়, বরং পুঁজিবাদের অব্যাহত অস্তিত্বই ইতিহাসকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।”

সব মানুষের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটবে অথচ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে সর্বনিম্ন এমন উৎপাদন কৌশল ও প্রক্রিয়া নির্বাচন পূর্বক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেমন (১) বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার তেমনি (২) মুনাফা নয় জনকল্যাণমুখী লক্ষ্য থাকা দরকার।

পুঁজিবাদ মুনাফা দ্বারা তাড়িত হয়ে বিগত ৩০০ বছরে পরিবেশের ক্ষতি করেছে। প্রাক একচেটিয়া পুঁজির যুগের চেয়ে একচেটিয়া পুঁজিরযুগে এই ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে। দুটি মহাযুদ্ধ ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে লেগে থাকা আঞ্চলিক যুদ্ধ সকলেই মুনাফা তাড়িত কর্মসূচির বাস্তবায়ন মাত্র।

অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য উদারবাদী মতবাদ একচেটিয়া পুঁজি এবং তার রক্ষার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের "স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ববাজার, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। শুধু তাই নয় ঐসব একপেশে বিধি বিধান নিয়ম কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তি বিধান তৈরির দায়িত্ব তাঁরা নিজে নিজেই নিয়েছেন, ফলে দুর্বল দেশের (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরিব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয়- প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। এহেন মহাবিপর্যয় থেকে মানুষ সমাজকে মুক্তি দিতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও বিশ্ব কব্জাকরণ প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময়কাল কেটেছে সমাজভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে (আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায়); যেহেতু মানুষ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাসা করে তা স্থির-অনড় নয় (static নয়) তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (dynamic) এবং শেষ বিচারে প্রগতিমুখী; যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে; এবং যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবশ্রম-দক্ষতাসহ উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান আপাতদৃষ্টিতে 'অসীম শক্তিধর' উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে- সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানবকল্যাণকামী বৈশ্বিক এ সমাধান কোনো আপ্তবাক্য নয় ব্যাপারটা সময়ের। জটিল প্রক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তো বা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মতো 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নিকোলাস কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) মতো 'মহাবিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) মতো নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। বিষয়টি জ্ঞানতত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয়ই।"[১৩]

উপসংহার

মানব সমাজের বিবর্তনের ১ম (আদিম সাম্যবাদী সমাজ) ও ৫ম (আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ) স্তরে শ্রেণি শোষণ, সম্পদের/উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য ছিল না, থাকবে না। ২য় (দাস সমাজ), ৩য় (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ) ও ৪র্থ (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ) স্তরে শ্রেণি শোষণ, সম্পদ/উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ব্যক্তি মালিকানা, বণ্টন ব্যবস্থায় অসমতা বিদ্যমান ছিল এবং রয়েছে। সমাজ কাঠামোর দুটি স্তর: (১) মৌল কাঠামো (Basic structure) এবং (২) উপরি কাঠামো (Super sturucture)। মৌল কাঠামোতে থাকে অর্থনীতি উপরি কাঠামোতে থাকে সংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি। ভিতর কাঠামোর আদলে গড়ে ওঠে উপরি কাঠামো, ভিতর কাঠামোর উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন/উত্তরণ ঘটলে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। তবে উপরি কাঠামোও ভিতর কাঠামোর বিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উল্লিখিত সমাজের সব স্তরের জন্য স্বতন্ত্র উৎপাদন প্রণালী রয়েছে। শোষণ ভিত্তিক শ্রেণি বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামো সমূহের মধ্যে

১৩. আবুল বারকাত প্রণীত 'অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৭, পৃ. ১৮০-১৮১ (মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ)

পুঁজিবাদের উৎপাদন প্রণালী অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও সমৃদ্ধ। এই স্তরে মানব সভ্যতার অভূত উন্নয়ন ঘটেছে, আবার মানুষের চরম সর্বনাশের শর্ত এই স্তরেই উদ্ভব হয়েছে। অতি উৎপাদন, উপকরণের (Means of production) অতি উৎপাদন, পুজির চরম কেন্দ্রিকরণ, উৎপাদনশীল পুঁজির লগ্নি পূঁজিতে রূপান্তর ,পুঁজির যান্ত্রিকিকরণ, চরম বেকারত্ব, যুদ্ধ অর্থনীতির সম্প্রসারণ, উৎপাদনমূলক খাতের চেয়ে সেবা খাতের প্রাধান্য, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর, মুনাফার হার ঠিক রাখতে গিয়ে কখনও মন্দা কখনো মুদ্রাস্ফীতির আগমন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে অস্থিতিশীল করে তোলে, সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সংস্থার করাল গ্রাসে পতিত হওয়া পক্ষান্তরে লক্ষকোটি মানুষের জীবনে দুর্বিসহ যাতনা, ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, নিরাপত্তাহীনতা, প্রভৃতি বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার অক্ষমতা সর্বোপরি সর্বনাশের কালো ছায়া নেমে এসেছে। এই গগন প্রমাণ বৈষম্য সংকট মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ও বন্ধাত্ব অপনোদন এর জন্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান এবং নীতিনিষ্ট সমতার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সব স্তরের বঞ্চিত মেহনতি মানুষের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা মানব সভ্যতাকে আরো বিকশিত করবে এবং রক্ষা করবে।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 075-094
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি ও নৈতিকতা

আবদুল আউয়াল মিন্টু*

সারকথা: *অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বাজার, সরকার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সবার নানা ত্রুটি ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাদের ধারণা, জনসাধারণ সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ পূরণে নিয়োজিত থাকেন। তবে এসব কথা তাঁরা অস্পষ্ট ভাষায় বলেন; সে কারণে সাধারণ মানুষ তা বোঝে না। তবে, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশে তারা সেই ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।*

অর্থনীতি ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটো বিষয়, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ও গভীর সম্পর্কিত, দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। যেকোনো দেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি সেই দেশের রাজনীতির কাঠামোতে নিহিত। রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য থাকলে কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে একক আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয় না। বরং, সামাজিক গোষ্ঠীগুলো একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎকর্ষতা বাড়ায়। ভৌত অবকাঠামোর মতো সমাজ অবকাঠামো ও সামাজিক মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

উদার অর্থনৈতিক সমাজের বিরুদ্ধে যুক্তি হলো ঐ সমাজের অর্থনীতি মুনাফার দ্বারা পরিচালিত। মুনাফা মানেই লিপ্সা। তাই মুনাফা অনৈতিক। মুনাফার সঙ্গে লোভের সম্পর্ক চিরাচরিত। অন্যদিকে তত্ত্ব হলো মুনাফা "নিয়ামকের" ভূমিকা পালন করে। সবাই চায় ব্যবসায়ীদের মাঝে নৈতিকতাবোধ থাকা উচিত। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও আয়ের সমতা-অসমতার কারণে নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু, প্রত্যাশিত এই নৈতিকতার পরিমাপ ও পরিধি কি হবে তা কেউ জানে না। নৈতিকতার নানা দিক ও মাত্রা আছে। ব্যক্তিগত সততা, ন্যায্য আচরণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যথাসময়ে দেনা পরিশোধ, এ সবই যেমন মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার সাথে জড়িত, তেমনি দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তবে কোনো পরিমাণের নৈতিকতাই মানুষের আয়ে সমতা আনবে না, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমবে না। বৈষম্য হ্রাসের মূল চাবিকাঠি মূলত ন্যায়ভিত্তিক সমাজে অধিক উৎপাদনের মাঝে নিহিত।

কুলিন ও অভিজাত মহলের হাতে যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তারা সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ত্ব করে। এতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। দুর্নীতি গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। দুর্নীতির কারণে অবৈধ সম্পদ গড়ে

* সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই

উঠে, সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রসার ঘটে, আইনের বিকৃতি হয়। অবৈধ টাকার মালিকরা হয়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃপক্ষের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনৈতিক রাজনীতিই হলো দুর্নীতির মূল উৎস।

বাংলাদেশে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ক্ষমতা, তাদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক আচার-আচারণ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, আইনের শাসনের দুর্বলতা, অকার্যকর প্রতিষ্ঠান ও নিচুমানের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা দেশের শ্রমজীবি মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্য সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি, নিরাপত্তার পরিবেশ ও নিত্যনূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুফল কেড়ে নিচ্ছে। এসবই নৈতিকতার সাথে জড়িত।

সমাজে নৈতিকতার মাত্রা বাড়াতে হলে সুশীল সমাজের সবাইকে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতি, আইনের শাসন, সামাজিক মূলধন সৃষ্টি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সব বাধা-বিপত্তি সরাতে হবে। এতে একদিকে সামাজিক অস্থিরতা প্রশমিত হবে, বিনিয়োগ ও সম্পদ বাড়বে, আয়বন্টনে বৈষম্য কমবে এবং নৈতিকতার উৎকর্ষতা বাড়বে।

অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা

অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বাজার, সরকার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবার নানা ত্রুটি বের করেন। কিন্তু, যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা ওঠে, কোনো অভিযোগ করা হয় তখন তারা মনে করেন তাদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না। কারণ, তারা দাবি করেন দেশে যা কিছু খারাপ ঘটে, তা হোক মন্দা অর্থনীতি অথবা বিনিয়োগে স্থবিরতা, সেগুলোর কারণ আর যা-ই হোক তারা নন। তারা বড় জোর সেসব অশুভ বার্তা-আভাসের বাহক মাত্র। তাদের মতে, রাজনীতিকরাই বাস্তবে অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন। আর জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও লেনদেন করতে গিয়ে সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ পূরণে নিয়োজিত থাকেন। ব্যবসায়ীদের কোন নৈতিকতা নেই। তারা অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকেন। বিনিয়োগকারীরা ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে টাকা নিয়ে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে সেই টাকাকে অন্যত্র কাজে লাগান। অনেক সময় টাকা ফেরৎ না দিয়ে বিদেশে পাচার করেন। মুনাফার প্রতি তাদের লোভ-লালসা ও অভিশাপ সমাজে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করে।

এ কথা সত্যি, অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তাদের শক্তিশালী বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারি নীতির ওপর আলোকপাত করে ঐসব বিষয় সাধারণ্যে এনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদিক থেকে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের মতামত দিতে পারেন। আর সেগুলো এক পর্যায়ে অসীম শক্তিশালী হয়ে যারা নিত্য অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ও চর্চা করেন তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এফ এ হায়েক অর্থনীতি শাস্ত্রে তার তরুণ অনুসারীদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "কোনো বিষয়ে কেউ কঠোর বিতর্কের অবতারণা করলে তাকে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই একঘরে ও কোনঠাসা হয়ে পড়তে হবে, তার জনপ্রিয়তা থাকবে না"। অবশ্য এর পরেও তিনি বলেছেন, "অর্থনীতিবিদকে তার উদ্যোগ ও প্রয়াসে জনসমর্থন ও সহানুভূতি কী পাওয়া গেল তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না"। এ হলো জ্ঞানের নৈতিক দিক, যাকে সমুন্নত রাখতে হবেই"। আমাদের সমাজে একজন অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ তা হায়েক-এর এ মন্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যায়।

অর্থনীতি বনাম রাজনীতির নৈতিকতা

অর্থনীতি ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী সেতুবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে সবসময়ই রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোনো সমাজেরই একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো থাকে। এই কাঠামো একই সঙ্গে সে সমাজের বাজারব্যবস্থা ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তাই সমাজ, ধনীই হোক আর গরীবই হোক, অবশ্যই তার দু'টি অংগ থাকবে। অপরিহার্য এই অংগ দু'টি হলো অর্থনীতি আর রাজনীতি। অর্থনীতির মাধ্যমে রাজনীতি বিকশিত হয় তবে রাজনীতি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কোনো বাজার আদর্শই বিকশিত হতে পারে না। এ দুটি অংগ একে অন্যের পরিপূরক। যে কোনো একটির সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা মানেই হলো অসম, অস্থির, দুর্বল ও বৈষম্যর সমাজ।

অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল ও আগের শতকের অন্যান্য বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা ব্যবসা, বাণিজ্য, বাজার পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে তাদের বিশ্লেষণমূলক লেখায় সে সময়ের সরকার-রাজনীতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর গঠন ও কার্যকলাপ প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

এছাড়া শ্রমিকদের বিশেষত্ব অর্থনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুটো বিষয়ের—একে অন্যের উপর নির্ভরতার গুরুত্ব ও গভীর সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা এড়িয়ে গেছেন। সম্প্রতি এই বাস্তবানুগ বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। বিশ শতকের অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুমপিটার প্রথম এ বিষয়ের বিশদ পর্য্যালোচনা করেন। এরপর থেকে অর্থনীতিবিদরা যে কোনো দেশের জন্য নূতন অর্থনৈতিক মডেল বা নীতি তৈরি করার সময়ে সে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, শ্রমিকের বিশেষত্ব ও সে সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য - রাজনীতি ইত্যাদিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এরপরও তারা শ্রমিক বিভাজন ও বিশেষায়নের মত বিষয়গুলোর, যেমন প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধান, লেনদেনের খরচকে (Transaction Cost) তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বা লেনদেনের ব্যয় সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে। অ্যাডাম স্মিথের "উদার বাজার ব্যবস্থাপনাকে" পুঁজিবাদের নৈতিক দর্শনের (Moral philosophy of capitalism) ভিত্তি হিসেবে মেনে নিলেও একটা নৈতিক অর্থনৈতিক (Moral economy) ব্যবস্থা কেবল তখনই সফল হতে পারে যখন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একটা চমৎকার সংমিশ্রণ ও সন্নিবেশন থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা যদি গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে বা বিশেষ বিশেষ মহলের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়, তাহলে এই বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেশের যাবতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। এটিই রাজনৈতিক ও অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও চরিত্র। এই নীতি অবশ্যই অ্যাডাম স্মিথের উদারনৈতিক বাজার ব্যবস্থাপনা বিরোধী।

বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অশুভ, অনৈতিক ও অসাংবিধানিক আচরণ এবং বিভিন্ন সময়ে অপরিণামদর্শী অর্থনৈতিক নীতির কারণে সরকার বদল হলেও দেশে শাসন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার হাতে কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সরকারগুলো; আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে স্বৈরাচারী আদলে দেশ চালিয়েছে। ফলে একদিকে মানুষ যেমন শংকিত আবার অন্যদিকে তারা সংশয়ে রয়েছেন এই ভেবে যে, বারবার সরকার বদলানো সত্বেও কেন তাদের দুর্ভোগ দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে। তাই একদলের কাছ থেকে আরেক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেয়ে এ মুহূর্তে সমাজের নৈতিক দর্শন, লক্ষ্য হওয়া উচিত রাজনীতির আমূল সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর

মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এনে, প্রথমে 'সামাজিক সমস্যার সমাধান' করা। সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য বিধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান একটি বড়, একমাত্র উপায়। সাথে সাথে যদি সমাজে অধিকার ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে অ্যাডাম স্মিথের উদার অর্থনৈতিক দর্শন, ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দিলে তারা একে অন্যের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে আয়ের দায়িত্বশীল বণ্টন ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে সমাজে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। ক্ষমতার ভারসাম্যের বিধান করে, অনেক সমাজ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নৈতিক চরিত্র বা আচার ব্যবহার সমাজের কোনো একক গোষ্ঠীর ব্যাপার নয় - তা হোক সরকার, রাজনৈতিক দল, অথবা ব্যবসায়ী শিল্প গোষ্ঠী। তাই মানুষ তাঁর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুযোগ পেলেই এককভাবে অথবা কোনো গোষ্ঠীর সমর্থনে বাজারের ওপর একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। যখন রাজনৈতিক ও ক্ষমতা ভারসাম্যের বিধান থাকে তখন কোনো একক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তখন তারা একটি উদারপন্থী প্রজাতান্ত্রিক (গণতান্ত্রিক) শাসনব্যবস্থা ও বাজার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সাথে সাথে একই কারণে তাঁরা দরকষাকষির মাধ্যমে আপোষরফা করে একটি প্রয়োজনভিত্তিক সামাজিক কাঠামো গঠন করতে বাধ্য হয় যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইনি নিশ্চয়তা (আইনের শাসন), দুর্নীতিরোধ, ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার স্থায়ী বিধান, মেধার পরিপালন, উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে সহায়তা, মানবধিকারের সংরক্ষণ, কোম্পানীর প্রশাসনে সুশাসন, ইত্যাদি। সুষ্ঠু নিয়মনীতির ভিত্তিতে এগুলো তৈরি হয় বলে সমাজের প্রায় সব মহলে এর একটি গ্রহণযোগ্যতাও থাকে। গ্রহণযোগ্যতা থাকলে সেটিকেই 'নৈতিক' বলে ধরে নেয়া হয়।

অর্থনীতি বনাম সামাজিক নৈতিকতা

মূলধন বলতে সবাই বিনিয়োগ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অর্থের লেনদেনমূলক ধারকর্জকে বোঝেন। বিনিয়োগ প্রসারে আর্থিক মূলধনের সহায়ক হিসেবে সামাজিক মূলধন একটি অতীব অতিজরুরি উপকরণ। বলা যায়, আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। সামাজিক মূলধন উদ্ভাবনী ও উদ্যমভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করে। যেসব দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে আছে সেগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে প্রথমেই সামাজিক বিশৃঙ্খলার দুষ্টচক্র থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যদি আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে পা বাড়াতে হয় তা হলে অবশ্যই এ বিষয়ে বড় রকমের পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কায়িক ও যান্ত্রিক– এই উভয় অর্থনীতি এবং সস্তা শ্রমভিত্তিক উৎপাদনের অর্থনীতি থেকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য চেষ্টা চলছে। এ কারণে গোটা রাষ্ট্রসত্তার কর্তব্য হলো দেশের সামাজিক অবকাঠামোকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা।

ব্যক্তি, পরিবার, পারস্পরিক বিশ্বাস, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (communities), সমাজ প্রতিষ্ঠান ও নানাবিধ ব্যবসা, বাণিজ্যিক ও পেশাদার সংগঠন যা সমাজকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে, ঐক্যবদ্ধ করে, সংযোগ সৃষ্টি করে, সেসবের মিশ্র ও সামষ্টিক মূল্যবোধ থেকে সামাজিক মূলধন গড়ে উঠে। বলাবাহুল্য, সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সামষ্টিক মূল্য বা সামাজিক মূলধনের পর্যাপ্ততা আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। তাই অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও বিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান কেবল

অর্থনীতিবিদদের তৈরি মডেলেই নিহিত থাকে — এটি এক মারাত্মক ভুল ধারণা। একটি দেশে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনাগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করতে হলে সে দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে পুরোপুরি হিসেবে আনতে হবে।

বস্তুতপক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কার ও পরিবর্তনের যে কোনো উদ্যোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই ঐ উদ্যোগগুলোর প্রতি সুশীল সমাজ, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংগঠনসহ সাধারণ নাগরিকদের সচরাচর মানসিক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সরকারকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অবশ্যই একটা জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে সাফল্য লাভ করতে হলে সরকারকে সামাজিক মূলধন বা সামাজিক সম্পদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় (accumulated savings) বাড়ানোর একটি কৌশল অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট পুটন্যাম বলেছেন, “সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সাধারণত অনেকভাবেই সামাজিক মূলধন বা সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে সহযোগিতার পথ সুগম করে দেয়। এই নেটওয়ার্কগুলো পুনঃপুনঃ সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকেই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সহযোগিতাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের কার্যকর ভূমিকা সম্পাদনকারীদের নানা কর্মতৎপরতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। এসব কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পারস্পরিক প্রয়োজনে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার প্রমিত আদর্শ, বর্ধিত তথ্যপ্রবাহ, আস্থাযোগ্যতা বৃদ্ধি, সামাজিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার উন্নয়নে উৎসাহ এবং প্রেরণা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে একটি অভিন্ন সমঝোতার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে পারস্পরিক সামাজিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়, সে সহযোগিতা সমাজকে স্থিতিশীল রাখে ও সামাজিক মূলধন বাড়ায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাই শক্তিশালী ও সক্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর উপস্থিতি ও কার্যকারিতা অপরিহার্য।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় তৎপরতা, অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎকর্ষগত গুণমানকে বিশেষভাবে উন্নত করে। উন্নত সমাজগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সেটিই সামাজিক মূলধন, যাকে এক কথায় আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

সামাজিক মূলধন ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা

এছাড়া ‘সামাজিক মূলধন’ বলতে সমাজ গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার প্রকৃতি ও পরিসরকেও বোঝানো হয়। সামাজিক মূলধন এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা নিবিড় তার পরিমাপও। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিবিড় সম্পর্ক সমাজ অবকাঠামো ও সমাজ গোষ্ঠীগুলোকে ক্রমান্বয়ে টেকসই ও শক্তিশালী করে তোলে। আর টেকসই সমাজ অবকাঠামো অবলম্বন করে শক্তিশালী সমাজ গোষ্ঠীগুলো দ্রুতগতিতে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক মূলধন বলতে সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি সহযোগিতাসহ অতীতের সব সফল প্রয়াসের মোট রেকর্ড ও যোগফল বোঝায়। ভৌত অবকাঠামোর মতো সমাজ অবকাঠামো ও সামাজিক মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে

সক্ষম। এ সবের যথেষ্ট ইতিবাচক বহির্দেশীয় সম্ভাবনাও আছে। কেননা, সামাজিক মূলধন নিশ্চিত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ উপকরণ।

এমন কিছু কিছু বিষয় ও উপাদান আছে যেগুলো পরিমেয় নয় অথচ এসব উপাদান ও বিষয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন। এভাবে বলা যায়, সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতায় সৃষ্ট সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় সমাজের ধারাবিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসে সহায়ক, আর তাই সেই সঞ্চয়ই সামাজিক মূলধন। রবার্ট পুটন্যাম আরও বলেছেন, "জনসমাজের সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ সংঘজীবন দেশে শাসনকে সহজ করে ও তার ফলে অধিক কার্যকর গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়"।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। মানুষ নিজ মৌলিক তাড়না ও সহজাত প্রবৃত্তিবশে কিছু নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। আর সেই মূল্যবোধের কারণেই তারা সমাজবদ্ধ হয়। সততা, অঙ্গীকার বা চুক্তিরক্ষা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের মতো সামাজিক সৎগুণগুলো কেবল নৈতিক মূল্যের কারণেই সমাজে প্রয়োজন বললে ভুল হবে; আসলে এগুলোর বোধগম্য বস্তুমূল্যও আছে। ভৌত সম্পদ; যেমন জমি ও মেশিনপত্র, মানব সম্পদ; যেমন দক্ষতা ও জ্ঞান এবং সামাজিক সম্পদ; যেমন বিশ্বস্ততা, সামাজিকতা, সংঘ জীবন ও পারস্পরিক সহযোগিতা উৎপাদন বাড়ায় ও জাতির জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে। আর সে কারণেই জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। সামাজিক মূলধনের বিপরীতমুখী প্রবৃদ্ধি মানে আর্থিক বিনিয়োগে ঘাটতি ও নিম্নমুখী উৎপাদন। বাংলাদেশে বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে, এটি আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। সামাজিক মূলধন তাই যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক প্রয়াসের পূর্বশর্ত।

সামাজিক মূলধনের উপকারিতা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরেও সম্প্রসারিত। একটি সুস্থ, সুশীল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মূলধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টেকসই সামাজিক মূলধন সমাজ উন্নয়নে সমাজ গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। কেননা, সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবল প্রাণশক্তি দেশের সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের প্রাণবন্ত অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, যেহেতু এগুলো আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল উপাদান, সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশবেষ্টিত একটি বিচিত্র সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের স্বার্থ রক্ষায় একজোট হতে সহায়তা করে। সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের ধারক ও বাহকের কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ গোষ্ঠীগুলো যথাযথভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল শক্তি জনসমাজ ও তাদের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে। সেহেতু আর্থসামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী সুশীল সমাজ অপরিহার্য, আর সামাজিক মূলধন শক্তিশালী সুশীল সমাজ গঠনের অন্যতম উপকরণ। সামাজিক মূলধন ছাড়া যেমন আর্থিক বিনিয়োগ হবে না, তেমনি সুশীল সমাজ হতে পারে না, সুশীল সমাজ ছাড়া গণতন্ত্রও সফল হতে পারে না।

সামাজিক মূলধনের পরিমাপ করা সহজ নয়। এফবিসিসিআই বা অর্থনীতি সমিতির কার্যকর ভূমিকার মূল্যায়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোর অবদান কিভাবে পরিমাপ করা হবে? তবে, সামাজিক মূলধনের ইতিবাচক মূল্য পরিমাপের তুলনায় তার নেতিবাচক মূল্য পরিমাপের বিষয়টি বরং সহজ। মূল্যায়ন আরও সহজতর হতে পারে যখন সামাজিক মূলধনের অনুপস্থিতির কারণে সামাজিক কার্যক্রমে অস্বাভাবিকতা বা অকার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। সামাজিক অবিশ্বাস, অপরাধের হার, হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা, চুরি, পারিবারিক বিপর্যয়, কিশোর অপরাধপ্রবণতা, পরিবারে একে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ, মাদকের অপব্যবহার, খুন, গুম, বিচারহীনতা, এ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, ঝগড়াবিবাদের ফলে সমাজে

মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা, মিথ্যা মামলা, হয়রানিমূলক মামলা, আত্মহত্যা, দুর্নীতি, করফাঁকি, ট্রাফিকবিধি লঙ্ঘন, বিচারে বিলম্ব, আইন অমান্য করার প্রবণতা, নিজ হাতে আইন তুলে নেয়া, পুলিশের নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা, মন্দ শাসন ও সাংবিধানিক সঙ্কট এগুলো একক ও সামষ্টিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

এগুলো যতোই বাড়বে ততোই সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে থাকবে, সাথে সাথে সামাজিক মূলধনের ঘাটতি দেখা দেবে। সামাজিক মূলধনের অনুপস্থিতি সুনিশ্চিতভাবেই সমাজ কাঠামোকে অস্বাভাবিক ও অকার্যকর করে তোলে। অন্যদিকে, সামাজিক মূলধনের পর্যাপ্ততায় সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসে ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কার্যক্রম, বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাধপ্রবণতা, ইত্যাদির মূল্যায়ন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সমাজে একটা অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে। আর যখন এ রকম পরিস্থিতি দীর্ঘদিন বিরাজ করে তখন অর্থনৈতিক উদ্যোগ-উদ্যম ব্যর্থ হয়। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আরও অনিবার্য অবনতি ঘটে এবং সমাজ ধীরে ধীরে শাসনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এসবের উৎস দেশের রাজনীতিতে নিহিত। উপরোক্ত বিষয়গুলো সচরাচর সামাজিক নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। সে কারণেই সুশীল সমাজ, সমাজ প্রতিষ্ঠান, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট "সামাজিক মূলধনের" প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই, বরং সামাজিক মূলধন হলো আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত।

অর্থনীতি ও নৈতিকতা: মুনাফা

মানুষকে যেমন বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাস নিতে হয়, তেমন ব্যবসায়ীদেরকেও টিকে থাকার জন্য মুনাফা অর্জন করতে হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানিগুলোর কাজকর্ম নৈতিকও নয়, অনৈতিকও নয়। তবে, যারা এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালনা করেন তাদের নৈতিকতা-অনৈতিকতার প্রশ্ন অবশ্যই আছে। এছাড়া মুনাফা এক দিকে যেমন সমাজের দক্ষতার এক অপরিহার্য মৌলিক উপাদান - যে দক্ষতা অপচয় পরিহারের দক্ষতা, অন্যদিকে আবার দক্ষতা হচ্ছে উপযুক্ত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উৎপাদনযোগ্য পণ্য ও সেবাপণ্যের সঠিক পরিমাণ উৎপাদন নির্ধারণের দক্ষতা। নৈতিকতা সম্পর্কে বেশিরভাগ পাশ্চাত্য ধারণায় মুনাফা ভালো জিনিস। কিন্তু মুনাফার লিপ্সা ভালো নয়।

পৃথিবীর তিন প্রধান ধর্মে সুদে অর্থ ধার দেয়াকে দুটি কারণে নিরুৎসাহিত করা হয়। দুটি কারণের একটি হলো; "কোনো কাজ না করে তথা কোনো উৎপাদন না করেই টাকাকে আরও বেশি টাকায় পরিণত করার কাজ অনৈতিক"; দ্বিতীয়, এ কাজটি হলো একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার সহযোগী আরেকজনের কাছ থেকে ঘৃণ্য ও লজ্জাস্কর মুনাফা করা। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম এ তিনটি ধর্মই সুদ সম্পর্কে একই ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। তবে যেহেতু অর্থের লেনদেনমূলক ধারকর্জ ছাড়া বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভালো কাজ করতে অক্ষম, খ্রিষ্টান দেশগুলো সেহেতু সুদের বদলে আরেকটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা হিসেবে চালু করেছে। এর নাম তারা দিয়েছে '*ইন্টারেস্ট*' । আর মুসলমানরা একই ধরনের ব্যবস্থা দিয়েছে যাকে বলে *মুরাদাবাচ*। তারা এটাকে কর্জদাতা ও কর্জগ্রহণকারীর মধ্যেকার বিষয় হিসেবে ধরে থাকে।

মুনাফা-নিয়ামক বনাম নৈতিকতা

চিরায়ত উদারনৈতিক সমাজের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি-তর্ক দাঁড় করানো হয়, সে সবের অন্যতম হচ্ছে- ঐ সমাজের অর্থনীতি মুনাফা পরিচালিত। মুনাফা মানেই লিপ্সা, তাই মুনাফা অনৈতিক। মুনাফার সঙ্গে

লোভের সম্পর্ক চিরাচরিত। তাই ব্যবসায়ীরা দেশের জনগণের সামষ্টিক স্বার্থকে বড় করে দেখে না। তারা শুধু তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকেই বড় করে দেখে, যেমন তারা সমাজের কল্যাণসাধন বা পরিবেশের মত বিষয়গুলোকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। পক্ষান্তরে, অবাধ উদ্যোগভিত্তিক সমাজে (Free enterprise Society) মুনাফাই হলো ঐ সমাজের চালিকা শক্তি। এই সমাজে বাজার মানের নিরিখে যদি কেউ কোন একটা ব্যবসাতে খুবই বেশি মুনাফা করতে থাকে তাহলে অন্য আর একজন একই ধরণের পাল্টা ব্যবসা গড়ে তোলে - যাকে বলা যায় 'চিরায়ত উদারনৈতিক মূলনীতিভিত্তিক তৎপরতা'। এভাবে ব্যবসায়ে নতুন যে প্রতিযোগী এলেন তিনি একই পণ্য কম দামে বা আরও উন্নতমানের পণ্য একই দামে বাজারে ছাড়বেন অথবা পণ্যের মান ও দামের একটা সমন্বয় করে তা বাজারে তুলবেন যার ফলে মূল পণ্য উৎপাদক যিনি বর্তমানে বেশী মুনাফা করছেন তার পণ্যের দাম কমাতে বাধ্য হবেন। এতে মুনাফাও কমে যাবে। এভাবে প্রয়োজনীয় কাটছাঁটের পর যে মুনাফা দাঁড়াবে তা হবে বিনিয়োজিত মূলধন থেকে বাজারভিত্তিক আয়।

একইভাবে শ্রমের জন্য যে মজুরি দেয়া হয় সেটি হবে শ্রম বাবদ বাজারভিত্তিক আয়। মুনাফার জন্য সন্ধানী তৎপরতার কারণেই উৎপাদনমূলক সম্পদ, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ঐ সব খাতে প্রবাহিত হয় যে সব খাতে পণ্য বা পরিসেবার চাহিদা বেশী অথচ সরবরাহ কম। আবার যদি কোন খাতে চাহিদার থেকে সরবরাহ বেড়ে যায়, তাহলে এসব সম্পদ যেখাতে চাহিদা বেশী সে খাতের দিকে প্রবাহিত হবে। কেননা চাহিদা বেশী, সরবরাহ কম - মানেই হলো মুনাফা বেশী। এভাবে মুনাফা এক নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে সঠিক পণ্য ও পরিসেবা, সঠিক পরিমাণ ও সঠিক মূল্যে উৎপাদিত হয় ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে এ সব পণ্যের চাহিদা মেটানো হয়।

যারা নীতিগতভাবে মুনাফার বিরোধী তারা মুনাফার প্রেরণা বা অভিপ্রায়কে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরেন। বহু উদ্যোক্তা যেমন মুনাফা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তেমনি পেশাদারি সন্তুষ্টির কারণেও প্রেরণা বোধ করেন। যদিও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুনাফার অনস্বীকার্য আবশ্যকতা। অবশ্য, এর বিরোধীরা সাধারণত অহেতুক জোর করে দাবি করেন যে মুনাফা লোভ, অবিবেচনা, পরিবেশ ধ্বংস ও অন্যান্য অপ্রীতিকর সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অন্যদিকে, ক্ল্যাসিক্যাল উদারনৈতিকতাবাদীরা যে অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সেটি হলো "মুনাফা মাত্র নিয়ামকের" কাজ করে। তাই মুনাফা নিয়ামক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করে; কোন বাজারে কোন পণ্য উৎপাদিত হবে, কে হবে ভোক্তা, কত হবে পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত আয় এবং কে কতটুকু পাবে। এ সব কার্যকলাপের যে কোনোটি যেমন লোভ, লোলুপ ও অবিবেচনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তেমনি আবার এসব তৎপরতার সাথে মহানুভবতা, দয়াদাক্ষিণ্য, ও পেশাদারি সন্তুষ্টিও সম্পর্কিত। সমাজতন্ত্র বহুকাল ধরে 'আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা' হিসেবে বিবেচিত ও প্রশংসিত হয়ে এসেছে। এ ব্যবস্থার জোরগলায় প্রশংসা করে তারাই যারা মুনাফার বিরোধী। কিন্তু, সেই কথিত সমাজতন্ত্রীদেরকেই পরবর্তীকালে দেখা গেছে তাঁরা চরম লোভ, অসহিষ্ণুতা, হিংসাত্মক রাজনীতি ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন।

আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও নৈতিকতা

অর্থনীতির বিশ্বায়নের আওতায় সবাই প্রত্যাশা করে যে ব্যবসায়ীদের মাঝে নূতন করে একটি নৈতিকতাবোধ গড়ে উঠবে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তাই চায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এই নৈতিকতার পরিমাপ ও পরিধি কি হবে তা আজও পরিমাণ করা সম্ভব হয়নি। স্থান-কাল পরিক্রমায়

অন্যান্য পরিবর্তনের (রাজনৈতিক ও সামাজিক) সাথে অর্থনৈতিক নৈতিকতাও বদলায়। যেমন আজকের সমাজে দাসত্ব, দস্যুতা, হত্যা-খুন, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদেরকে বেত্রাঘাত ও নির্যাতন অনৈতিক বিবেচিত হচ্ছে, অথচ একসময় সেগুলো নৈতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ছিল। এমনকি কিছুকাল আগে পর্যন্ত খুন ও হত্যা শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ ব্যক্তির অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতো। কিন্তু, এখন খুনকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কিছুদিন আগেও আজকের উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না, কিন্তু এখন নারী-পুরুষের এ বৈষম্য নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো পরিমাণের সামাজিক নৈতিকতাই মানুষের আয়ে সমতা আনবে না, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কিংবা দারিদ্র্য কমাবে না। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও দারিদ্র্য হ্রাসের মূল চাবিকাঠি মূলত ন্যায়ভিত্তিক সমাজে অধিক উৎপাদনের মাঝে নিহিত। অর্থনৈতিক তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে; উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা অর্থনীতির সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। অস্তিত্বশীল, প্রাপ্য ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সর্বাধিক পণ্য ও সেবাপণ্য উৎপাদন সম্ভব। দক্ষ, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে সম্পদ ও প্রযুক্তি যা-ই থাকুক, সেই সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই সমাজে দরিদ্র থাকলেও এত বৈষম্য থাকার কথা নয়।

ক্ষমতার কেন্দ্রায়নঃ সম্পদ ও আয় বিলি-বণ্টনের নৈতিকতা

অনেকেই সহজে ধারণা করেন, দারিদ্র্যের কারণ গরিবদের নিম্নমানের বুদ্ধিমত্তা। বাংলাদেশে বহু গরীব লোকেরই বুদ্ধিমত্তা (I.Q.) আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। তারা উদ্যোগ গ্রহণেরও সামর্থ্য রাখেন। এছাড়াও অর্থনীতির ইতিহাস থেকে দেখা যায়, একটি উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায়, আয় ও সম্পদের সমবণ্টন না হলেও ক্ষমতার ভারসাম্য সমাজকে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যায়।

আধুনিক পরিমাপমূলক সমীক্ষা ও জরিপের কল্যাণে আমরা সুনিশ্চিত জানি, অধিকতর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় স্বল্প-উন্নত ও কম গণতান্ত্রিক সমাজে সম্পদ ও আয়ের বিলিবণ্টনে বৈষম্য অনেক বেশী। গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে আয়ের বিলিবণ্টনে সমতা আসে। এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার হোক বা মধ্যযুগের ইউরোপের মতো আগেকার দিনের কোনো কম উন্নত দেশ হোক– এই সব দেশের কতগুলো বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ শাসক দলের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন। অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার সাথে সাথে অতিরিক্ত সম্পদও তাদের হাতে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এতে জনসাধারণ ও অর্থনীতিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামর্থ্যে কাজ করতে দেয়া হয় না। কেন্দ্রিভূত ক্ষমতা সমাজে সম্পদ সৃষ্টি ও আয়ের সুষম বিলি বণ্টনের পথে পর্বতসমান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে পণ্য ও সেবা পণ্যের সর্বোত্তম উৎপাদন হতে পারে না। বাজার শক্তিগুলো তার আপন নিয়মে চলার জন্য যে সব বিধিবিধান দরকার সেগুলো গড়ে ওঠে না বা অতিরিক্ত বিধিবিধানের কারণে আটকে পড়ে বাজার তৎপরতার গতিরোধ ঘটে, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার বিলিবণ্টন হয় না, সেই সুযোগে অপ্রতিহত গতিতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বিস্তারলাভ করে। ক্ষমতা এক হাতে বা মুষ্ঠিমেয় গুটিকয় হাতে পুঞ্জিভূত হলে দুর্নীতি তার স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতাবানদেরকেই লাভবান করে। কেননা, তাদের অবস্থান সুবিধাভোগীর অবস্থান।

দুর্নীতি, রাজনীতি ও নৈতিকতা

ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন বা বিলি বণ্টনের প্রক্রিয়ায় যদি কোন প্রতিযোগী শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল বা পরিবার গড়ে ওঠে সে অবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী - উভয় পক্ষই একে অন্যের দুর্নীতি কমানোর প্রয়াসে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এটা হলো তত্ত্ব। তবে বাংলাদেশে নিজ পক্ষের দুর্নীতিকে দমন করার পরিবর্তে নব উদ্যমে দুর্নীতিবাজদের সহায়তা করে। এভাবে দুর্নীতি দমন আইনগুলো, অপর্যাপ্ত মাত্রায় হলেও, ক্ষমতাসীনরা বেছে বেছে শুধুমাত্র তাঁদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ ও দমন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে। যদিও ক্ষমতাসীনদের অপরাধ বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশী। আর বিরোধীপক্ষ শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের বিরোধীতা করে নিজেদের দুর্নীতির দায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য। বাংলাদেশের মতো কার্যত দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ ধরনের হাতিয়ার কাজে লাগানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশী। কেননা, উভয় পক্ষই কার্যত একই ধরনের কর্মসূচির প্ল্যাটফর্মে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। উভয় দলেই রয়েছে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক অপরাধীদের চক্র, আর এ অপরাধী চক্রের বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যায় অবধি বিস্তৃত। দুর্নীতির মূল উৎপাটনের সত্যিকারের কোনো অভিপ্রায় কোন সময়ই, কোনো পক্ষ থেকে জোরালোভাবে দেখা যায়নি।

বিশ্বসমাজ দুর্নীতিকে একটা দুষ্টক্ষত হিসেবে শনাক্ত করেছে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে দুর্নীতি যেমন ক্ষতিকর তেমনি সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে দুর্নীতি এককভাবে সবচেয়ে বিপদজ্জনক বাধা। বিশ্বাসভঙ্গ, সরকারি পর্যায়ে প্রতারণা, ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের স্বজনপ্রীতি, সত্য ঘটনা গোপন, অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য যোগসাজস, বিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতার একতরফা অনুশীলন, পরিকল্পিতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, এসবই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি সম্পদের অবৈধ সঞ্চয় বাড়ায়, সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রসার ঘটায়, আইনের বিকৃতি ঘটায়। সমাজে প্রতিযোগিতার প্রবণতা ক্ষুণ্ন করে, সম্পদের অসম বণ্টন ঘটায়, কলোবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটায়, কুশাসন প্রতিষ্ঠা করে, সম্পদ পাচার বৃদ্ধি করে, প্রবৃদ্ধি ও সংস্কারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। অবৈধ টাকার মালিকরা হয়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃপক্ষের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাধর। যে কোনো সমাজে দুর্নীতির উৎস হলো অনৈতিক রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষয়।

নৈতিকতার পূর্বশর্ত: রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান

পরিতাপের বিষয় হলেও কথাটা সত্যি, "আরেকটি শক্তি না থামিয়ে দেয়া পর্যন্ত শক্তি বা ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও অপব্যবহার চলতেই থাকে।" সামন্তপ্রভু, অপরাধী, গডফাদার, একনায়ক, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার বা স্থানীয় সরকার যে বা যারা ক্ষমতাধর নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। তাই সমাজের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য এবং ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমাতে হলে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইন বিশারদ, সমাজ কর্মী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তথা সুশীল সমাজের সবাইকে অবশ্যই চিরায়ত উদারনৈতিকতার দর্শনকে সামনে রেখে এক সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কেন্দ্রিভূত ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে দিয়ে সামাজিক উত্তেজনা প্রশমিত করে আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধির সব বাধাবিপত্তি দুর করতে হবে। নইলে উদ্যোক্তা, সম্পদ, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। দেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি হবে না। সম্পদ ও আয় কোনটাই বাড়বে না। তবে ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য দিন দিন বেড়ে যাবে।

মানবীয় জীবন-জীবিকার ক্রম-উত্তরণ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সূচনা: প্রাচীনকাল

কবে, কখন, কিভাবে বিভিন্ন জনসমাজ ও দেশে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য শুরু হয়েছে কিংবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আয়ের বিলি-বণ্টনে অসমতা শুরু হয় তা সম্ভবত কেউ সঠিক বলতে পারবে না। প্রাচীন মিসরীয় ও ভূমধ্য উপসাগরীয় রোমান জনসমাজের আয় ও বিত্ত, আফ্রিকীয় ও এশীয় (পারস্য ব্যতীত) জনসমাজগুলোর চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা সবদিক থেকেই প্রবল। স্থায়ী নিবাসী কৃষি সমাজ প্রতিষ্ঠা (Settled agriculture) ও রোমান সাম্রাজ্যের উন্নতি যখন তার শিখর স্পর্শ করেছে - এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আনুমানিক ছয় থেকে আট হাজার বছর। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এই কাল পরিসরের মিল নেই বলে আমরা শুধু এটুকু অনুমান করতে পারি, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় যুদ্ধবিগ্রহ, বিশ্বাসঘাতকতা, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অগণিত রাজ্য, সাম্রাজ্য, নানান সভ্যতার আবির্ভাব, বিকাশ ও বিলুপ্তি ঘটার নানা দৃশ্যের অশেষ মিছিল এখনো চলেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে কোনো সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এ কাঠামোতে ভর করে গড়ে উঠেছে অনেক বিশাল সাম্রাজ্য। এসব সাম্রাজ্যের কোনো কোনোটি অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে শত শত বছর। তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাফল্য তাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে নিরূপিত ও নির্ধারিত হয়েছে। উল্লিখিত ছয় থেকে আট হাজার বছরের কাল পরিসরে জনসংখ্যা নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে মানববসতির স্থানিক ব্যাপ্তি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই আমলেই। এই কাল পরিক্রমায় শিকার-সংগ্রহের (hunting gathering) মানবীয় জীবিকার ক্রম উত্তরণ ঘটে কৃষিকর্মের পরিকল্পিত উৎপাদন তৎপরতায়। আর পরিশেষে, কৃষিই হয়ে ওঠে স্থায়ী নিবাসী চরিত্রের প্রধান অর্থনৈতিক তৎপরতা।

ঐ একই সময়ে, প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক রাষ্ট্র সংগঠনের প্রথম আবির্ভাবও ঘটে। রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের সাথে যুগপৎ আগমন ঘটে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার। এ সময় প্রযুক্তির তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে। উল্লিখিত আট হাজার বছরের মেয়াদে লৌহ যুগের অবসান শেষে শুরু হয় ব্রোঞ্জযুগ। এ সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে। এর অল্পকালের মধ্যেই বাজার গড়ে ওঠে। প্রথমবারের মতো পৌর এলাকার পত্তন হয়। নগরগুলোর আকার-আয়তন ও নগর প্রশাসনের জটিলতা বেড়ে যায়। সেই সাথে নানা ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। এক প্রান্তে সুমের ও মিসর পুনঃবণ্টনমূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে ও অন্য প্রান্তে মূল্য-নির্ধারক বাজার সম্প্রসারণের প্রতিনিধিত্ব করে হেলেনীয় গ্রীস ও রোম। ঐ সময়ে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নানা ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন। একই সময়ে ব্যক্তি পর্যায়ে “সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার” প্রতিষ্ঠিত হয়। দাসত্বের আকারে এ সব অধিকার বিকশিত হয় পণ্য, ভূমি ও শ্রমকে নিয়ে। এই আমলেই তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। যার বুনিয়াদে এক দিকে বাড়তি জনসমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয় ও অন্যদিকে, মানুষের জীবনযাত্রার সাধারণ মান উন্নত হয়।

সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে অসমতা: প্রাচীনকাল

তবে এই একই সময়ে মানুষের আয়ের বণ্টনও বিষম হয় ওঠে। জীবন যাত্রার মান উন্নতির সাথে সাথে সমাজের নানা ধরনের পেশাজীবীর আয়ে আরও বেশি ও ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হয়। মানবেতিহাসের অত্যন্ত গোড়ার দিকে এ সব ঘটনা ঘটে। এ ছাড়াও স্থায়ী নিবাসী কৃষিকর্মের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। জমিতে কি ফসলের আবাদ করা উচিত, কোথায় তা আবাদ করা উচিত, কখন তা করা উচিত, ফসল কাটতে বা তুলতে হবে কখন, কেমন করে কে বা কারা কিংবা কোন আর্থসমাজিক সংগঠন ফসল বোনা ও কাটার মধ্যবর্তী মেয়াদে সম্পর্কিত কাজগুলো ভাগ করে দেবে - এ সব বিষয় অনেক বেশি জটিল হয়ে ওঠে। কারা কাজগুলো করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া যে কোনো স্থায়ী নিবাসী জনসমাজে দুর্ভিক্ষ বা খরার মতো সম্ভাব্য দুর্দিনের জন্য পণ্য/ফসল ইত্যাদি মজুত করে রাখাও প্রয়োজন ছিল বলেই তখনকার কৃষি জনসমাজে নতুন নতুন পেশা বা কর্মবৃত্তির সৃষ্টি হতে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জিত হয়। কুমার, কামার, তাঁতী, রাজমিস্ত্রি, ছুতার, জাহাজ নির্মাতাদের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। শ্রমের এ বিশেষায়নের ফলে শিকার ও সংগ্রহ-নির্ভর যাযাবর এবং তুলনামূলকভাবে কম অসমঞ্জস বা সমজাতীয় সমাজে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বিশেষায়ন দ্রত গতিলাভ করার ও এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বৈষম্যও বাড়তে থাকে। কৃষিতে কারিগরি উন্নতি ও বৃহদায়ন শিল্প বিকাশের ফলে মধ্যযুগেই সম্ভবত আয়ের এই পার্থক্য অনেক বেশি বেড়ে যায়।

তবে আয়ের ব্যবধান সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হযে ওঠে আঠারো ও উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর। ১৪২৭ সালে, ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীর শতকরা ১০ জন অধিবাসী মোট সম্পদ ও বিত্তের শতকরা ৬৮ ভাগের মালিক ছিল। অন্যদিকে, ঐ নগরীর শতকরা ৬০জন অধিবাসী কেবলমাত্র শতকরা ৫ ভাগ সম্পদের মালিক ছিল। ষোলো শতকের তুরস্কে সামরিক বাহিনীর সদস্যবর্গ ও শাসকমহলের লোকজন তুর্কী জনসমাজের সবচেয়ে বেশি সম্পদ ও বিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮ শতকের সুবে বাংলা তথা বঙ্গদেশ সবচেয়ে সম্পদশালী মুঘল প্রদেশ যার কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আয়ের পার্থক্য ছিল বিরাট। পাশ্চাত্যের ধনী ও গরিব জনসমাজের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে এই বিপুল ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশের জনসমাজেরও বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। অবশ্য ১৮৫০-এর পর আয়ের এই সুবিশাল বৈষম্য উন্নত দেশগুলোতে কমে আসতে শুরু করলেও, কম উন্নত দেশগুলোতে বাড়তে থাকে। এর রেশ চলে এক শতকেরও বেশি কাল ধরে। ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে উন্নত দেশগুলোর জনসমাজের ভেতরে আয়ের ব্যবধান কমলেও, কম উন্নত দেশগুলোতে তা বাড়তে থাকে। এসব সমাজে কিছু কিছু লোক ভাগ্যবলে ও সুযোগ পেয়ে হঠাৎ ধনী হলেও তা ছিল নেহাৎই নিয়মের ব্যতিক্রম। ইদানিংকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পদ বাড়ছে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তার চেয়েও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

মজুরি ও মুনাফার বিলি-বণ্টনে অসমতা: সাম্প্রতিককাল

অবশ্য সাম্প্রতিককালে নুতন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ পরিস্থিতির আরও একবার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতি ক্রমেই বিশ্বায়িত হয়ে ওঠার আলোকে 'তুলনামূলক সুবিধা' এখন "প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার" কাছে হার মানছে। এ নিয়মের আওতায় কোন বিনিয়োগকারী যদি বিশেষ কোনো শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনে সমর্থ না হয়, তাহলে তাকে সে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র ভাগ্য

পরীক্ষায় যেতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনার কারণে নতুন নতুন পণ্য বাজারে আসে। ঐ সব দ্রব্য প্রায়ই দামে হয় কম, আর সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হয় বেশী। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শ্রমিকের উপান্তিক উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক-কর্মী স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদিত পণ্যের বর্ধিত মুনাফার ভাগ চায়।

অর্থনীতির চাহিদা-সরবরাহ সূত্র অনুযায়ী যদি পুঁজির তুলনায় শ্রমিকের সরবরাহ কম হয় তাহলে তেমন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বেশি হারে মজুরি দাবি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা গত দু দশকে ক্রমাগত বাড়লেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মজুরি সেই হারে আগের শতকের মতো বাড়েনি। অথচ মুনাফা আরও বেড়ে গেছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মজুরি ও মুনাফার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অদক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস। ঠিক এ কারণটিই বাংলাদেশে এখন ক্রিয়াশীল। তাই সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়ের যে বৈষম্য বিরাজমান তার কারণ এটাই হতে পারে। অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাপারে হয়তোবা পর্য্যালোচনা করে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসমাজে একটা অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটেছে। আর এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সমভিত্তিক উদার বাজার ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অত্যন্ত ধনী জনসমাজেও দেশের সম্পদ-বিত্তকে ন্যায্যভাবে বিলি-বণ্টন নিশ্চিত করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবুও এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়তো সম্পদের সমভিত্তিক বণ্টন করতে পারে না বা সব সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্প্রসারণ না করলে প্রবৃদ্ধির অনুপস্থিতিতে সমস্যা মোকাবেলা আরও বেশি কঠিন ও অপরিসীম হয়ে উঠে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহারে নিকট ভবিষ্যতে আয়, দারিদ্র্য ও বিত্তের ক্ষেত্রে অসমতার রূপ বিভিন্ন হবে। কম উন্নত দেশগুলোর জন্য কঠিন সমস্যা হবে কম উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যাবলী কাটিয়ে ওঠা। বলা বাহুল্য, এসব দেশে ক্ষমতা গুটিকয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, যা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির আদৌ অনুকূল নয়। তাই যতই কঠিন হোকনা কেন প্রথম কাজটি হলো, কেন্দ্রায়িত ও পুঞ্জিভূত ক্ষমতা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মাঝে বিলিবণ্টন করে ঐ ক্ষমতার ব্যবহারে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অনৈতিকতা

কুলিন ও অভিজাত মহলের হাতে যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তারা সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ত্ব করার কারণে অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণি ও নতুন উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে তারা তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতানুযায়ী আয়-উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শাসক ও কর্তাব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার লাগামে ঢিল দিতে আগ্রহী নন। কেননা সে রকম ক্ষেত্রে তাদের আশঙ্কা, তারা তাদের ক্ষমতার যথেষ্ট ব্যবহার ও অপব্যবহারের মাধ্যমে সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের আনন্দ উপভোগ হতে বঞ্চিত হবেন। অবশ্য দেশের সুশীল জনসমাজ যদি প্রাণবন্ত, সজীব, উন্মুক্ত মনের হয়, তাহলে তা সেই সমাজে শাসকদের হাতে থাকা অতিরিক্ত ক্ষমতার বিলিবণ্টন তথা বিকেন্দ্রায়নের প্রক্রিয়াটি সক্রিয় করে তুলতে সহায়তা করতে পারে। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি, সামর্থ্য ও সাফল্য এবং খোলা বাজারের অমিত শক্তি কাজে লাগিয়ে এটি সম্ভব। অন্যথায়, একদিকে সম্পদ বিলিবন্টনে বৈষম্য দিন দিন বাড়বে,

অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও সহিংসতা বাড়বে। অস্থির সমাজে জনগণ কারণে-অকারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হবে। উচ্ছৃঙ্খল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বিশৃংখল সমাজ ধীরে ধীরে শাসনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। সহিংস এবং অস্থির সমাজে বিত্ত ও সম্পদ কমে যায়। শুন্য কোষাগার থেকে বিলি-বন্টনেরও কোন সুযোগ থাকে না। এতে সমাজে সম্পদের বৈষম্য আরো বেড়ে যায়।

এটি শুধু দেশের অভ্যন্তরে ধনী-গরীবের বেলায় নয়, বরং উন্নত ও কম উন্নত দেশের বেলায়ও প্রযোজ্য। দেশের সম্পদের বৈষম্যের ব্যবধান বাড়তে থাকলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সম্পদকে পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়ের অসমতা ও দারিদ্র্য কমাতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি নুতন নৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নতুন দর্শন অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে আশা করা অবাস্তব নয়, যদিও সবার কাছেই এ বিষয়গুলো রাজনৈতিক ইস্যু বলে মনে হবে।

বাস্তবিকপক্ষে, কাজগুলো রাজনৈতিক। তাই এসব বিষয়ে নির্দেশনার জন্য জনগণ রাজনীতিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত নানা অভাব, গলদ-ত্রুটি-হিংসাত্মক রাজনীতির কারণে রাজনীতিকরা পরিবর্তনের প্রতি উপযুক্ত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। তাই সুশীল সমাজের অন্যান্য সদস্য ও জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতিবিদদের উচিত প্রথমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখা। সত্যিকার অর্থে, সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অথবা দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান কমাতে হলে প্রথমে কাজ হবে রাজনৈতিক সংস্কারে হাত দেয়া।

নৈতিকতার দিক ও মাত্রা

নৈতিকতার নানা দিক ও মাত্রা আছে। ব্যক্তিগত সততা, ন্যায্য আচরণ, চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ, যথাসময় দেনা পরিশোধ, অতিরিক্ত মুনাফা করার লোভ থেকে বিরত থাকা, যথাযথ পরিমাপ প্রদান, গ্রাহকের সাথে সত্য কথা বলা - এ সবই যেমন মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার সাথে জড়িত, তেমনি অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। অর্থনীতির বাইরেও অনেক বিষয় আছে যেমন নীতিবোধ, পরিণামদর্শিতা, নীতিনিষ্ঠা, আদর্শ, গুণাবলি ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও আছে ধর্মীয় নৈতিকতা। সব ধরণের নৈতিকতাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, অথনৈতিক মন্দা বা স্থবিরতা যা-ই হোক না কেন, এসব বিষয় সর্বদাই সমাজে সাধারণ মানুষের নৈতিকতার দিকমাত্রা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। নৈতিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা মানুষ নানা ধারণা পোষণ করেন বলেই জনসমাজে নৈতিকতা নানাভাবে গঠিত। বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপাদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সবার জন্য অবারিত সুযোগ, সহনশীলতা, সামাজিক সচলতা ও গতিশীলতা, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র। এছাড়াও বহু বিষয় ও অভিমত আছে যেগুলো নৈতিকতার বর্ণনায় যোগ করা যায়। যেমন কর্মসংস্থান ও আয়, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক নিরাপত্তা, বাজেট ঘাটতি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, চাহিদা ও যোগান, বাজারে পণ্যের মূল্য ইত্যাদি সব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির চর্চার সাথে জড়িত। অতএব অর্থনীতি কেবল সংখ্যা, সম্পদের বিলি-বরাদ্ধ বা বাজার ব্যবস্থার বিষয় নয়, বরং এর সাথে রাজনীতি, ইতিহাস, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, করারোপ, মুদ্রার বিনিময় হার এবং জীবনের

প্রায় সব ক্রিয়াকাণ্ড জড়িত। আধুনিক অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠান, বিধিবিধান এবং কখন কোন পরিস্থিতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ বা মধ্যবর্তীতার প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন নেই এসব বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাজারব্যবস্থা বনাম সরকারের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনার সময় অনেকে আদর্শিক যুক্তিতর্কের সীমা ছাড়িয়ে যান। যদিও অর্থনীতির আলোচনায় রাজনৈতিক পক্ষ নেয়ার কোনো বিষয় নেই। কে কোন রাজনীতির সাথে জড়িত, কে কোন দলের সাথে জড়িত, অর্থনীতিতে সেটা কোনো প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। অর্থনীতি যেমন; কোনো ব্যবসা বা শ্রমিক সংগঠনকে সমর্থনের বিষয় নয়, তেমনি রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের কোনো বিষয় নয়। একজন ব্যক্তি-মানুষের জন্য অর্থনীতি হলো, "নিজ স্বার্থ উদ্ধার" বা নিজের জন্য মুনাফা করা। তিনি হতে পারেন - ব্যবসায়ী, পণ্য উৎপাদক, পণ্য বিপণনকারী, বা হতে পারেন আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, এমনকি রাজনীতিক। সমাজ গড়ার জন্য নিজস্বস্বার্থ উদ্ধার ও স্বীয়-অধিকার প্রতিষ্ঠা একটা কার্যকর উপায় বলে ধারণা করা যায়। কেননা, বাজারের দৈনন্দিন লেনদেন "আত্নস্বার্থ নির্ভর"। অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম স্মিথ যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, "সাধারণত সব ব্যক্তি, বাস্তবিকপক্ষেই কোন ব্যক্তিরই, যেমন জনস্বার্থকে উন্নীত করার কোন অভিপ্রায় থাকে না, তেমনি সে এও জানে না যে তার কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কতটুকু জনস্বার্থ উন্নীত করছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অভিপ্রায় হলো তার নিজ নিরাপত্তা বিধান; নিজের লাভ-মুনাফা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা। ঐ ব্যক্তি অনেক সময় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি বা কোন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছেন সে নিজেই জানে না। মনে হয়, ঐ ব্যক্তির কাজকর্ম অদৃশ্য হাত দ্বারা পরিচালিত। এসব কাজ সমাজের জন্য যে খারাপ তা-ও নয়। বরং দেখা যায়, একজন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করেন, একই সাথে তিনি সমাজের স্বার্থও উন্নীত করছেন, যদিও মোটেই এটি তার অভিপ্রায় ছিল না"।

অতএব, যখন কোনো ব্যক্তি কার্যত নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত, তার ঐ কাজের মাধ্যমে সমাজের অন্যেরাও উপকৃত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে; কোনো উদ্যোক্তা যদি একটা উন্নতমানের পণ্য তৈরি করে সস্তায় বিক্রি করে, তাতে উন্নত পণ্যের উপর অর্জিত মুনাফা যেমন নিজস্বস্বার্থকে সমুন্নত রাখে, তেমনি পণ্যের কম মূল্য সমাজে অনেকের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অতএব, নিজস্বস্বার্থ অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি কতো মুনাফা করলেন সেটা নৈতিক-অনৈতিকতার বা ঐ ব্যক্তি কতোখানি অনৈতিক সেটা বিচার্য বিষয় নয়, বরং বিচার্য বিষয় হলো; কম মূল্যে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতার সহায়তা হলো মূখ্য বিষয়। মোট কথা, ব্যক্তির 'আত্নস্বার্থ' উদ্ধারের কাজটাও অনেক সময় সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ অর্জনে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে তা নির্ভর করে কতটুকু যথার্থভাবে কাজটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে একজন অর্থনীতিবিদ মনে করতে পারেন। অথবা বলা যেতে পারে অর্থনীতির দৈনন্দিন চর্চাকারী। এটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেননা, সবাই বেঁচে থাকার জন্য কাজ করছেন; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছেন; কোনো না কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদনে নিয়োজিত আছেন; কর দিচ্ছেন; নিজের ভরণপোষণের জন্য দৈনন্দিন মুদি দোকান থেকে কেনাকাটা করছেন। এসবই অর্থনীতির উপাদান।

সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

অর্থনীতি কেবল 'বিরল সম্পদ বিলিবন্টনের' চর্চা বললে ভুল হবে। যেমন তেল ও গ্যাস; এ দুটোই বিরল সম্পদ। তবে এটি নিজ থেকে আপনাআপনি কোন সম্পদ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন গ্যাস মানুষের

মালিকানায় থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ হাতিয়ারের ব্যবহারে যেসব বাধাবিপত্তি আছে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেই কেবল তা মানুষের কল্যাণে সত্যিকারের 'সম্পদ' হয়ে উঠতে পারে। গ্যাসের মতো অনিশ্চিত উদ্বায়ী জিনিসকে ঠিক সরাসরি 'সম্পদ' বলা যায় না। বরং, একে কোনো মিশ্র বা সমষ্টি সম্পদের অংশ বলাই সঙ্গত। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট সময় (কাল) ও স্থানে (দেশ) প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ জাতীয় পদার্থ উপকারী 'সম্পদ' হিসেবে কাজে লাগবে কিনা তা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় উপাদান, বস্তু, শক্তি, অবস্থা, শর্ত, সম্পর্ক, স্থাপনা, বিপণন ও নীতি ইত্যাদির এক জটিল সমষ্টি হিসেবে একযোগে ক্রিয়াশীল হলেই প্রাকৃতিক গ্যাস 'সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ কারণে তেল, কয়লা ও গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক কাঁচামালকে সম্পদ না বলে বরং বলা উচিৎ মানব কল্যাণের জন্য এগুলো এক মিশ্র ও সমন্বিত সম্পদের অংশবিশেষ। তাই, এ ধরনের সম্পদকে শুধুমাত্র অনেক উপাদান যেমন, বস্তু, শক্তি, প্রযুক্তি, আবিষ্কার, প্রক্রিয়াকরণ, শোধন, অবস্থা, সম্পর্ক পরম্পরা, প্রতিষ্ঠান, বাজার, নীতি, বিপণন —এগুলোর এক জটিল মিশ্রণ বা দ্রবণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সব মিলে শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ ধরনের কাঁচামাল কিভাবে একটি নির্ধারিত সময় ও স্থানে মানুষের জন্য কল্যাণকর সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব, এ ধরনের সম্পদকে শুধুমাত্র একটি নির্ধারিত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের "উপায়" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বুঝতে হবে যে ব্যক্তি ও সমষ্টি চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উপকরণের নামই সম্পদ। বস্তুত, 'উপায়' তার 'তাৎপর্য ও অর্থ' খুঁজে পায় মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যে। মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য বারবার বদলায়, অভীষ্ট বদলানোর সাথে সাথে 'উপায়'ও বদলায়, আর মূল্যমানের দিক থেকেও এ পরিবর্তন অনিবার্য।

সম্পদ সৃষ্টি ও আয়ের অসমতা

উদ্যোক্তারা নিরন্তর তাঁদের কার্য-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এধরণের বিরল সম্পদকে সুলভ করে তোলেন এবং আজকে মানুষের কাছে যেসব পণ্য বিলাসিতা, ভবিষ্যতে একই পণ্যকে মানুষের জীবন মানোন্নয়নে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে; গাড়ি, সেলফোন, ও কম্পিউটার। শত বছর আগে মাত্র হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া কারও গাড়ি কেনার সাধ্য ছিল না। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। গাড়ি এখন উন্নত বিশ্বের প্রতিটি পরিবার বা সংসারের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় একটি পণ্য। ১৯৯০-এর দশকে সেলফোন আকারে ও ওজনে ছিল বেশ বড় ও ভারী। একটি বাক্সের মতো। আজকে সেলফোন আকারে ছোট, দামে সস্তা। সকলেই এখন সেলফোন ব্যবহার করে। সেলফোন এখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। পণ্যের এই রূপান্তরকরণের প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তারা সাধারণ মানুষের জীবনমাত্রার মান উন্নয়নে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে আমাদের বাস্তব জড়জগতে প্রয়োগ করেন। এ হলো উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার সুফল।

তাই অর্থনীতি কেবল সম্পদ বিলি-বরাদ্দের বিষয় নয়, বরং অকেজো, অনুপযোগী, অনর্থক দ্রব্য বা পদার্থকে রূপান্তরের মাধ্যমে দরকারী, কার্যকর ও উপকারী সম্পদ সৃষ্টি করাও অর্থনীতির বিষয়। এই রূপান্তরকরণের প্রতিটি স্তরে উদ্যোক্তা তার উদ্যোগ ও মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে। সম্পদ সৃষ্টির এই স্তরগুলোতে আয়, মজুরি ও মুনাফার বিলি-বন্টণে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সম্পদ সৃষ্টি ও নৈতিকতা

সম্পদ সৃষ্টির বড়ো উৎস হলো মানুষের মস্তিষ্ক ও মনন ও পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহার এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে একজন উদ্যোক্তা যতো আয় করেন বা লাভ করেন ততো অর্থ তার প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন মেটাতে সৃষ্ট সম্পদের সামান্য অংশই যথেষ্ট। তবে উদ্যোক্তা দিন দিন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাত্রা বাড়ায় এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। পণ্য উৎপাদনের মাত্রা ও মান উন্নত করে মূল্য কমানোর প্রয়াসে তাকে সঞ্চিত মূলধন থেকে পুনর্বিনিয়োগ করে যেতে হয়। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন উদ্যোক্তার সম্পদ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য কম মূল্যে সরবরাহের মধ্য দিয়ে ভোক্তার জীবনমান উন্নীত করে। এমনি করে সমাজে অনেকে উপকৃত হয় ও সেইসাথে উদ্যোক্তার সম্পদও বহুগুণে বেড়ে যায়। নিজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি এবং একই সাথে সমাজে অন্যদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুবিধে সৃষ্টি করা উৎপাদনের গতিময় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া একদিকে মানুষের উদ্যোগ ও উদ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার করে। অন্যদিকে, অধিকতর পরিমাণে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের প্রেরণা জোগায়। যথাযথ সরবরাহ থাকলে, পণ্যের মূল্য সস্তা (বাজারভিত্তিক) থাকবে। এ হলো অর্থনীতির তত্ত্ব। প্রথিতযশা মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর 'দ্য গুড সোসাইটি (১৯৪৩)' গ্রন্থে লিখেছেন; মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ "সম্পদ তৈরির একটি পথ খুঁজে পেয়েছে, যে পথ অবলম্বনে উদ্যোক্তার সৌভাগ্য বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অন্য সব মানুষেরও সৌভাগ্য সুচিত হয়"। এ প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিতে একটা নির্ভরযোগ্য সোনালী নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া উৎপাদন ও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ ও সুষ্ঠু। একইসাথে এ প্রক্রিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে "মানুষ প্রথমবারের মতো এমন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে যে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ও নৈতিকতা আশা করেছিল, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজে একদিকে যেমন সম্পদ বাড়বে, অন্যদিকে অভাব থাকবে না"।

প্রাচীনকাল বনাম সাম্প্রতিককাল

তবে বর্তমানে এই ধারার চিন্তা-ভাবনা বদলে গেছে। এখন অনেকেরই ধারণা, "একজন ব্যক্তি মানুষের মুনাফার নিহিতার্থ হলো আরেকজনের লোকসান"। এ ধারণা পোষণকারীরা সম্পদ সৃষ্টিকে দারিদ্র্য ও অভাব তৈরির উৎস হিসেবে গণ্য করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুন্নত অর্থনীতির একটা গুরুত্ববহ বৈশিষ্ট্য"। এই দৃষ্টিভঙ্গির মর্মার্থ হলো; "প্রতিটি ব্যবসায়ী তার কর্মচারী ও গ্রাহকবর্গকে ঠকাচ্ছেন। সে নিত্য প্রতারণা করে। সে আয় গোপন রেখে সরকারের কর ফাঁকি দেয়। যদি সে কর ফাঁকি না দিতো তাহলে সরকার সেই সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য ও অসমতা দূর করতে পারতো। সমাজে বহু মানুষের মনে এই ধারণা যথেষ্ট উজ্জ্বল। এতে বোঝা যায়, সামাজিক অসমতা ও বৈষম্যে সৃষ্টির উৎসকে তারা একমাত্র সম্পদ সৃষ্টির মাঝেই খোঁজেন। এখানেই অর্থনীতি নৈতিকতার কাছে হার মানে।

সমাজে যতোদিন এমন ধ্যান-ধারণা বিরাজ করবে, যেমন সম্পদের পুনর্বণ্টন হলো অসমতা ও বৈষম্য দুরীকরণের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ততোদিন দারিদ্র্য যেমন দুর হবে না, তেমনি বৈষষ্য ও অসমতাও কমবে না। কেননা সম্পদ পুনর্বণ্টনের জন্য প্রথম কাজটি হলো সম্পদ সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির মাঝে কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য ও অসমতা বিরাজমান। অন্যদিকে, সম্পদের পুনর্বণ্টন ও রাজনীতি এ দুটো বিষয় একে অন্যের ছায়ার মতো সবসময় কাছাকাছি থাকে। এ সমস্যার সম্বোধন ও সমাধান নির্ভর করে দেশের

রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিকদের উপর। তাই, অনিবার্যভাবেই যে কোনো দেশে রাজনীতির উৎকর্ষ-মান, রাজনীতিকদের পরিণামদর্শিতা, নীতি, নৈতিকতা, নিয়মনিষ্ঠা ও তাঁদের নিজ গুণাবলীর মাঝে নিহিত থাকে সমাজে বৈষম্য, অসমতা ও নৈতিকতার মাত্রা বা পরিমাণ। ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ বা সুশীল সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী সমাজে নৈতিকতার মাত্রা উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, তবে কোনোদিন বৈষম্য ও অসমতা দূরীকরণের মাধ্যমে নৈতিকতার পরিমাণের নির্ধারক হতে পারবে না।

অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অনৈতিকতা

সাধারণ মানুষ আশা করেছিল, স্বাধীনতা এদেশে নৈতিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্বাধিকার, সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সাফল্য আনবে। কিছুই হয়নি তা বলা যাবে না। তবে তা প্রত্যাশার তুলনায় নগণ্য। যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেটুকু নৈতিকতাভিত্তিক কিনা বলা বড় মুস্কিল। দিনদিন জনগণের সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ক্ষমতা দখল করেছে স্বৈরশাসন। আবার কখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্বৈরশাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, জনগণ সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ কখনো পায়নি।

প্রকৃতপক্ষে, অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অবকাঠামো-নির্ভর সমাজে একই সাথে অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা ছাড়া শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিপদ ও ভয়াবহ সংকটকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি উন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দুরে অবস্থান করছি। বর্তমানের কথাই ধরা যাক, এখনও জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জাতি গঠনে ইচ্ছুক এবং উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম লক্ষ কোটি মানুষ হয় বেকার, অর্ধ-বেকার কিংবা অনুৎপাদনশীল।

উন্নত জীবনের নামে তারা সুযোগ পেলেই সরকার বদল করেছে। স্বৈরশাসনের পরিবর্তে নির্বাচিত সরকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রচলনের চেষ্টা করেছে। তারা দেখেছে, এতে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সমস্যা জর্জরিত এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের চাহিদার কথা, আকাংখার কথা, সামাজিক অসঙ্গতির কথা আজ মুখ ফুটে বলতে বা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতেও যেন ভয় পায়। করতে চাইলেও পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অগণতন্ত্রবাদীদের মুখে নিত্য-নিয়ত শোনা যায় যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সেই চূড়ান্ত সময় এখন আমাদের সামনে উপস্থিত যখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সমাজকে গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর জন্য প্রথম ও সর্বাগ্রে করণীয় হলো "নিজেদের ঘর সামলানো, যাতে অর্থনীতি বিকশিত হয়। তুলনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধানীতির মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে উঠে"।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ক্ষমতা, তাদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক আচার-আচারণ, আইনের শাসনের দুর্বলতা, অকার্যকর প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধানের অতিমাত্রায় অপব্যবহার ও নিচুমানের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচুমানের শাসন দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসের পথে এখন এক পর্বতপ্রমান বাধা। শাসনে দুরবস্থা জাতীয় অর্থনীতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অবনতির অতল গহ্বরে। সেই সাথে দেশের শ্রমজীবি মানুষগুলোকে তাদের সম্ভাবনা

ও সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রাপ্য সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি, নিরাপত্তার পরিবেশ ও নিত্যনূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুফল কেড়ে নিচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ এখন তার নিয়তির নানা পথের এক মিলন মোহনায় এসে থমকে গেছে। এ সত্য মেনে নিতেই হবে যে আগামী কয়েক দশকের পরিক্রমায় বাংলাদেশের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূলধন সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক বিনিয়োগ বাড়ানো। আর সেজন্যই আমাদের জনসমাজে একটি সুগভীর পরিবর্তন প্রয়োজন। সমাজের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে, আয়ের বৈষম্য এবং ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমাতে হলে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইন বিশারদ, সমাজ কর্মী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তথা সুশীল সমাজের সবাইকে অবশ্যই চিরায়ত উদারনৈতিকতার দর্শনকে সামনে রেখে দেশের রাজনীতি, আইনের শাসন, সামাজিক মূলধন সৃষ্টি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সব বাধাবিপত্তি সরাতে হবে। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশে অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য ও গতিশীলতা ফিরে আসবে, বিনিয়োগ বাড়বে, সম্পদ বাড়বে, অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে দেশের মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং এতে একদিকে সামাজিক অস্থিরতা প্রশমিত হবে, অন্যদিকে আর্থিক মূলধন বিনিয়োগ বাড়বে এবং সম্পদ ও আয়ের বিলি-বণ্টনে বৈষম্য কমে আসবে। অন্যথায়, বাংলাদেশের লাখো কোটি মানুষ বহুমাত্রিক বৈষম্য ও অনৈতিকতার মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়, নীরব ও স্থবির দর্শকের মতো শুধু দেখেই যাবে "মানব সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্যোগ"।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 095-102
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

নৈতিকতা ও অর্থনীতি

গীতা রানী দাস*

"নৈতিকতা ও অর্থনীতি"-র মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই। বরং, একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনৈতিক ব্যবহার শুধু সমাজে নয়, সর্বত্র তা ধ্বংসের কারণ। তাই অর্থনৈতিক উপকরণগুলো সক্রিয় রাখতে অনৈতিক নীতিমালা দিয়ে এগুলোকে কলুষিত না করা শ্রেয়। নৈতিক কার্যক্রমের কারণে একজন মানুষ পূণ্য অর্জন করে যা' তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়। সম্পদ, সুনাম, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার্য। Ethics হলো principles of morality–এই একটি জিনিষের অভাবই মূলত শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জাতিসমূহের সম্পদের অপচয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ।

অর্থনীতিবিদরা যখন পুঁজিবাদ, লাভক্ষতি, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি ধারণা নিয়ে ব্যস্ত তখন নীতিবানরা ভালো, উত্তম প্রিয়পাত্র হতে চেষ্টা করেন। তাই মূল্যবোধসম্পন্ন উত্তম এবং মূল্যবান লোককে অনুসরণ করা যৌক্তিক। যত বিভেদই থাকুক, অর্থনীতি, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে ethical issues গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জবাবদিহিতা, দৃষ্টিভংগী ও চিন্তা-চেতনায় যে যত স্বচ্ছ সে তত মূল্যবান জিনিসকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজকে নিয়ে দেশ ও পৃথিবী তাই অর্থনীতির নৈতিক উপকরণগুলোকে সচল রাখার মাধ্যমে কিভাবে সমাজে নিজের অবস্থান ও মূল্য উন্নত করা যায় অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিভাবে নিজের অর্জিত সম্পদ নিজের ভোগ ব্যয়ে নিঃশেষিত না করে অন্যের জন্য কিয়দংশ হলেও ত্যাগ করে।

স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সব মানুষের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় না বলে সরকারি নীতিমালার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তবে অনুদান প্রদান বা প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রদর্শন অধিক কাম্য ও যৌক্তিক। তাই অর্থ যেন কোনভাবেই অনৈতিক কাজে ব্যয়িত না হয় সেই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। একজন সৎ, আর্থিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিকে সাহায্য করা আর একজন উচ্ছৃঙ্খল, সন্ত্রাসী, নেশায় বুদ হয়ে থাকা অলস ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করা এক হতে পারে? যেমন এক ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদের অর্ধেক তার নিজ সংসার অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তান ও নিজের জন্য ব্যয় ছাড়াও বাকী অর্ধেক এর বাইরে খরচ করতো; যে বিষয়ে কোনো জবাবদিহিতা থাকতো না। তার পথভ্রষ্টতার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও পথভ্রষ্ট হতে হয়। ফলে প্রতিযোগীতামূলকভাবে অর্থ-সম্পদের অপচয়ের কারণে পরিবারটির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয় না। এ বিষয়েও সরকারের স্বচ্ছ নীতিমালার প্রয়োজন অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিটির

* বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আজীবন সদস্য

আয় ব্যয়ের উৎস, আয়কর প্রদান ছাড়াও শতকরা কত ভাগ "করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি"-তে ব্যয় করবে তার উপর। একটি পরিবারের জন্য শতকরা হারের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বাইনারী পদ্ধতি যেমন: ০১০১০১ অর্থাৎ স্বামীর পক্ষের লোকের জন্য ১ টাকা ব্যয় হলে তা হবে স্ত্রীর পক্ষের লোকের জন্য এক টাকা ব্যয়। এটা হলো পরিবারভিত্তিক CSR কৃত অর্থের নৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা।

নৈতিকতার বৈশ্বিক সংজ্ঞা থাকলেও দেশে-বিদেশে এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা ভিন্ন। যেমন: একটি দেশে মদ উৎপাদন ও পান করা নিষিদ্ধ আবার অন্য দেশে তা সেবন অত্যাবশ্যক হতে পারে। তাই, নৈতিকতার সংজ্ঞা ও প্রয়োগ সব বিষয়ে সব দেশে অভিন্ন হতে পারে না। আবার একটি দেশের বা জাতি-গোষ্ঠীর জন্য মদ-গাঁজা নিষিদ্ধ হলেও দক্ষ শ্রম শক্তির কারণে সে সব দেশে মদের উৎপাদন খরচ কম হতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্য দেশে ভোগ না হয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। এখানেও নৈতিকতার বিষয়টি একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। অর্থাৎ রয়েছে বেকারত্ব দূরীকরণ ও উৎপাদন খরচ কমানোর নৈতিক দিক। একজন মহিলা যিনি ৪০ বছর বয়সে ১০ লাখ টাকার মালিক এবং অবসরজীবনে ভ্রমণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আবার অন্য একজন মহিলা যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ১০ লাখ টাকার মালিক যখন তার বয়স ৪০, তখন ঐ অর্থ থেকে তিনি কল্যাণমূলক কাজে দান করেন ৯.৯ ভাগ, তাহলে কে সবার কাছে প্রশংসনীয়? অবশ্যই দ্বিতীয় জন।

জন্মগতভাবে মানুষের চরিত্র, আকার, অভ্যাস, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গঠনও ভিন্ন। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণও ভিন্ন। আবার পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণেও দেখা যায় ব্যবহারিক প্রয়োগের ভিন্নতা। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বিদ্যমান পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিযোগীতা করার সক্ষমতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভূগর্ভস্থ সম্পদের প্রাচুর্যতা/দুস্প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ethical অর্থনীতি গড়া অধিক গ্রহণীয়। তবে তিনটি মৌলিক বিষয় পৃথিবীর সব দেশ ও সব ধরনের কর্মকাণ্ডে গ্রহণযোগ্য তা হলো: ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও সম্পদ। এগুলোর চাহিদা বিশ্বব্যাপী সমান।

নৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দিকটিও মূখ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকারের গঠনপ্রকৃতি, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আদর্শ/অন্যান্য দলের মেনিফেস্টো ইত্যাদি বিষয়গুলোও একটি দেশের অর্থনীতিকে Ethical standard এ উন্নীত করতে সমভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার নীতি নির্ধারক মহলের বিবেচনায় যে বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত মনে হবে তাই হবে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা। যেমন: মুদ্রানীতি প্রণয়ন, বাজেটের মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা নিরূপণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সম্পর্কোন্নয়ন, করারোপ, আর্থিক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা।

অবশ্যই কোনো বিশেষ এলাকার অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গিয়ে "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হচ্ছে কিনা? (২) যেসব মেধা, প্রতিভার বিকাশে সমাজ আলোকিত তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা? ভালো-মন্দের ঐশ্বরিক বিচার সময়সাপেক্ষ বলেই প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিরূপণ, নিরীক্ষণ, ঘটনার নিয়মতান্ত্রিকতা যাচাইকরণ এসবই নৈতিক অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের উপকরণ।

নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বিভিন্ন সময়কালের অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিকে নীতিবাচক বিজ্ঞান এবং অধ্যাপক এল রবিনস অর্থনীতিকে একটি ইতিবাচক বিশুদ্ধ ও সার্বজনীন বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত

করেছেন। তাদের সংজ্ঞায় মানুষের কল্যাণ প্রাধান্য পেয়েছে। এতে ব্যবস্থাপনার দিকটি উঠে এসেছে। সমাজে কুকর্মে সম্পৃক্ত করা সম্ভব এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অন্যদিকে, ভালো কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা বেশি হলেও তারা পরিস্থিতির স্বীকার। উপরন্তু রয়েছে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, আদর্শগত বিভেদ। এসব বিষয়কে "সমন্বয় ও জবাবদিহিমূলক" অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বজনীনভাবে গড়ে তোলাই শ্রেয়। অনেকে যেমন কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার সাথে নৈতিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এক করতে চেয়েছেন। মুক্ত অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিযোগীতায়, পুঁজিবাদের উপস্থিতি, কোনোটির সাথেই নৈতিকতার সংঘর্ষ নেই। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, মোটামুটি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ পরিবেশের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে বলা যায় নৈতিকতাপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই নৈতিকতা সংরক্ষিত হতে পারে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও। শুধুমাত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়ই যে নৈতিকতা সংরক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। উল্লেখ্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সমাজের সব ব্যক্তিকে যদি আয় করের আওতায় আনা যায় তবে সিএসআর এর প্রয়োজন **কমে আসে**। আয়ের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহিতা নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে পারে। অর্থ অপচয় ও ভোগ ব্যয়েও থাকতে পারে ব্যাপক ব্যবধান। যার তুলনামূলক পর্যালোচনার সুযোগ কম। সমাজে সিএসআর-এ সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও অত্যন্ত সীমিত। তাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বা সরকার প্রণীত আইনসিদ্ধ নীতিমালা দিয়েই তৈরী হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী টার্গেট গ্রুপ বা সিন্ডিকেটেড গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা না গেলে তথ্যের গোপনীয়তায় অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনীতিবিদ পিগু এর মতে, মানবকল্যাণ ত্বরান্বয়নে অর্থনীতি নীতিশাস্ত্রের ভৃত্যস্বরূপ। নৈতিক অর্থনীতি কখনোই অকল্যাণকর কর্ম উদ্দীপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো অর্থনীতিশাস্ত্রেরও কতগুলো মৌলিক ধারণা রয়েছে:

দ্রব্য: যা 'বস্তুগত ও অবস্তুগত' (যেমন: গায়কের গান, কবি প্রতিভা ও ব্যবসায়ীর সুনাম)। এ ছাড়াও রয়েছে ভোগ্য দ্রব্য বা মূলধন দ্রব্য ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য যা নীতিগতভাবে আইনসিদ্ধ সেসব দ্রব্যই নৈতিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত।

সম্পদ: সম্পত্তি ও মানব সম্পদ। সম্পদ বৈশিষ্ট্য চারটি। যেমন উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা। তবে সৎ উপায়ে অর্জিত এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ সম্পদই হলো নৈতিক সম্পদ। সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। সম্পদ কল্যাণের উৎস। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে কিনা তা সম্পদের উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটি দেশের অর্থনীতিকে আরো বেশী নৈতিক করতে কি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা মূলত সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের সিদ্ধান্তের বিষয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত যেমন: পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। কোনে কোনো দেশে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আবার কোথাও কোথাও মিশ্র ব্যবস্থাকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। তবে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন উৎপাদন ও ভোগকার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সংমিশ্রণ নৈতিক হওয়া উচিত। যেমন: আমাদের মতো দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থাই অধিক নীতিসিদ্ধ। তবে এতে অন্তর্কোন্দল বাড়ে।

একটি স্বাধীন দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি মূলত উৎপাদন। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে কি পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত পণ্য উৎপন্ন হয় তার মোট মূল্য হলো একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন। ঐ পণ্য নৈতিক কিনা তা নির্ভর করে উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণের নৈতিক ব্যবহারের উপর। তাই উৎপাদনের চারটি উপকরণের কার্যাবলী বিশ্লেষণেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে।

১. ভূমি: ভূমি ব্যবহারে নৈতিকতা অত্যন্ত জরুরি। ভূমি ব্যবহারে সন্ত্রাসীদের লীলাক্ষেত্র রূপে ভূমির ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না বা এমন কিছু শিল্প কলকারখানা স্থাপন করা যাবে না যার ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ু দুষণের কারণে মাটির উর্বরতা বিনষ্ট হয়ে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পরিকল্পিতভাবে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ তীব্র দাবাদহের কারণে অনেক স্থানে আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখা যায়। এটাও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতি ঘনফুটে জনবসতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যেসব কলকারখানার বর্জ্য পদার্থে নদ-নদীর পানি দুষিত হয়ে এলাকাবাসীর জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে সেসব বিষয় নৈতিক নীতি নির্ধারক মহলের/অর্থনীতিবিদদের চিন্তায় ও মননশীলতায় প্রধান্য পাওয়া উচিত। কি পরিমাণ জমি কৃষি খাত, কতটা আবাসভূমির জন্য ব্যবহার কতটা শিল্পে ব্যবহার, কতটা বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত। কতটা জমি সরকারি খাতে আর কতটা বেসরকারি খাতে থাকবে তারও রূপকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২. শ্রম : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের শ্রম, মেধার যৌক্তিক ব্যবহারে ভূমি এবং মূলধনকে উৎপাদন কাজে লাগানো যায়। মানুষের মেধা যদি মানুষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগানো না যায় তবে সেই মেধার কোন মূল্য নেই। আবার শ্রমিক যদি শ্রমের যথাযথ মূল্য না পায়, প্রকৃত আয়কে বিবেচনায় আনা না যায় এবং বীমা সুবিধাসহ অনান্য সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায় তবে অবশ্যই শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তা প্রতিকুল। এছাড়াও দরকষাকষির এজেন্ট হিসাবে ক্ষমতা প্রদান তার মধ্যে অন্যতম। যেসব শ্রমিক দৈনিকভিত্তিতে কাজ করে এবং যাদের কোনো উৎসব ভাতা প্রদানের বিধান নেই তাদের মজুরীও অন্যন্যদের তুলনায় বেশি হওয়া বাঞ্চনীয়। কাজের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ীও শ্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেসব সৃজনশীল বুদ্ধি মানব কল্যাণে ও নতুন নতুন আবিষ্কারে সম্পৃক্ত সেসব শ্রম অধিক মূল্য পাওয়ার যোগ্য। তীব্র দাবদাহে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী আর এয়ার কন্ডিশনে বসে কর্মরত শ্রমিকের মজুরী কি এক হওয়া বাঞ্ছনীয় নাকি নৈতিক?

৩. মূলধন: মূলধন মানুষের উৎপাদিত সম্পদ। মানুষের বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে মূলধন পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। শ্রমিকের কায়িক শ্রম লাঘবের জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং শ্রমিকের মোট উৎপাদনের কতটুকু মূলধন গঠনে ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ এবং উৎপাদন খরচ মিটানোর জন্যও মূলধন প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই মূলধনের প্রয়োজন। সরকারি কর ব্যবস্থা, ঘাটতি বাজেট, বিদেশী বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, মুদ্রানীতি, সুদের হার, শেয়ার ব্যবসা, সরকারি বিল বন্ড ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন উল্লেখ্য। উন্নত দেশগুলোতে মূলধন গঠনে নিয়মনীতি অনুসৃত হলেও অনুন্নত দেশে তা হয় না। কারণ মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, নিরাপত্তার অভাব, জনগণের দূরদৃষ্টির অভাব, বাজারের সীমাবদ্ধতা, পণ্যের গুণগত মান ও

বাজারের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, সম্পদ বণ্টনে অনৈতিকতা, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, ব্যাংক সুদের হার ইত্যাদি। কস্ট বেনিফিট হিসাব করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঠিক কতো পরিমাণ মুলধন গঠনে ব্যয় করা উচিত তা নির্ধারণ করা যৌক্তিক। অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন কাম্য পর্যায়ে না থাকায় যৌথ মূলধনী কারবারের ধারণা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির জন্য। তবে ঐ মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবহার কতটা নৈতিক তা বিচার-বিশ্লেষণ করা উদ্যোক্তা ও সরকারের কাজ। ব্যবহৃত মূলধন দীর্ঘ মেয়াদে লাভ আনবে নাকি স্বল্পমেয়াদে লাভ আনবে তার খরচ-মুনাফা হিসাব করা অত্যাবশ্যক।

৪. সংগঠন: একটি দেশের জন্য কি ধরণের প্রতিষ্ঠান কাম্য তা বিবেচনার দায়িত্ব উদ্যোক্তার। উৎপাদনের সব উপকরণ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার দায়িত্ব সরকার বা উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা নিজেই নির্ধারণ করবে কি কি ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কোন ধরনের ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। যেখানে শুধু লাভ-ক্ষতির হিসাব অনেক সময় প্রাধান্য পাবে না, বরং অস্তিত্বের বিষয়টিও প্রাধান্য পাবে। প্রতিষ্ঠানটি এক মালিকানা, অংশিদারী, যৌথ মালিকানা, সমবায় নাকি সম্পূর্ণভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হলে নৈতিকতা বজায় রাখা যায় তা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের। তবে সরকার পরিচালনায় নিযুক্ত রাজনৈতিক দলের আদর্শ যদি স্বৈরাচারী হয় তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বৈরাচারে পরিণত হয়। তথ্যের গোপনীয়তার মাধ্যমে হিসাববিহীন অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জনদুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। বিপরীত অবস্থায় মুক্ত মনের বিকাশ ঘটে, বিচারব্যবস্থা নৈতিক হয় এবং সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে আসে। শ্রম ও মূলধনের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির মতো পরিবেশ সৃষ্টির ফলে সুবিধা অনুযায়ী সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরাজ করে। শ্রমের গতিশীলতায় উৎপাদন বেড়ে অর্থনীতির চাকা সচল হয়। সরকার যদি স্বৈরাচারী বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শপুষ্ট হয় তবে ব্যবসা সংগঠনগুলো অংশিদারী, সমবায়ভিত্তিক বা যৌথ মূলধনী কারবার হওয়া উচিত। সরকার যদি গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হয় তবে একচেটিয়া কারবারসহ উল্লিখিত বিভিন্ন সংগঠন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। অবশ্যই সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর মতবিনিময়ে নৈতিক ব্যবসার নিয়মনীতি নির্ধারিত হবে।

৫. বাজার ব্যবস্থা: অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক পণ্যকে বুঝায় যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়। উন্নত ও অনুন্নত দেশের বাজারব্যবস্থা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাও হতে পারে। এটা নির্ভর করে ক্রেতাদের শিক্ষা সচেতনতা, দেশাত্মবোধ, বিক্রেতাদের নৈতিকতা, মূলধনের উৎস, সরকারি নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। সর্বোপরি, সরকারের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণও মুখ্য বিষয়। আইনের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগীদের ক্ষমতা সংরক্ষণ করা না যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অথচ সম্পদশালী দেশের জন্য “নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগীতামূলক” ব্যবস্থা অধিক কাম্য। আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে শুল্ক, ট্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব। দেশীয় উৎপাদনের তুলনায় আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও বেকার সমস্যা দূরকরণে দেশীয় শিল্পকে প্রণোদনা দেয়া বেশি নৈতিক বলে বিবেচ্য। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারিত হয়। অলিগোপলি, ডুওপোলি ও একচেটিয়া বর্তমানে নেই বললেই

চলে। কোন বিশেষ পণ্যের জন্য একচেটিয়া বাজার থাকতে পারে আবার কতিপয় পণ্যের জন্য "অলি" ও "ডুও" থাকতে পারে। পাশাপাশি সরকার নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থারও প্রচলন থাকতে পারে। মোটামুটি উভয় সংকটে থাকা দেশের জন্য মিশ্র বাজার ব্যবস্থা বেশি নৈতিকতাপূর্ণ।

৬. সরকারি: সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সবরকম অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ, বাজার সম্প্রসারণ, মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখে অর্থনীতির চাকাকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সচল রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। সব কিছুই যেহেতু, সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত তাই সরকারের কর্মকাণ্ডে যদি অর্থের অপচয় না হয় এবং নৈতিক বিবেচনায় তা পরিশুদ্ধ হয় তবে রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সব কর্মকাণ্ডেই সরকারের হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাস্তবায়ন ও মানবকল্যাণই যখন সরকারের উদ্দেশ্য, তাই রাষ্ট্রের উচিত নৈতিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করা। যেসব বিষয়কে নৈতিক অর্থনীতি গড়ার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয় সেগুলো যেমন: আর্থিক নীতি, সরকারি বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রানীতি, ব্যাংক হার নিরূপণ, বাণিজ্য হার, মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাংক সুদের হার নির্ধারণ, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি ব্যয় নিরূপণ, বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন, অর্থ বাজার ও মূলধন বাজারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, করপাত ও করঘাত সংশোধন ইত্যাদি। সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকে তবে অর্থের ও সম্পদের অপচয় ঘটে। যেমন: আমানতের সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণাত্মক হওয়া। পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের নারীর গতিময়তা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত, ব্যবসা-বাণিজ্য করার সক্ষমতাও অনেকের নেই। তাই নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেয়া অবশ্যই নৈতিকতাপূর্ণ।

জার্মান অর্থনীতিবিদ Peter Koslowsk-র মতে, অধিকাংশ লোকের "সেল্ফ ইন্টারেস্ট" যদি যৌক্তিকভাবে মিটানো যায় তবেই তা নৈতিক অর্থনীতি। অর্থশাস্ত্রের জনক "অ্যাডাম স্মিথের" ওয়েলথ অব নেশনস উদ্ধৃত করে পিটার যুক্তি দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগের সাথে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় রয়েছে। তবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নৈতিক অর্থনীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনৈতিক অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির সামাজিক, আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করে (মূল্য পদ্ধতি, বাজার ইন্টারেকশান, চাহিদা ও যোগান, লাভ-ক্ষতি, মালিকানা, চুক্তি, অধিকার, ন্যায়-বিচার) অন্যদিকে, নৈতিক অর্থনীতি এসব প্রতিষ্ঠানের ন্যায়বিচারের নৈতিক নিয়মকানুন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে।

পিটার কোসলোস্কি 'ইথিক্যাল ইকোনমি'র গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৯৫২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন।

কসলোস্কির বিশ্লেষণ তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

১. অর্থনীতির নৈতিক পূর্বানুমানের তত্ত্ব
২. নৈতিকতার অর্থনীতি
৩. দ্রব্যাদির অর্থনৈতিক ও নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির গুণগত মূল্য।

নৈতিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় কারণ "কসলোস্কি" উল্লেখ করেছেন।

১. সচেতনতা বৃদ্ধি করা: অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বর্ধিত সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং তাদের নৈতিক জবাবদিহিতা প্রয়োজন।

২. কৌশলগত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মানবিক বিষয়সমূহ এবং অর্থনৈতিক নেতাদের জবাবদিহিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুনঃআবিষ্কার করা।

৩. সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিশ্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা প্রতিহত করা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, কসলোস্কি ইথিক্যাল ইকোনমিকে বিশ্লেষণ করে তাকে আধুনিক-উত্তর অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

'Close juxtapose of economics and ethics enables to enjoy loving relationship and self-responsibility that enables to live in freedom by ethical economy.'

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 103-116
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ: কিছু নৈতিক প্রশ্ন

মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারকথা: *সংবিধান একটি দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন। এ আইন মেনে চলা দেশের সরকারসহ প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারকে আর যাই হোক দেশপ্রেমী সরকার বা নাগরিক বলা যাবে না। আমাদের সৌভাগ্য, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৯ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তৎকালীন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত একটি সুন্দর আধুনিক সংবিধান পাই। অন্যদিকে আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার শত্রু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হারাই। ভেঙ্গে যায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের আজীবন লালিত স্বপ্ন। চেপে বসে সামরিক স্বৈরাচারী দুঃশাসন। সামরিক স্বৈরাচার প্রথমেই ছুরি চালায় আমাদের মহান সংবিধানের মূলনীতিগুলোর উপর। বাতিল করে দেয় বঙ্গবন্ধুর সরকার সূচিত দ্বিতীয় বিপ্লবের সব কর্মসূচী (প্রথম বিপ্লব ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। আর দ্বিতীয় বিপ্লব ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে সূচীত অর্থনৈতিক বিপ্লব)। একে একে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতিসহ বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুসৃত সব নীতিকৌশলই বর্জন করে স্বৈরাচারী সামরিক সরকারগুলো। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার পতনের পর ক্ষমতায় আসা সরকারগুলোও স্বৈরাচার প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপিয়ে দেয়া নীতিকৌশল অবলম্বন করে চলছে। এমনকি বর্তমান সরকারও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একই ধরনের সমঝোতা করে চলছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত উন্নয়ন নীতিকৌশলগুলো আলোচনার প্রচেষ্টা নিয়েছি। আর তা করতে গিয়ে প্রবন্ধের ১ম অংশে মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছি; দ্বিতীয় অংশে বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত উন্নয়ন নীতি ও নানা কৌশল বঙ্গবন্ধু উত্তর সরকারগুলোর অনুরূপ নীতিকৌশলের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করেছি। সবশেষে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে করণীয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।*

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

এক

সুদীর্ঘ ২৪ বছরের ধারাবাহিক এক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আজকের বাংলাদেশকে পেয়েছি। এই আন্দোলন-সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে ধারণ করেই রচিত হয়েছিল আমাদের দেশের ১৯৭২ এর সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি নীতিকে বেছে নেয়া হয়েছে। সংবিধানে এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে:

১। **জাতীয়তাবাদঃ** "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" (৪, পৃ: ৪)।

২। **সমাজতন্ত্রঃ** "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

৩। **গণতন্ত্রঃ** "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" (৪, পৃ: ৪)।

৪। **ধর্মনিরপেক্ষতাঃ** "ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য, ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।" (৪, পৃ: ৪)।

উপরের চারটি মূলনীতির মধ্যে সরাসরি অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হ'ল সমাজতন্ত্র। এ নীতির বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে অন্য তিনটি। তার মানে সমাজতন্ত্র তথা শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আবশ্যক, দরকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং ধর্মীয় হানাহানি ও উম্মাদনামুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কাজটিই সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তাঁর বাকশাল কর্মসূচীর মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি তা করতে পারেননি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে। এরাই ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট তাঁকে স্বপরিবারে অত্যন্ত বর্বরভাবে হত্যা করে। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিখাত বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যারল্ড লাসকির ভক্ত। তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে, যেমন এখন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া ও উরুগুয়েতে ঘটছে।

আসলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা হিসেবে বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন। আর তাই তিনি আন্দোলনের বছরগুলোতে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় অসংখ্যবার সোনার বাংলা শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেছেন। সোনার বাংলা বলতে তিনি এমন এক বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বুঝিয়েছেন যেখানে মানুষের ছয়টি মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন ঘটবে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ তিনবেলা পেটভরে ভাত খেতে পাক, ভাল পরিধেয় পাক, মাথাগোজার ঠাঁই পাক, পাক উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা ও কাজ। এগুলোর বাস্তবায়নে তিনি বাকশাল কর্মসূচীর আওতায় তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন:

১। কৃষির সমবায়ীকরণ; ২। আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন; ৩। ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। কৃষককে ভূ-স্বামী ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের শোষণ থেকে মুক্ত করা ও কৃষির আধুনিকায়নের জন্যে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ১২৫টি থানায় (বর্তমানে উপজেলা) বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ এর ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন: "কৃষক ভাইয়েরা আমার। আমি আপনাদের জমি নেব না। জমির মালিক আপনারাই থাকবেন। শুধু আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ হবে। সরকার ন্যায্য মূল্যে সকল উপকরণ ও সেচযন্ত্র সরবরাহ করবে। উৎপাদিত ফসল তিনভাগ হবে: মালিকানার জন্যে এক ভাগ, উপকরণের জন্যে এক ভাগ এবং শ্রমের জন্যে এক ভাগ।"

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্ম সংস্থানের জন্যে শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। দেশকে স্বয়ম্ভর তথা আত্মনির্ভরশীল করা ও জনগণের চাহিদা পূরণের স্বার্থে তিনি আমদানী বিকল্প শিল্পনীতি বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর এ নীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিগত শতাব্দীর আশির দশকেই শিল্পায়িত উন্নত দেশে রূপান্তারিত হতো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, আধুনিক কারিগরী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। তাই তিনি ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে বিগত শতাব্দীর আশির দশকেই আমরা এ ক্ষেত্রে একটি নেতৃস্থানীয় দেশে পরিণত হতে পারতাম।

দুই

দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা জাতির পিতাকে বাঁচাতে পারিনি। ১৯৭৫ সালে তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে সূচনা হয় এক কালো অধ্যায়ের, যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের যাবতীয় অর্জনকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়, কাঁটা-ছেড়া করা হয় পবিত্র সংবিধানকেও। স্বৈর শাসক জেনারেল জিয়া সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার বসিয়ে দেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে বিসমিল্লাহ বসিয়ে আমাদের সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র পাল্টিয়ে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেন। আমাদের দেশকে পাকিস্তানী ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেয়ার এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কু-পরামর্শে বঙ্গবন্ধু সরকারের সূচিত বাকশাল কর্মসূচী বাতিল করে জিয়া সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের নব্য সামন্তবাদী অর্থনীতি চালু করেন। দেশে কায়েম করেন সিভিল-মিলিটারীর এক আমলাতন্ত্র। শুরু হয় তাদের অবাধ লুটপাট। দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। ধ্বংস করা হয় সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

বলা প্রয়োজন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের কু-পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কারের নামে গোটা অর্থনীতি বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপর্যস্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত আমদানী বিকল্প শিল্পনীতি বাতিল করে চালু করা হয় রপ্তানীমুখী শিল্পনীতি। গড়ে তোলা শুরু হয় পোষাক শিল্প যার কাঁচামালসহ সবকিছুই তখন আমদানী করতে হতো। বস্তুতপক্ষে, সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল কাঠামোগত সংস্কারের মূল লক্ষ্য। শুরু হয় বেসরকারিকরণ ও বেসরকারি খাতের বিকাশ উৎসাহিত করার নীতির বাস্তবায়ন। আমদানী বাণিজ্যে উদারীকরণ করা হয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর স্বার্থে। ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হয়। গড়ে ওঠে এক লাটি-ফুন্ডি চক্র যার অবধারিত

পরিণতিতে ঋণখেলাপী সংস্কৃতি গড়ে উঠে। বাতিল করা হয় শিক্ষানীতি। স্বৈরাচার আজীবন ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী ধাঁচে ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষ করে, মাদ্রাসা শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। এ সময়ে মূল ধারার শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। দেশ জঙ্গিবাদের লালন ক্ষেত্রে পরিণত হয় যার বিষময় ফল আমরা আজও ভোগ করছি। ভাগ্যিস মহাজোট সরকার ১৯৯৬ ও ২০০৮ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে। নইলে, দেশ আজ কোন্ অন্ধকারে ডুব দিত তা ভেবে সত্যিই আতংকিত হই!

স্বৈরাচারের আমলে একটি দু'বছর মেয়াদী এবং তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বটে তবে তা যতটা না দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারচেয়ে বেশী স্বৈরাচারের কল্যাণ ও খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে। একমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে তথা সংবিধানের মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতনের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা পরিকল্পনাকে বিশ্ব মোড়লদের কু-পরামর্শে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ফলে মহাজোট ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে কোনও পরিকল্পনা পায়নি। তাদেরকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়েছিল যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। তবে এ পরিকল্পনায়ও সংবিধানের মূলনীতিগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ২০০১ এর নির্বাচনে বিশ দলীয় জোট ক্ষমতায় এসে আবার পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কুপরামর্শে পিআরএসপি অর্থাৎ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার বিষময় ফল দেশবাসী উপলব্ধি করেছে। দারিদ্র্য না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনার কথা শিখেছিলাম। মন্ত্রণালয়গুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রের চাহিদা নিরূপণ করে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দেবেন। তাঁর মতে, এতে ভাল ফল পাওয়া যাবে। পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। এর ফলে শাখা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সম্পদের হিস্যা পাওয়ার জন্যে অসুস্থ এক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কোন কোন মন্ত্রণালয় আবার অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর মহানুকুল্য পেতে সমর্থ হয়, অন্যরা এতে অস্বস্তিতে পড়ে। এতে প্রকৃত চাহিদা পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতিতে দেখা দেয় বিশৃংখলা। আসলেই পিআরএসপি যেসব দেশ করেছে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নেপাল, বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনাসহ আফ্রিকার বেশ কিছু দেশকে পিআরএসপি অনুসরণ করতে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বৈরাচার রেল ও নৌ-পথকে চরমভাবে অবহেলা করে আমাদের দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে দারুনভাবে ব্যাহত করে। নির্মিত হয় প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার সড়ক। এতে অন্তত এক মিলিয়ন হেক্টর উৎকৃষ্ট আবাদী জমি নষ্ট হয়। অথচ রেলপথ ১৯৭২ সালের ২৮৭৪ কিলোমিটার থেকে কমে প্রায় ২৭০০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৯০ সালে। ড্রেজিং এর অভাবে নৌপথ সংকুচিত হয়ে মাত্র ৩০০০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায় ঐ একই সময়ে। ঢাকায় পাতাল রেল নির্মাণের কথা চিন্তাও করেনি স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী। ঢাকাসহ সারা দেশে তাদেরই দলীয় লোক দিয়ে বাস সার্ভিস, ট্রাক সার্ভিস চালু করে। এভাবেই গড়ে উঠেছে এক মহানৈরাজ্যপূর্ণ বাস-ট্রাক সার্ভিস। ঘটছে দুর্ঘটনা। মরছে মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি। বেড়েছে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট ব্যবসা। অথচ যদি রেল ও নৌ-পথের উন্নয়ন করা হতো তা'হলে আমাদেরকে এই নৈরাজ্যপূর্ণ সেকেলে পরিবহণ ব্যবস্থা দেখতে হতো না, অর্থনীতি হতো অনেক অনেক গুণে দক্ষ।

আবাসনের নামে দখল ও জবরদখল হয়ে গেছে ঢাকার ৪৯টি খাল, যার বেশীর ভাগেই এখন অস্তিত্ব নেই। অথচ এগুলো ছিল ঢাকার জীবন। দখল হয়েছে খাস জমি, সরকারি উদ্যানের জমি ও নদ-নদীর

পাড়। ঢাকা আজ এক কংক্রিটের উদ্যানে পরিণত হয়েছে। এখানের বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা অনেক কম, ক্ষতিকর সিসাসহ অসংখ্য ক্ষতিকর পদার্থে ভর্তি। আয়তনের অন্তত ২৫% সড়ক থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র ৮%। সড়কগুলো অত্যন্ত সরু ও সড়কের সংখ্যা কম হওয়ায় দীর্ঘ যানজট লেগেই থাকছে বিশেষ করে, অফিস সময় শুরু ও শেষ হওয়ার মূহুর্তগুলোতে। আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সেকেলে। সড়কগুলোর সিগনালিং ব্যবস্থা আরও খারাপ অবস্থায় আছে। ভাবা যায়, এই একবিংশ শতাব্দিতেও হাত উঁচিয়ে সিগনালিং ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে!

মহাজোট সরকারের আমলে (২০০৯-বর্তমান) পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও আদর্শ অবস্থা থেকে এখনও অনেক দূরে আছে আমাদের দেশ। ২০০৮ এর নির্বাচনে জয়লাভের পরে ক্ষমতায় এসে এ সরকার আবার পরিকল্পনায় ফিরে যায়। এবারে তারা একটা নতুন ধরনের পরিকল্পনা করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা "রূপকল্প ২০২১" এ নামে। এটি আবার দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে: ষষ্ঠ ও সপ্তম। ষষ্ঠ (২০১১-২০১৫) ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)।

২০০৮ সালের নির্বাচনে মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশ্তেহারকে "দিন বদলের সনদ" আখ্যা দিয়েছিল। তাদের দ্বিতীয় মেয়াদ চলছে, প্রায় শেষের দিকে। দিন যে বদল হয়নি তা বলছি না। তবে একথা অবশ্যই বলতে পারি যে, দিন পুরোপুরি বদল হতে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। টেকসইভাবে দারিদ্র্য উচ্ছেদ (এসডিজি'র ১ম লক্ষ্য), একমুখী শিক্ষা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, দুর্নীতি রোধ, দখল-জবরদখলের মত বিষয়গুলোর সুরাহা এখনও হয়নি। আমলাতন্ত্রের সমস্যা তো রয়েছেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা অবশ্যই আমলাতন্ত্র। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, সরকার আমলাতন্ত্রকে দায়িত্বশীল করার পরিবর্তে দায়মুক্তি এবং আরও ক্ষমতাবান করতেই বেশী আগ্রহী। অফিস চলাকালীন সময়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ, বোর্ড সভা ইত্যাদিতে যোগদান কতখানি যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

তিন

আমাদের দেশে বর্তমানে নৈতিকতার মহাসংকট চলছে। "চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী," বঙ্গবন্ধু এ বাক্যটি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন অসাধু, দুঃশ্চরিত্র ও গরীব-দুঃখী মানুষের জন্যে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্য পণ্য ও টাকা-পয়সা আত্মসাতকারী অসৎ লোকদের ইঙ্গিত করে। নৈতিক স্খলন না ঘটলে একজন মানুষ আসলে অন্য একজন মানুষের প্রাপ্যটুকু কেড়ে নিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি আসলে নৈতিকতা কী? নৈতিকতা বা নৈতিক দর্শন দর্শনেরই একটি শাখা যা মানুষের আচরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তার আচরণ বা কর্মকাণ্ড ঠিক নাকি ভুল, ভাল নাকি খারাপ, পাপের নাকি পুণ্যের, ন্যায্য নাকি অন্যায় ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নৈতিকতার বিশ্লেষণে। ঠিক তেমনিভাবে সরকারের আচরণ বা কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলেও এ সত্যগুলো উদ্ঘাটিত হবে। আসলে নৈতিকতা হচ্ছে মানবিক আচরণ বা ব্যবহারের অন্য নাম। ধর্মের আর্বিভাব কিন্তু নৈতিকতার বাণী নিয়ে। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম এমন কি হিন্দু ধর্মের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা বা মানবিক আচরণ শিক্ষা। সত্যিকার অর্থে, অর্থনীতি একটি নৈতিক বিজ্ঞান যা প্রায়োগিক দর্শনের একটি শাখা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে ধ্রুপদী যুগে এটি নৈতিক দর্শনের শাখা হিসেবে উঠে এলেও নব্য-ধ্রুপদী যুগে নৈতিকতার বিষয়গুলো অনেকটা ফিকে হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রান্তিকীকরণ করা হয়। আধুনিককালে এসে

আবার নৈতিক বিবেচনাকে সাংঘাতিকভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যেমন নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে, "অর্থনীতিবিদদের বেশী বেশী মনোযোগী হওয়া উচিত অর্থনৈতিক আচরণ বা কর্মকাণ্ড আলোচনায় নৈতিক বিষয়াবলীর প্রতি" (১৯৮৭)। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রেক্ষিতে এখন আমরা নৈতিকতার বিচারে আমাদের দেশের সরকারগুলোর কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

১। বঙ্গবন্ধুর সরকার সংবিধানের মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাকশাল কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা শেষ করে যেতে পারেননি। সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে এ মহান কাজটি করতে দেয়নি। কারণ তারা ভয় পেয়েছিল, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলবেন। সাম্রাজ্যবাদীদের যত ভয় সমাজতন্ত্রকে। তাই, ১৯১৭ সালে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্যে বিপ্লবের ছয় মাসের মাথায় সদলবলে (প্রায় ১২টি পুঁজিবাদী দেশ সম্মিলিতভাবে) ঐ দেশটিকে আক্রমণ করে বসে এবং এর চার ভাগের তিন ভাগ দখল করে নেয়। মাত্র দেড় বছরের মাথায় লেনিনের নেতৃত্বে ঐ দেশটির জনগণ তাদের বিদায় করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিল। আসলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মনে করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তাদের শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে-এটাই তাদের বড় ভয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো আজও স্বাধীন হতো না যদি না পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটতো। এই তো সেদিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে জোর করে ধরে রেখেছিল তার হিরা ও সোনার লোভে। সেখানে কিউবার মত একটি ছোট্ট সমাজতান্ত্রিক দেশের কয়েক হাজার সৈন্যকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে (মুদিবো) তারা প্রায় সাতাশ বছর জেলে পুড়ে রেখেছিল। কারণ তিনি তাদের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, কথা বলেছিলেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। এই সাম্রাজ্যবাদীরাই দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় সংখ্যাগুরু মানুষগুলোকে যুগ যুগ ধরে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তারা বাস করতো ঘেট্টোতে (সংখ্যালঘু শ্বেতকায়দের বসতি থেকে বেশ দূরে কৃষ্ণকায়দের জন্যে নির্মিত বস্তি ধরনের নিম্ন মানের বাসা বা কলোনী)। অথচ তাদেরকে বংশ পরম্পরায় কৃষি ও শিল্পসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশুর মত খাটাতো। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জনগণের মুক্তি যুদ্ধে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোই সাহায্যের (বস্তুগত ও নৈতিক) হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর কিউবানরা তো সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছিল। এটা না হলে কি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা দক্ষিণ আফ্রিকার হিরা ও সোনার খনি ছেড়ে যেতেন আদৌ?

আসলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শত শত বছর ধরে ডাকাতের বেশে আজকের স্বাধীন অথচ পশ্চাদপদ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে লুন্ঠন করে ধনী হয়েছে বিশেষ করে ব্রিটিশ, ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয়, ডাচ, বেলজীয় ও পর্তুগীজরা। স্বাধীন হয়েও আজকের দিনে তারা এগুতে পারছে না। তার কারণ ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাধীনচেতা, গণতন্ত্রকামী নেতৃত্বকে গায়ের জোরে সরিয়ে দেয়, না সরলে চিরতরে পরকালে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে তারা আমাদের দেশের স্থপতি জাতির জনককে খুন করেছে, চিলির আলেন্দেকে, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণকে, ঘানার নক্রুমাকে এবং ভারতের ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য গণতন্ত্রকামী নেতৃত্বকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে। পিছিয়ে দিয়েছে এ দেশগুলোর অগ্রযাত্রাকে। আর পানামার সামরিক শাসক (প্রেসিডেন্ট) জেনারেল নরিয়েগাকে তো দস্তুরমত অত্যন্ত অমানবিকভাবে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহসনের বিচার করে ৪৮ বছরের দণ্ড দিয়েছিল। এর কারণ তিনি পানামা খাল পানামা বাসীর এই আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন। এখানে

উল্লেখ করা দরকার, বিগত শতাব্দীর শুরুতে মার্কিনীরা পানামা খাল খনন করে দিয়েছিল বলে তার সমস্ত আয় ১০০ বছরের জন্যে তারা পাবে এই মর্মে এক নব্য দাসত্বের চুক্তি করতে পানামাকে বাধ্য করেছিল। কাজেই এর বিরুদ্ধে পানামাবাসীর আন্দোলন ছিল দীর্ঘদিনের।

ফিরে আসি আমাদের দেশের কথায়। সমাজতন্ত্রকে ভয় কেন? তা'হলে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসহ সেই সংবিধান কেন ফিরিয়ে আনলেন? আনলেন তো আনলেন, কিন্তু তাতে ১ম স্বৈরাচারের কুকীর্তির চিহ্ন রেখে দিলেন। ২য় স্বৈরাচারের রাষ্ট্র ধর্ম রেখে দিলেন। এটা তো ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অবশ্যই সাংঘর্ষিক। মহামান্য হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকরা এ ব্যাপারে নিরব কেন? যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও নৈতিকতার প্রশ্ন তো এখানে আসবেই যতদিন না উত্তরণ ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে সবাই আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাঁর ভাষণ শুনি, ছবি দেখি, তাঁর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। কিন্তু কীভাবে তা হবে তা কি জানি আমরা? ৬-৭% প্রবৃদ্ধি যে ডাবল ডিজিটে ওঠানো সম্ভব ছিল তা নিয়ে কি কেউ ভেবে দেখেছেন? ভাবেননি এবং অদূর ভবিষ্যতে ভাববেন বলেও মনে হয় না। চীনের মানুষ পারলো আর আমরা পারলাম না। ওরা সংস্কার শুরু করেছিল ১৯৭৮ এ, আর আমরা বঙ্গবন্ধু-উত্তর সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৫ এ। অবশ্যই দু'সংস্কারের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে বৈ কি! আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের কু-পরামর্শে রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো বাদ দিয়ে, অবজ্ঞা করে তথাকথিত কাঠামোগত সংস্কারের নামে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে ধ্বংস করা হয়েছিল, দুর্বল করা হয়েছিল। ছিল না আমাদের দক্ষ জনশক্তি। অথচ চীনের ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত (এখনও আছে)। সর্বোপরি, চীনের ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও দেশপ্রেমী জনশক্তি যা তৈরী করেছিল সমাজতন্ত্র। সেই ১৯৪৯ সালের বিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে তারা এ কাজটি করেছিল (জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা)।

অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের শাসকগোষ্ঠী সমাজতন্ত্র কথাটি ভুলেই গেছেন, অথবা লজ্জাবোধ করেন সমাজতন্ত্র কথাটি উচ্চারণ করতে। অন্য তিনটি মৌলিক নীতি যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কালে-ভদ্রে উচ্চারণ করলেও সমাজতন্ত্রকে তারা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। সমাজতন্ত্র ছাড়া কি মৌলনীতির কথা বলা যায়, না সম্ভব? মনে রাখতে হবে, স্লোগান, আর বক্তৃতা করে সোনার বাংলা গড়া যাবে না। সোনার বাংলা গড়তে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে আসতে হবে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথে আসতে হবে। তবে অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে তা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সংসদের মাধ্যমে পরিবর্তন এনেছিলেন, রক্তাক্ত কোনো পথে নয়।

২। মালিকানার নীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় খাতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা হইবে নিম্নরূপ:

“ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় মালিকানা;

খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।” (৪, পৃ: ৫)।

সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে, আমাদের দেশে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত থাকবে। এ খাত হবে গতিশীল, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে। বঙ্গবন্ধু এ খাতের শুভ সূচনা করেছিলেন ১৯৭২ সালে বড় বড় শিল্প

প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণের মাধ্যমে। অথচ বঙ্গবন্ধু উত্তর সামরিক স্বৈরাচার সাম্রাজ্যবাদীদের কথামত ক্রমান্বয়ে পরিকল্পিতভাবে সরকারি খাতকে দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করে। তথাকথিত বেসরকারিকরণ নীতির আওতায় তারা ভাল ভাল লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণ করলেও লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণ তো করে-ই নি, সরকারি খাতে রেখে আধুনিকায়নের মাধ্যমে পরিচালনারও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আসলে আমাদের দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যেক্তারা লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর পরিবর্তে এগুলোর জমি, যন্ত্রপাতি বিক্রি করে, ধনী হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি এবং অনৈতিক কাজ। তারা এভাবে অর্জন করা টাকা নতুন আরও বেশী লাভজনক খাতে বিশেষ করে পোষাক শিল্প, রিয়েল ষ্টেট, পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাংক-বীমা গড়ে তোলার কাজে বিনিয়োগ করে। সরকার তাদেরকে এ কাজে অনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে। ফলে রাষ্ট্রীয় খাত অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বেসরকারি খাত শক্তিশালী হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের বেসরকারি খাত সরকারি খাতের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। এমনিতে কি আর আশির দশকে সরকারি ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপী হয়। আমরা জানি তাদের এ ঋণ অবলেপন করা হয়েছে। সরকার লাভজনকভাবে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালানোর কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবাধে লুট-পাটের সুযোগ করে দিয়ে স্বৈরাচার নিজেদের ভবিষ্যত গুছিয়েছে: গড়ে তুলেছে নিজস্ব ব্রান্ডের রাজনৈতিক দল, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। শুরু হয় নেতা ক্রয়-বিক্রয়ের অপ-রাজনীতি যা সৎ, ত্যাগী ও দেশপ্রেমী রাজনীতির বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। স্বৈরাচারের পতনের পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে মহাজোট ক্ষমতায় আসার ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও, আবার ২০০১ এর নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাতিল করে দেয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে মহাজোট পুনরায় ক্ষমতায় এসে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বেসরকারিকরণকৃত বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক পুনরায় সরকারি খাতে নিয়ে নেয় নানা অনিয়মের অভিযোগে। নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক তারা বন্ধ বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক পুনরায় চালু করে। তবে বেসরকারি খাতকে বেশী সুবিধা দেয়ার কাজটি এরাও পূর্বের মতো অব্যাহত রাখে। অথচ সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রীয় খাতকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় খাতকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে তা একটি ছোট্ট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বহ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকলীন বিরোধী দলের জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের সময় যদি রাষ্ট্রায়ত্ব পরিবহণব্যবস্থা, রেলপথ সচল না থাকতো তা'হলে রাজধানী ঢাকার সাথে গোটা বাংলাদেশের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হতো বিরোধী দল। কারণ অন্যান্য পরিবহণ সংস্থার মালিক তাদেরই সমর্থক লুটেরা গোষ্ঠী। আসলে শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের উপস্থিতি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত জরুরি। কারণ এটা বেসরকারি খাত কর্তৃক জনগণকে তথা দেশকে জিম্মি করার বিরুদ্ধে একটা মহাপ্রতিশোধক (Great Deterent) হিসেবে কাজ করে উপরের উদাহরণ তারই প্রমাণ।

৩। আমাদের সংবিধানে কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির বিষয়ে স্পষ্ট বলা আছে। এর দ্বিতীয় ভাগের ১৪-শ ধারায় বলা আছে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" (৪, পৃ: ৫)। এ কাজটা থেকে যে আমাদের দেশ বহু দূরে অবস্থান করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বল্প বেতন, বেতন বাকী রাখা, গুন্ডা দিয়ে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি বেসরকারি খাতের শিল্পগুলোতে বিশেষ করে, পোষাক শিল্পে এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেজন্যে মাঝে মাঝেই এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে

সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসছে, ভাংচুর করছে। সরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানেও বিশেষ করে পাট শিল্পে মাঝে মধ্যেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। আর জনগণের অনগ্রসর অংশের মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় তো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি লেগেই আছে। জীবনযাত্রার মানের সূচকের সাথে সংগতি রেখে বেতনভাতাসহ সব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে– এটাই আন্তর্জাতিক নিয়ম। অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতের মালিকরা এটা করে না বলেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকার এর নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারে না বলেই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। চীনে এরকম ব্যবস্থাই আছে। যে কারণে সেখানের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ।

৪। মৌলিক চাহিদা বা অধিকার পূরণের ব্যাপারে সংবিধানে বলা হয়েছে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গঁত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
গ) যুক্তিসঙ্গঁত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।" (৪, পৃ: ৫)।

স্বাধীনতার ৪৬ বছরে মৌলিক অধিকারগুলোর কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে বটে; তবে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে আছি আমরা। আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, প্রতিটি মানুষ তিনবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পারছে? পারি কি বলতে যে, সবাই ভাল বস্ত্র পাচ্ছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে সবার, শিক্ষা পাচ্ছে সবাই, প্রত্যেকে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে, এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে? নিঃসন্দেহে এর একমাত্র উত্তর হবে: না, পারি না। সবাইকে কি সরকার কাজ দিতে পেরেছে? এটা পারলে তো বাকী মৌলিক অধিকারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যেত। এখনও যখন খোদ রাজধানী ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে ভিক্ষুকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, গাড়ীর চারদিকে (সিগনালে) ভিক্ষুক ও ফেরিওয়ালার ভীড় জমে জীবন বাজী রেখে, যখন দেখি ছিন্নমূল শিশু-কিশোররা ডাষ্টবিন ও আবর্জনার স্তুপে জীবিকার সন্ধান করছে, বাসের কন্ডাকটর সুপারভাইজার ও হেলপারদের কথা নাই বা বললাম। এদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দেখলে মনটা বিষাদে ভরে ওঠে এবং মনে একটা প্রশ্নেরই উদয় হয়; কবে হবে আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা যেখানে মানুষের উপরোক্ত দুঃখ আর দেখতে হবে না। বর্তমানে যেভাবে চলছে তাতে আদৌ হবে অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় সে ভরসা পাচ্ছি না। যাই হোক সোনার বাংলা তো আর মুখের বানী বা স্লোগান নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কিছু।

কাজের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে সংবিধানে। কাজ কি আছে? কাজ সোনার হরিণ। সরকারি চাকুরীসহ যেকোনো চাকুরীর বিজ্ঞাপন দিলে পদসংখ্যার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী আবেদন পড়ে। অতি ভাগ্যবান কয়েকজন পায়, বেশীর ভাগই পায় না, যারা পায় না তারা হতাশ হয়ে পড়ে, কেউ কেউ আবার পরকালের পথ বেছে নেয়। এ দৃশ্য আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে এই স্বাধীন বাংলাদেশে। অন্যদের কথা বাদ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা, অথচ বেকার-এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই কিশোর-কিশোরীরা,

যুবক-যুবতীরা কত অবদান রাখতে পারতো দেশ গড়ার কাজে, অথচ ঠায় অপচয় হচ্ছে তাদের শক্তি ও মেধা। এরাই তো সমাজের সবচেয়ে দেশপ্রেমী যুবশক্তি। এটা আমাদের দেশের পরিচালকদের অনুধাবন করতে হবে, বুঝতে হবে।

কাজই যেখানে নেই বা অপ্রতুল প্রয়োজনের তুলনায়, সেখানে বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের কথা না বলাই শ্রেয়। ওগুলোতে শুধুই বিত্তবানদের অধিকার। আর তা অত্যন্ত ভালভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। এভাবে কি বৈষম্যহীন ও সমতার বাংলাদেশ গড়া যাবে?

সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে সংবিধানে। সামান্য কিছু টাকা-পয়সা (প্রয়োজনের তুলনায় সাগরে জলকণার মত) দিলেই কি নিরাপদ জীবনযাপন সম্ভব অসহায় মানুষগুলোর পক্ষে?

৫। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র সংবিধানে বলা হচ্ছে: "রাষ্ট্র, ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" (৪, পৃ: ৫)।

৪৬ বছর বয়সী একটি দেশ এখনও দেশকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারেনি। ধর্ম শিক্ষা যেখানে প্রাধান্য পেয়ে আসছে, সেখানে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা হবে কীভাবে? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির আকুতি সেখানে অরণ্যে রোদনের মতই শোনায়। আর দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা যে কতবার ভঙ্গ হয়েছে তা এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। দেশের সিংহভাগ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানহীন রেখে আর যা-ই হোক সোনার বাংলার কথা ভাবা যায় না।

সুযোগের সমতা প্রসঙ্গে সংবিধানে লেখা আছে: "১৯। ১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। ২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ–সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" (৪, পৃ: ৬)।

আসলে সমতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সুষম উন্নয়ন এ ধরনের শব্দগুচ্ছ আমাদের অভিধান থেকে কবে যে বিদায় নিয়েছে আমাদের অজান্তে তা আমরা টেরও পাইনি। আর মহিলাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও সুযোগের সমতার কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে: "২০। ১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" - এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্ট করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক- সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। " (৪, পৃ: ৬)।

এ ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না: প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ কি কাজ পাচ্ছে? যারা পাচ্ছে তারা সবাই কি যোগ্যতার নিরিখে পাচ্ছে? দুর্নীতি কি নিয়মে পরিণত হয়নি নিয়োগের ক্ষেত্রগুলোতে? দুর্নীতির মাধ্যমে যোগ্যদের পরিবর্তে অযোগ্যরা নিয়োগ পেলে সমাজে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে যায়, সমাজ মানসিকভাবে দরিদ্র হতে বাধ্য হয়। আর অনুপার্জিত আয়ের প্রসঙ্গে শুধু একটি কথা বলা-ই যথেষ্ট হবে: আমার মনে হয় আমাদের সমাজে উপার্জিত আয়ের (সৎ আয়) চেয়ে অনুপার্জিত (অসৎ আয়) আয়-ই বেশী। মাঝে মধ্যে দু'একজন এরকম অনুপার্জিত আয়ের মালিক ধরা পড়লে আমরা জানতে পারি তার সৎ আয়ের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী অসৎ আয়। রাষ্ট্র কি এ অনৈতিক প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধের জন্য চেষ্টা করেছে? ভবিষ্যতে করবে? এ রকম অন্যায়, অন্যায্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড বজায় রেখে সোনার বাংলা বিনির্মাণ কি আদৌ সম্ভব? এ প্রশ্ন রাখছি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে।

নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে: "২১। ১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" (৪, পৃ: ৬)।

জনগণের একটা বড় অংশই অজ্ঞতাবসত আইন অমান্যের মত শাস্তিযোগ্য অন্যায় আচরণ করে থাকে। জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনগণকে ভালভাবে অবগত করা। প্রশ্ন হচ্ছে: তারা এ দায়িত্বটি কি আদৌ পালন করেন? ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কতজন? অতি নগণ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই একটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চরণ করেই চলেছেন: "সরকার জনগণের সেবক, শাসক নয়"। আমলাতন্ত্র কি তাঁর কথা আদৌ শোনেন? শুনলে তো ফাইল আটকে থাকার কথা নয়। ফাইল রেখে সেমিনার-ওয়ার্কশপ, অন্যত্র সভা ইত্যাদি করলে তো প্রকল্পে দেরী হবেই। ফাইল আটকে রেখে যদি ঘুষ চাওয়া হয় তাহলে তো কথাই নেই। সর্বনাশ হবেই। আর ক্ষমতা দেখানোর মানসিকতা তো ভয়ংকর গোটা সামাজের জন্য, ব্যক্তির জন্যে। এই তো সেদিনের ঘটনা: খোদ রাজধানী শহরের বুকে স্কুলে ঢোকা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের মধ্যে হাতা-হাতি, মারা-মারি। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় মামলা দিয়ে বুড়ো ডাক্তারকে কিনা জেলে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে, বিআইডবলিউটিএ'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তো দুদকের কর্মকর্তার কাছে ঘুষ নেয়ার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যার অতি সামান্যই আমরা দেখতে পারছি। জানতে পারছি। সরকারকে এগুলো চিরতরে বন্ধ করতে হবে। কঠোর শাস্তির জন্যে বিধি-বিধান প্রয়োজনে ঢেলে সাজাতে হবে। জিরো টলারেন্সে যেতে হবে। ব্যাংকে অনিয়ম করে দুর্নীতি করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পার পেলে তো দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যাবে। সরকার কি তা চায়? নৈতিকতা, ন্যায্যতায় আস্থা রাখলে ভাল। অন্যথায় সোনার বাংলা বিনির্মাণ হবে না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে আমাদের সংবিধানে লেখা হয়েছে: "২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" (৪, পৃ: ৬)

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা "নিশ্চিত করিবেন"। প্রশ্ন হচ্ছে: রাষ্ট্র কি তা করেছেন? করবেন বলে মনে হয়? তা যদি না হয়, তা'হলে প্রশাসনযন্ত্রের সাথে বিচারবিভাগের দ্বন্দ্বে অধঃস্তন আদালতগুলোর শৃংখলা বিধি নিয়ে গেজেট প্রকাশে এতবার সময় নেয়ার মত তালবাহানা করাটা হতো না। প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবে বলেছেন: রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমঝোতার মনোভাব থাকতে হবে। সবাই সার্বভৌম। কেউ

কারো অধীনস্ত নয়। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতার মনোভাব এবং সবরকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে কাজ না করলে সোনার বাংলা বিনির্মাণ অসম্ভব।

চার

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হতে হবে সমন্বিত। আমাদের দেশে প্রায়সই এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে। উদাহরণ: আগে রেল ও নৌ-পথের উন্নয়ন না শিল্প-কারখানা গড়ে তুলবো। নিশ্চয়ই রেল ও নৌ-পথ এবং বিদ্যুতের কারখানা। এমন ঘটনার কথা আমরা প্রায়ই শুনি যে, কারখানা হয়ে গেছে, বাড়ী হয়ে গেছে, কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: উন্নয়নটা হতে হবে টেক্‌সই। একবার হয়ে থেমে গেলে চলবে না। উদাহরণ: এবারের হাওরের বাধে ধ্বস! অমনি বন্যা। অমনি ১০ লাখ টন চালের ঘাটতি। অমনি চাল আমদানী! এর আগে চাল রপ্তানীর মত প্রহসনও হতে দেখলাম আমরা। এটাকে কি টেক্‌সই উন্নয়ন বলবো আমরা? নৈতিকতা কি বলে? বাধ কি পুনঃনির্মাণ হয়েছে? এপ্রিলের আর কয়মাস বাকী? বাধটা কি আরও এক মিটার উঁচু করা যায় না? শাস্তি কি পেয়েছে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজরা? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া জরুরি। ব্যবস্থা নিতেই হবে এবং তা হবে অতি কঠোর, কঠোরতম। কারণ বিষয়টি সোনার বাংলা বিনির্মাণের সাথে ওৎপ্রোৎভাবে সংশ্লিষ্ট।

দুর্নীতি সর্বত্র। টাকা ছাড়া কোনও কাজই হয় না। এটা জনগণের কথা। লাইসেন্স, পাসপোর্ট থেকে আরম্ভ করে গ্যাস-বিদ্যুত-পানি-টেলিফোনের সংযোগ, নকশা অনুমোদনসহ সবকিছুতেই অবৈধ টাকার লেন-দেন। আর নিয়োগ-বানিজ্য এখন অভিধানে নতুন শব্দ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এই ডিজিটাল যুগে আবার নতুন ধরনের প্রতারণা, অবৈধ লেনদেন ও ডিজিটাল কারচুপির কথাও শোনা যাচ্ছে। সব ধরনের প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। শিথিলতার কোনও স্থান হবে না এখানে। প্রয়োজনে আরও কঠোর নতুন আইন করুন এবং ব্যবস্থা নিন। কাজ শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে। পারবেন কি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা?

বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপে কাজ হবে না। কাজ হতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন, সুসমন্বিত। ক্ষুদ্র-বড় সবরকম গাফিলতিতে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। একমাত্র এটা নিশ্চিত করতে পারলেই বৈষম্যমুক্ত, সমতাধর্মী সমাজ তথা সমাজতন্ত্র তথা জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণ বাস্তবরূপ লাভ করবে।

তথ্যসূত্র

১. Planning Commission, GOB, The 7th Five Year Plan FY 2016-FY 2020, Dhaka, 2015

২. BBS, MOP, Statistical Year Book Bangladesh 2015, Dhaka.

৩. BBS, MOP, Year Book of Agricultural Statistics 2015, Dhaka, 2016.

৪. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা ২০১১।

৫. বারকাত আবুল, অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য, মুক্তিবুদ্ধি, ঢাকা, ২০১৭ ।

৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা, ২০১৬-২০১৭।

৭. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলাদেশে উন্নয়ন ভাবনা: তত্ত্ব ও বাস্তবতা, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 31, No. 3.

৮. বারকাত আবুল, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয়, প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনার ২০১৫ তে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

৯. সেন অমর্ত্য, নীতি ও ন্যায্যতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৩।

১০. দৈনিক প্রথম আলো।

১১. দৈনিক সমকাল।

১২. The Daily Star.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 117-162
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

দূষণ অর্থনীতি, নৈতিকতা, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার*

সারকথা: *দূষণ অর্থনীতির ধারণাগত বিশ্লেষণ, দূষণের প্রকরণ, মনুষ্য সৃষ্ট কারণে সমগ্র পরিবেশের উপর বিরূপ ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়, এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ অর্থনীতি ও প্রতিকূল পরিবেশের দরুন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমতায়ন ও উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। দূষণের উৎস, কারণ, ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা কিভাবে, কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তা এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে দূষণ পরিবেশ এবং ভারসাম্য উন্নয়নে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এর মাত্রাগত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতায়নের জন্য দূষণ নীতির প্রয়োগযোগ্যতা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন-সফলতা-ব্যর্থতা আছে কি নেই এ সবই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। মূলত দূষণ অর্থনীতি ও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার জন্য দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে করণীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচি কি হতে পারে তা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে, রয়েছে পরিবেশ উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ।*

১. ভূমিকা

পরিবেশের ভৌত উপাদান মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি কোনো কারণে গ্রহণযোগ্য পরিমিত পরিমাণ বা আন্তর্জাতিক মান থেকে বেশি বা কম পরিবর্তিত হয়ে মানুষ ও জীবের ক্ষতির কারণ হয়। অর্থনৈতিকভাবে এ ধরনের দূষণ প্রক্রিয়া কার্যকরণ হলে তাকে দূষণ অর্থনীতি (Economics of pollution) বলে। এই অর্থনৈতিক দূষণ কার্যক্রম মানুষের সৃষ্ট। প্রাকৃতিক কারণে দূষণের প্রায় পুরোটাই প্রাকৃতিকভাবে পরিশোষিত হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সৃষ্ট দূষণ অর্থনীতির মাত্রা মূলত মনুষ্য সৃষ্টির কারণে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশের অনেক স্থানে জীবনযাপন করা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন যেসব বাইরের বস্তুর অংশ বা পরিবেশের নিজস্ব উপাদানের অতিরিক্ত অংশ বায়ুর সাথে মিশে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে, সৌন্দর্যহানি বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে এমন সংক্রামক বস্তুগুলো

* প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, শান্তিবাগ, ঢাকা।

বা এদের অংশকে আমরা দূষক (pollutant) বলি। দূষক দ্বারা রোগ ব্যাধি সৃষ্টি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করাকে দূষণ (pollution) বলে। এই দূষক ও দূষণ মিলে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। আর মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার এবং ক্ষতিগ্রস্তের কল্যাণে ক্ষতিকারকদের করণীয় পদক্ষেপ ও সম্ভাব্য কর্মসূচি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

১. দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশের অভারসাম্য সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান, নৈতিক অবক্ষয় ও ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ।

২. দূষণের বিভিন্ন প্রকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ এবং দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা, পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৩. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীলদেশের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং দূষণ মুক্ত পরিবেশ রক্ষায় প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নের জন্য প্রয়োগযোগ্য করণীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ।

৩. দূষণের উৎস ও ক্ষতিকর প্রভাব (Sources of pollution and harmfull effects)

৩.১. দূষণের উৎস (Sources of pollution)

দূষণের উৎস মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত, মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট, নির্গম গ্যাস ইত্যাদি। সর্বজনস্বীকৃত দূষণের উৎস মূলত মানুষ এবং মানুষের সৃষ্ট অনৈতিক কার্যক্রম। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ প্রকারের দুষক শনাক্ত করা হলেও সেগুলো পৃথক করা এবং স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে আলোচনা করা সহজ নয়, এজন্য দূষকগুলোকে তিন ধারায় পৃথক করা যায়।

১. উৎপত্তি অনুসারে দূষক (Pollutant on the basis of origin)

(ক) প্রাকৃতিক উৎপত্তি: প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা, আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস, মাটির বায়ুজনিত প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থগুলো, উদ্ভিদজাত বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব পদার্থ, স্বতন্ত্র জৈব পদার্থগুলো পচনের ফলে সৃষ্ট জৈব পদার্থ, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর নাক থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, দাবানল জাত কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফুলের বিভিন্ন ধরনের পরাগরেণু থেকে পরিবেশ দূষিত হয়।

(খ) মানুষ থেকে উৎপত্তি দূষক;

(অ) উত্তাপ: তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানা থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে মানুষের দেহের উপর প্রভাব ফেলে। **(আ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ:** বিভিন্ন পারমাণবিক চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়ে সব রকমের প্রাণি ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে। **(ই) গ্যাসীয় দুষক:** কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়াবার ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। **(ঈ) কঠিন কণিকা:** বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও খনি থেকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণিকাগুলো বাতাসে ভেসে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে ক্ষতি সাধন করে।

২. প্রকৃতিভিত্তিক দূষকের ধরন (Pattern of pollutant on the basis of nature)

(ক) গ্যাসীয় দুষক- CO, CO_2 এবং বিভিন্ন হাইড্রো কার্বন, ফ্লুওরো কার্বন, SO_2, H_2SO_4, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড যৌগ, বিভিন্ন অ্যালডিহাইড যৌগ গ্যাসীয় দুষক হিসেবে কাজ করে।

(খ) কণিকা ধর্মী দুষক-এরোসল, বিস্ফোরণ জাত পদার্থ, ধোঁয়া, পরাগরেণু, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে দূষক হিসেবে কাজ করে।

৩. নির্গমনের ভিত্তিতে দূষক (Pollutant on the basis of emission)

নির্দিষ্ট উৎস থেকে সরাসরি নির্গত হয়ে অথবা বায়ুমণ্ডলের কোনো মূল পদার্থ দুষকে রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশ দূষিত করে। যেমন,

(ক) **প্রাকৃতিক দুষক-**CO, CO_2, SO_2 প্রভৃতি দুষক প্রাকৃতিকভাবে নির্গত হয়ে অথবা মানুষের কার্যাদির ফলে লাভ করে পরিবেশ দূষিত করে।

(খ) **গৌণ দুষক-**বায়ুমণ্ডলীয় যৌগগুলোর অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার প্রভাবে H_2, SO_4HNO_3 প্রভৃতি দুষক উৎপত্তি লাভ করে।

৩.২. বায়ু দূষণ (Air Pollution)

নাইট্রোজেন (৭৮.০৯%), অক্সিজেন (২০.৯৪%), কার্বন ডাই-অক্সাইড (০.৩%) ছাড়াও স্বল্প পরিমাণ আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, ক্রিপটন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মিশ্রণে বায়ু। বায়ুর উপস্থিতির জন্যই পৃথিবীতে প্রাণি, উদ্ভিদ প্রভৃতি জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। বায়ুর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মাধ্যমে বায়ুর বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে বায়ুতে বাইরের কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ অনুপ্রবেশ করলে এবং বায়ুর নিজস্ব উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ু দূষণ হয়। এতে বায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জীবজগৎ ও সম্পদ-সম্পত্তির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাইরের উপাদান ও নিজস্ব উপাদানের অতিরিক্ত পরিমাণ বায়ু থেকে দূর হয় এবং বায়ুতে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বাইরের উপাদানের অত্যধিক মিশ্রণ হলে বায়ুর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আশানুরূপ হয় না; ফলে পরিবেশ বিপন্ন হয়। গাড়ির কালো ধোঁয়া বায়ু পরিবেশকে দূষিত করে এবং স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

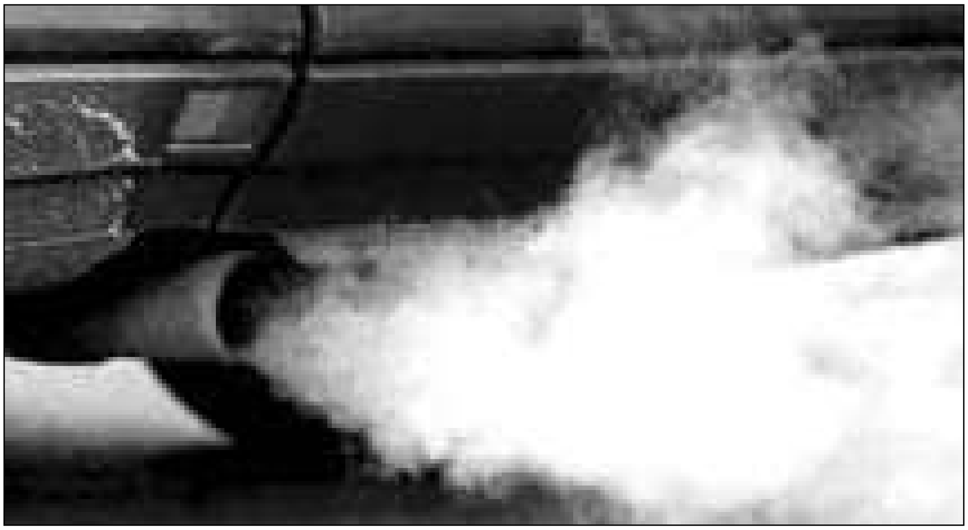

চিত্র ১ : গাড়ির কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের প্রধান দু'টি উৎসগত কারণ উল্লেখ করা যায়।

১. **প্রাকৃতিক উৎস থেকে বায়ু দূষণ** (Air pollution from natural sources)**:** আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বনভূমিতে অগ্নিকাণ্ড (দাবানল), মাটি, সমুদ্র, পচনশীল প্রাণী ও উদ্ভিদের আধিক্য, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি বায়ু দূষণের প্রাকৃতিক উৎস। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সালফার অক্সাইড (SO_2) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণা নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বনভূমিতে দাবানল সৃষ্টির ফলে কার্বন মনোঅক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) এবং পোড়া কাঠের কণা বাতাসে মিশে যায়। মাটির ভাইরাস ও ধূলিকণা, সমুদ্রের লবণকণা, মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3, Cl), মিথাইল ব্রোমাইড (CH_3Br) এবং মিথাইল আয়োডাইড (CH_3I), জীবিত উদ্ভিদ থেকে পরাগরেণু, হাইড্রোকার্বন, ছত্রাক, স্পের, চুল, ফেদার প্রভৃতি, পঁচনশীল মৃত উদ্ভিদ থেকে মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন সাইফাইড (H_2S), ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে ধূলিকণা বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

২. **মানব সৃষ্ট উৎস থেকে বায়ু দূষণ** (Air pollution from man made sources): মানুষ নিজেই দুষক হিসাবে কাজ করে। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে বায়ু দূষণকে মনুষ্য সৃষ্ট বায়ু দূষক (authropogenic air pollution) বলে। মনুষ্য সৃষ্ট উৎস দুই প্রকার।

(১) **স্থির উৎস** (Static sources)**:** তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, রিফ্রিজারেটর, আবর্জনা পোড়ান, কাঠ পোড়ান, প্রভৃতি দূষণের স্থির উৎস। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে SO_x, NO_x, CO, CO_2 কয়লা কণা, ধোঁয়া, ছাইকণা প্রভৃতি, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে Sr-90, Cs-137, C-14 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় গ্যাস, আয়োডিন-১৩১, আরগণ-৪১, রেডন প্রভৃতি ফ্লুরাইড; বিভিন্ন প্রকার কারখানা থেকে CO, SD_x, NO_x, হাইড্রোকার্বন, H_2S, NH_3, বাষ্প, গন্ধ, ধূলিকণা, ধোঁয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য প্রক্রিয়া করণের সময় CO, SO_x, NO_x, NH_3, জৈব ফসফেট, ধূলিকণা, বাষ্প, অ্যাজবেষ্টাস, কুয়াশা, কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়া করণের সময় SO_x, ক্লোরিনেটেড হাইড্রো কার্বন, ধোঁয়া, ধূলিকণা, বাষ্পকণা, রেফ্রিজারেটর মেরামতের সময় ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, ক্লোরিন, ব্রোমিন; পৌর প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা পোড়াবার সময় CO, CO_2, SO_y, NO, NO_3 জৈব ফসফেট, ধোঁয়া, বাষ্পকণা, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস প্রভৃতি পোড়াবার সময় CO_2, CO, H_2S ধোঁয়া নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত করে।

(২) **সচল উৎস** (Mobile sources): সব ধরনের পরিবহণ মাধ্যমগুলো বায়ু দূষণের প্রধান উৎস। সড়ক পরিবহণে ব্যবহৃত বাস, ট্রাক, কার, CNG চালিত অটোরিক্সা, বেবী ট্যাক্সি প্রভৃতি; রেলপথে পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত যাত্রীবাহী রেলগাড়ি, মালবাহী রেল গাড়ি, পানিপথে পরিবহণের ব্যবহৃত ষ্টীমার, লঞ্চ, জাহাজ, ইঞ্জিনচালিত নৌযান, আকাশ পথে পরিবহণে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ, কংকর্ড প্রভৃতিতে ব্যবহৃত জ্বালানী থেকে CO, CO_2, H_2S, SO_x, NO_x হাইড্রো কার্বন পারদ, সীসা ধোঁয়া প্রভৃতি নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত করে।

কিভাবে বায়ু দূষণ হয়?

বায়ু দূষণ প্রক্রিয়া অনেকটা পর্যায়গতভাবে হয়।

(ক) প্রাথমিক বায়ু দূষক (Primary air pollutions): প্রাকৃতিক উৎস এবং মানুষের সৃষ্ট উৎস থেকে সরাসরি বায়ু দূষিত হওয়াকে প্রাথমিক বায়ু দূষক বলে। CO, CO_2, SO_x, NO_x ধোঁয়া, ধূলিকণা, ভাইরাস, পরমাণু, ফ্লাই-অ্যানা প্রভৃতি প্রাথমিক দূষকের অন্তর্গত।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক (Secondary air pollutions): প্রাথমিক বায়ু দূষক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দুষকগুলো উৎপত্তি লাভ করে। সৌর আলোকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ফলে বায়ুতে একাধিক প্রাথমিক বায়ু দূষকের পারস্পরিক বিক্রিয়ায়, অথবা প্রাথমিক দূষকগুলোর সাথে বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের বিক্রিয়া অথবা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের বিক্রিয়ায় অথবা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের দুটি উপাদানের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন প্রকৃতির দূষককে দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক বলে। উৎপাদকের প্রাথমিক বায়ু দূষকের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষকগুলো অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করে। ওজোন, সালফিউরিক অ্যাসিড, ধোয়াশা, পার অক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক।

আবার বায়ু দূষকগুলোকে সজীব বায়ু দূষক এবং অজীব বায়ু দূষক নামে উল্লেখ করা হয়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরাগরেণু প্রভৃতি যে সব দূষকের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোকে সজীব বায়ু দূষক (Biotic air pollutant) বলে। কিন্তু যে সব বায়ু দূষকের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব নেই সেগুলোকে অজীব বায়ু দূষক (Abiotic air pollution) বলে। CO, CO_2 প্রভৃতি কার্বন যৌগ, অক্সিজেন যৌগ (O), SO_2, SO_3, H_2S মারক্যাপটান প্রভৃতি সালফার যৌগ; NO, NO_2, NO_3, NH_3, N_2O প্রভৃতি নাইট্রোজেন যৌগ; HF, HCl প্রভৃতি হাইড্রোজেন যৌগ, হাইড্রোকার্বন HCHO প্রভৃতি জৈব যৌগ, Sr-90, Cs-134, C-14 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় গ্যাস যৌগ, আলোক রাসায়নিক জারক প্রভৃতি গ্যাস ও বাষ্প জাতীয় দূষক। এছাড়া এ্যারোসল একটি উল্লেখযোগ্য অজীব দূষক।

বায়ু নিসরণ এর মাধ্যমে আণুবিক্ষণিক মাইক্রণ থেকে ১০০ মাইক্রণ পর্যন্ত কঠিন বা তরল সিরণ দশায় আঠালো পদার্থকে অ্যারোসল (Aerosol) বলে। জৈব ও অজৈব পদার্থের ঘর্ষণের মাধ্যমে অথবা চূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ধুলিকণা (dust) উৎপন্ন হয়। ১ থেকে ২০০ মাইক্রণ বিশিষ্ট ফ্লাইঅ্যাশ ৫০ থেকে ১৫০ মাইক্রণ বিশিষ্ট সিমেন্ট কণা এই জাতীয় বিভিন্ন দাহ্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম কণার বায়ু নিঃসরণে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। ০.০১ থেকে ০.২ মাইক্রণের কয়লার ধোঁয়া কণা, ০.০১ থেকে ১.০ মাইক্রণের তেলের ধোঁয়াকণা ধোঁয়ার অন্তর্গত। অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের তরল কণার লঘু বায়ু বিসরণে হালকা কুয়াশা (mist) উৎপন্ন হয়। জলীয় বাষ্প থেকে প্রাকৃতিক হালকা কুয়াশা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে তরল বা কঠিন কণার বায়ু নিরসণে সৃষ্ট অ্যারোসলকে ঘন কুয়াশা (fog) বলে। ১ থেকে ৪০ মাইক্রণ বিশিষ্ট পানিকণা বা বরফকণা ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকলে তাকে ঘন কুয়াশা বা ফগ বলে।

কার্বন সমৃদ্ধ জীবাশ্ম জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন মনো অক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। মোটর যান থেকে নির্গত গ্যাস, বৈদ্যুতিক এবং ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে নিসৃত গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস, কয়লা পানি থেকে নিসৃত গ্যাস, গ্যাস তৈরির জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস এই শ্রেণির অন্তর্গত।

গন্ধক (সালফার) যুক্ত কয়লা, সালফারযুক্ত গ্যাস এবং হাইড্রোকার্বন তেলের দহনের ফলে সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) এবং সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়। তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মোটর যান থেকে নিসৃত গ্যাস, ধাতু সংক্রান্ত (zn, Cu, Ph) ক্রিয়া প্রণালীতে নিসৃত গ্যাস, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস, কাগজ তৈরি জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস এই জাতীয়।

অবায়ুবীয় জীবের পচন, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি, প্রাকৃতিক ঝর্ণা, মল জোনিত্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, কোক কয়লা চুল্লী জোনিত্র, রেওন জোনিত্র প্রভৃতি থেকে পচা ডিমের মত দূর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস হাইড্রোজেন সালফার (H_2S) নামে পরিচিত। H_2S ব্যতীত মিথাইল ম্যাগক্যাপটান (CH_2SH), ডাই মিথাইল সালফাইড (CH_3SCH_3) এবং ডাই মিথাইল ডাই সালফাইড (CH_3SS CH_3) প্রভৃতি দূর্গন্ধ যুক্ত সালফার দূষক বায়ু দূষণ করে।

বায়ু দূষণকারী নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) এবং ট্রাই-অক্সাইড (NO_3) অন্যতম। স্বয়ংক্রীয় মোটরযান থেকে নিসৃত গ্যাস, শক্তি উৎপাদক জোনিত্র, ফার্নেস এবং হিট বার্নার থেকে নিসৃত গ্যাস, নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী জোনিত্র থেকে এ জাতীয় গ্যাস নিসৃত হয়।

বায়ু দূষণকারী ক্লোরিন (Cl_2) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) সিউয়েজ জোনিত্র, সাতার প্রশিক্ষণ ছোট জলাশয় পানি বিশোধন জোনিত্র এবং ক্লোরিন উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী জোনিত্র থেকে ক্লোরিন গ্যাস নিঃসৃত হয় এবং রাসায়নিক শিল্প থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নিঃসৃত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে।

ওজোন (O_3) একটি বিষাক্ত ও গন্ধযুক্ত গ্যাস। প্রধানত দহনের ফলে উৎপন্ন নাইট্রেজেন ডাই-অক্সাইড এবং সূর্যালোকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ফরম্যাল ডিহাইড (HCHO) থেকে বায়ু দুষণকারী অ্যালডিহাইক (-CHO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। গ্যাসোলিন, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পিচ্ছিল কারন তেল ও মোটর গাড়ির জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন এবং দিনের বেলায় বায়ুতে আলোকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

বায়ু দূষণের প্রভাব (Effects of air pollution)

বায়ু দূষণের প্রভাবকে (ক) জীবের উপর প্রভাব এবং (খ) অজীব বস্তুর উপর এ নামে দুভাবে উল্লেখ করা যায়। জৈবিক প্রভাবকে (Biological effects) আবার (অ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, (আ) প্রাণীর উপর প্রভাব এবং (ই) উদ্ভিদের উপর প্রভাব এই তিন ধরনের উল্লেখ করা যায়।

(অ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect on human health): এরূপ প্রভাব মূলত তিন ধরনের হয়।

১. মানুষের উপর বায়ু দূষণের বিপদ শঙ্কুল প্রকট (Expousure on human health by air pollution)

(১) **শ্বসন জনিত প্রকট** (Exposure): মানুষ যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করে তখন বায়ুর সাথে দূষক গ্যাস, ক্ষুদ্র কণা, ধূলা, পরাগরেণু, ছত্রাক প্রভৃতি দুষক নাক শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে স্থায়িভাবে অবস্থান নেয় এবং ক্রমে রক্ত ও অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে মানুষের

দেহের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর দেখা যায়। এতে স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাবের কারণে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি করে।

(২) **অঘ্রাণজনিত প্রকট** (Nonsmelling expousure): দূষক গ্যাস, গন্ধ সৃষ্টিকারী কণা ও উদ্বায়ী পদার্থ (fame) নাকের শ্লেষ্মা আবরণীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে দেহের ক্ষতি সাধন করে এবং রোগী শেষ্মাজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হয়।

(৩) **সংস্পর্শ জনিত প্রকট** (Contactional exposure): দেহের অনাবৃত অংশের ত্বক, মুখমণ্ডল, ঠোঁট ও চোখ বায়ু দূষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ত্বক জনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

২. **বায়ু দূষণের কাজের প্রক্রিয়া** (Working process of air pollutant): কোষীয় স্তরে বায়ু দূষক তিনটি প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

(১) **এনজাইম (Enzyme) সক্রিয়তা পরিবর্তন করে:** কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মানবদেহে প্রবেশ করে স্বাভাবিক সক্রিয়তা পরিবর্তন করে বায়ু দূষক কলাকোষের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

(২) **কোষের অণুর সাথে যুক্ত হয়ে:** কোষের অণুর সাথে কিছু দূষক যুক্ত হয়ে দেহের রাসায়নিক ভারসাম্যে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন, কার্বন মনোক্সাইড (CO) লাল রক্ত কণিকার রঞ্জক উপাদান হিমোগ্লোবিনের (Hemoglobin) সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহণে বাধার সৃষ্টি করে।

(৩) **ক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে:** কয়েকটি বিশেষ ধরনের বায়ু দূষক কোষে খারাপ প্রভাব সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে। যেমন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বিশেষ নার্ভের কোষকে উদ্দীপিত করে, এপিনেফ্রিন নিঃসরণ ঘটায়। এপিনেফ্রিন বেশি পরিমাণে নিঃসরণ হলে যকৃত কোষ (hapaic cyst) নষ্ট করে।

৩. **বায়ু দূষকের বিষক্রিয়ার প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক** (Factros, affecting toxicity of pollutant)

বায়ু দুষকের বিষক্রিয়ায় প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকগুলো হচ্ছে:

(১) **ঘনত্ব ও ক্রিয়াকাল:** বায়ুতে উপস্থিত দূষকের ঘনত্ব ও দূষকের প্রকট কালের স্থায়িত্ব মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষকের প্রভাব নির্ভর করে।

(২) **দূষকের প্রকৃতি:** দূষকের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর দূষণের প্রভাব মাত্রা নির্ভর করে।

(৩) **দূষকের জীব-সক্রিয়তা:** কোষের উৎসেচকের (enzyme) সাথে বায়ু দূষকের রাসায়নিক সংবেদনশীলতাকে জীব-সক্রিয়তা বলে, অধিক জীব সক্রিয়তা দুষকগুলো বেশি ক্ষতি সাধন করে।

(৪) **মানুষের বয়স ও লিঙ্গ:** মানুষের বয়সের উপর দূষণ জনিত প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির তুলনায় শিশু ও কিশোরদের উপর বায়ু দুষক অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। আবার পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বায়ু দূষক দ্বারা অধিকমাত্রায় প্রভাবিত হয়। ওজোন (O_3) এবং

সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস পূর্ণ বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের উপর ২ থেকে ৩ গুণ এবং পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপর দ্বিগুণ খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

(৫) **স্বাস্থ্যের অবস্থা:** পুষ্টির অভাব, যে কোনো নেশা করা, ধুমপান, হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের রোগ, প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে। খারাপ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের উপর বায়ু দূষকগুলো সহজে ও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। ধুমপান এক ধরনের বায়ু দূষণ, এর ফলে ফুসফুসে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(৬) **পেশাগত প্রকট:** শ্রমজীবী মানুষ পেশাগত কারণে কর্মস্থলে বায়ু দূষক দ্বারা অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হয়।

(৭) **যৌথ ক্রিয়া:** একাধিক বায়ু দূষক একই সময়ে একই ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেললে বিষক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি হয়।

(৮) **বিরোধিতা:** এক ধরনের বায়ু দূষক দ্বারা প্রভাবিত কোনো একটি এলাকায় নতুন কোনো ভিন্নধর্মী বায়ু দূষক উপস্থিত হলে আগের বায়ু দূষকের মন্দ প্রভাব হ্রাস পায়।

(আ) প্রাণির উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollution on Animal)

বিভিন্ন বায়ু দূষণের প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা উপাখ্যান (episode) এর ফলে পালিত ও বন্য প্রাণির উপর বায়ু দূষণের বিরূপ প্রভাবের তথ্য পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাষ্ট্রের ডোনোযা উপখ্যানের (১৯৪৮) কারণে ১৫ শতাংশ গৃহপালিত কুকুর আক্রান্ত হয়। পেজা রিকা উপাখ্যান (১৯৫০ খ্রি:) হাইড্রোজেন সাইক্রাইডের দ্বারা অসংখ্য গবাদি পশু, শূকর, কুকুর এবং মুরগি মারা যায়। লন্ডন উপখ্যানে (১৯৫২ খ্রি) ৫টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ৫২টি গবাদি পশু মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীনতাপূর্ব অতি শীতপ্রধান এলাকায় এবং বন্যা কবলিত এলাকায় বারংবার গুরুত্ব, ছাগল,

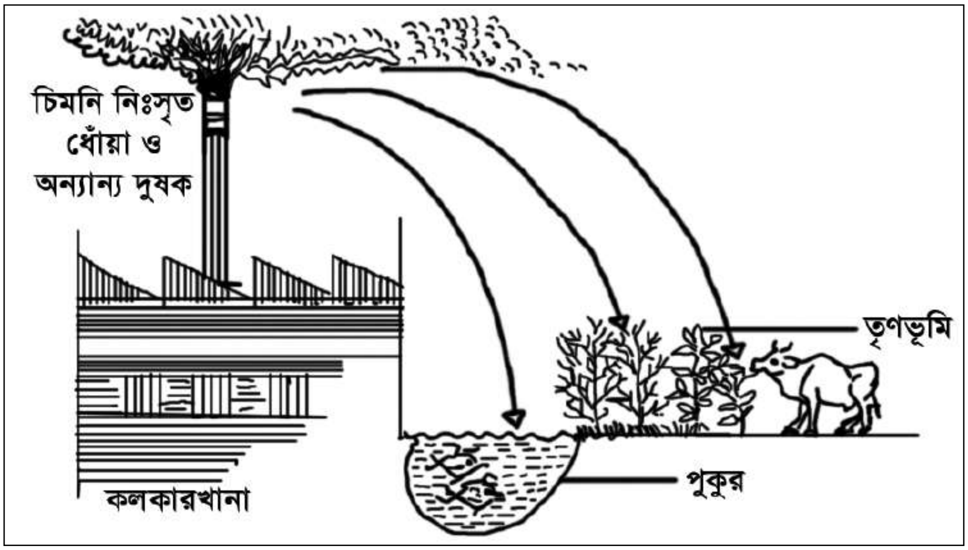

চিত্র ২ : প্রাণির উপর বায়ু দূষকের প্রভাব

ভেড়া, হাঁস মুরগির উপর এরূপ প্রভাব লক্ষ্য করার মত ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বন্যাকবলিত এলাকায় এরূপ প্রভাবের কারণে অনেক পশু ও হাঁস-মুরগি মারা যায়। তাছাড়া, দেশের পশ্চিমাঞ্চল, পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলে পশুর উপর এরূপ প্রভাব ২০০৪-০৫ সালেও দেখা গেছে।

(ক) বায়ু দূষক দ্বারা প্রাণি আক্রান্ত হবার প্রকরণ (Effecting pattern of air pullutant on animal)

১. **ক্ষণস্থায়ী প্রভাবঃ** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ধাতু নিষ্কাশন কারখানা, বয়লার এবং স্বয়ংক্রিয় যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাণির উপর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব পড়ে।

২. **দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবঃ** নির্গত বায়ু দূষক ক্রমে উদ্ভিদের পাতা এবং গবাদি পশুর খাদ্য উপাদানের উপর সঞ্চিত হয়। সংক্রামিত দূষিত খাদ্য আহার করে বিভিন্ন প্রাণি পরোক্ষভাবে দূষক দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় যেমন গাজীপুর, সাভার, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় যে কারখানা থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া ও দূষক দ্বারা বন্য পশু পাখি মারা যেতে দেখা যায়। আবার পাঁখি হাঁস, মুরগির উপর এরূপ মরণ লাগা পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

(খ) প্রাণির উপর বায়ু দূষকের প্রভাব (Effect of air pollutant on animal)

মানুষসহ সব ধরনের প্রাণি বায়ু দূষকগুলো দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। ফ্লুরাইড, আর্সেনিক, সীসা, মলিবডেনাম এবং ওজোন প্রাণির উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী সংক্রামকগুলোর মধ্যে অন্যতম।

সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডঃ সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড থেকে উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড বন্য প্রাণির বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশ বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে; বিশেষ করে মাছের উপর এই অ্যাসিড দ্বয়ের প্রভাব অনেক বেশি।

ওজোনঃ বায়ুতে ওজোন গ্যাসে সংক্রমণের ফলে কুকুর, বিড়াল ও খরগোসের ফুসফুসের বর্ণ পরিবর্তন হয়, ফুসফুস স্ফীত হয় এবং রক্ত ক্ষরণ হয়।

ফ্লুরাইডঃ ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা থেকে উৎপন্ন ফ্লুরাইড বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য উৎসের সংস্পর্শে আসে। ফ্লুরাইড সংক্রমিত উদ্ভিদ খাদ্য আহার করে গবাদিপশু ফ্লুরাইড সংগ্রহ করে।

আর্সেনিকঃ কয়লা ও ধাতব আকরিকের সাথে অশুদ্ধ আর্সেনিক থাকে। ধাতব নিষ্কাশন ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি নিঃসৃত আর্সেনিক কণা বায়ু প্রবাহের সাথে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদের উপর অধঃক্ষেপিত আর্সেনিক গবাদি পশুর উপর ক্ষণস্থায়ি ও দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সীসাঃ ধাতব নিষ্কাশন, কোক চুল্লী ও কয়লার দহনে সীসা বায়ুতে সংক্রমিত হয়। আবার সীসা আর্সেনিক যুক্ত পাউডার এবং স্প্রে মেশিন থেকে সীসা বায়ুতে সংক্রমিত হয়। বায়ুতে মিশ্রিত সীসা প্রাণির উপর ক্ষণস্থায়ি ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্থুলানু বিকিরণঃ বায়ুমণ্ডলে নিউক্লিয়ার বোমা বা পারমাণবিক বোমা বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণের ফলে যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বা স্থুলানু বিকিরণ হয় জীবজন্তুর উপর তার বিষক্রিয়া পড়ে। বিস্ফোরণের সন্নিহিত স্থানে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মানুষসহ সব ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদের মৃত্যু হয়।

(ই) উদ্ভিদের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollution on plants)

বায়ু দূষণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশ বিস্তারের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। বায়ুর সাথে মিশ্রিত সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লুরিন যৌগ এবং ধোঁয়াশা মিশ্রিত থাকে। এই তিনটি উদ্ভিদ দূষক ছাড়াও

ওজোন, পার অক্সিজেন অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN), ফরমাল ডিহাইড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি করে।

উদ্ভিদ-স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollutant on botanical health)

১. **সালফার ডাই-অক্সাইডঃ** এটি একটি অতি পরিচিত বায়ু দূষক বিষ। অধিক ঘনত্বের এই গ্যাস বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। কম ঘনত্বের এই গ্যাস দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

২. **হাইড্রোজেন ক্লোরাইডঃ** এর সংস্পর্শ উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে। ঘনীভূত ক্লোরাইড গ্যাস উদ্ভিদের পাতায় ও কণায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৩. **ধোঁয়াশার প্রভাবঃ** ধোঁয়াশার সাথে ওজোন পার অক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) এবং আলোক রাসায়নিক জারক থাকলে উদ্ভিদের প্রাক পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হয় এবং উদ্ভিদ দ্রুত বেড়ে উঠে।

৪. **উদ্ভিদের উপর অন্যান্য বায়বীয় দূষকের প্রভাবঃ** ক্লোরিন গ্যাস, অ্যামেনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে। সালফার ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা ক্লোরিন তিনগুণ বেশি বিষক্রিয়া ঘটায়। অ্যামেনিয়া টমাটো গাছের ক্ষতি করে। হাইড্রোজেন সালফাইড অতি উচ্চ মাত্রায় মূলা, কুমড়ো প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং সয়াবিনের ক্ষতি করে। ইথিলিনের প্রভাবে এপিন্যাস্টি বক্রতা, ক্লোরোসিস এবং পত্র মোচন প্রভৃতি দেখা দেয়।

আলোক-রাসায়নিক বায়ু দূষণ ও এর প্রভাব (Photo-Chemical air pollution and it effect)

ধোঁয়ার (smake) সাথে কুয়াশা (fog) মিশ্রিত হয়ে ধোঁয়াশার (smag) সৃষ্টি হয়। হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের আলোক-রাসায়নিক জারণে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার উদ্ভব হয়। এর সাথে ওজোন, ফম্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলিন, পার অক্সাইড, পার অক্সি অ্যামাইল নাইট্রেট (PAN), নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং মুক্ত র‍্যাডিকল সংযুক্ত হয়ে ধোঁয়াশাকে মারাত্মক বিষপূর্ণ গ্যাসে পরিণত করে।

(ক) মানুষের উপর আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব পড়ে (Effect of photo chemical smog on man)

১. ধোঁয়াশার অ্যাক্রোলিন এবং ফরম্যাল ডিহাইড প্রভৃতি যৌগ চোখে জ্বালা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

২. ধোঁয়া ও অ্যারোসলের সমন্বয়ে ধোঁয়াশা মিশ্রিত বায়ু মানুষের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস করে।

(খ) উদ্ভিদের উপর আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব পড়ে (Effect of photo chemical smog on plants)

ওজোন, প্যান (PAN) এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড পরিচিত ফাইটোটকিক্সকাস্ট। এগুলোর প্রভাবে উদ্ভিদের ক্লোরোসিস (Chlorosis), নেক্রোসিস (Necrosis) এবং বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি রোগ হয়।

৩.৩ পানি দূষণ (Water Pollution)

উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী পানির যে কোনো ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনকে পানি দূষণ বলে। পানি দূষণ স্বল্প পরিসরে এবং বিশ্বব্যাপী হতে পারে। স্বল্প পরিসর স্থানে পানি দূষিত হলে তা

সহজে নিবারণ করা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বব্যাপী পানি দূষিত হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। বিভিন্ন দেশের পানি দূষণে সংক্রামিত হলেও দেশ ভেদে দূষণের প্রকৃতি নির্ভর করে সে সব দেশের উন্নয়ন স্তরের উপর। দরিদ্র দেশের অধিকাংশ মানুষ কম শিক্ষিত এবং পানি দূষণ সম্বন্ধে তাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বর্জ্য বস্তু, বর্জ্য বস্তুর রোগ জীবাণু এবং অদক্ষ খামার এবং কঠোর কাজে উৎপন্ন তলানি বা গাদ প্রভৃতি পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকার চারপার্শ্বে খাল, বিল, নদীগুলো মানুষ সৃষ্ট দূষণের ফলে এসবের পানি নষ্ট হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী নয়। এমন কি নদী পারাপারের সময় মানুষ নাক-মুখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নেয়। নদী পাড়ের মানুষ পানি দূষণের কারণ এখন আর তারা সুস্থ নয়। পক্ষান্তরে, উন্নত ও ধনী দেশগুলোতে পানি এভাবে দূষিত হয় না। সেখানে তাপ, বিষাক্ত ধাতু, অ্যাসিড, পেষ্টিসাইড এবং জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি অতিরিক্ত বিপজ্জনক দূষক পানির দূষণ সৃষ্টি করে।

(ক) পানির দূষক (Water pollutant)

পানিকে দূষিত করে এমনসব পদার্থ ও রোগ-জীবানু পানির দূষক হিসাবে কাজ করে। জৈব পরিপোষক রোগ জীবাণু, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, বিষাক্ত অজৈব পদার্থ, তলানি এবং উত্তাপ পানির প্রধান দূষক। যেমন,

১. মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বর্জ্য পদার্থ, লিটার, তলানি প্রভৃতি জৈব পরিপোষক।

২. নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ডিটারজেন্ট প্রভৃতি অজৈব পরিপোষক।

৩. রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, প্যারাসাইট প্রভৃতি রোগ জীবাণু।

৪. পেষ্টিসাইড, পলিক্লোরিনেটের বাই ফিনাইল (PCB), পলি সাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH), পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি বিষাক্ত জৈব দূষক।

চিত্র ৩ : কলকারখার থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পানি দূষণ

৫. পারদ, সীসা, তামা, ক্যাডমিয়াম, ক্রেমিয়াম, আর্সেনিক, নাইট্রেট, নাইট্রাইট প্রভৃতি ধাতু ও লবণ বিষাক্ত অজৈব পদার্থ।

মানুষই পানির দূষক হিসাবে কাজ করে এবং দূষকের প্রধান উৎস। কোনো একটি দেশে উৎপন্ন পানি দূষক কাছের বা দূরের অন্য একটি দেশের পানি দূষিত বা সংক্রামিত করতে পারে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দূষকগুলো পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। যেমন,

১. চামড়া কারখানা থেকে নির্গত টারটারিক অ্যাসিড ট্যানারী থেকে নির্গত সালফাইড, ক্রোমিয়াম, ফেনল, ট্যানিক অ্যাসিড।
২. সিরামিক জোনিত্র থেকে নির্গত ফ্লুরাইড, রং কারখানা থেকে নির্গত সীসা।
৩. বস্ত্র কারখানা থেকে নির্গত খনিক এ্যাসিড, বেড়ি তেল গ্রিজ।
৪. কাগজের কল থেকে নির্গত মুক্ত ক্লোরিন।
৫. রাবার প্রক্রিয়াকরণের সময় নির্গত ডিস্ক।
৬. ব্যাটারি তৈরির কারখানা থেকে নির্গত সীসা, খনিজ অ্যাসিড।
৭. অ্যাসিটেট রেওন সংস্থা থেকে নির্গত অ্যাসিটিক অ্যাসিড।
৮. ডিসকোজরেওন সংস্থা থেকে নির্গত ডিস্ক, সালফাইড, রাসায়নিক সার কারখানা থেকে নির্গত ফ্লরাইড, ফসফেট।
৯. কিউপ্রামেনিয়াম রেওন সংস্থা থেকে নির্গত দস্তা।
১০. লন্ড্রি থেকে নির্গত ক্ষার, ক্লোরিন, তেল, চর্বি ও গ্রিড।
১১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় নির্গত শ্বেতসার।
১২. দুগ্ধখামার (ডেয়ারি) থেকে নির্গত চিনি (সুগার)।
১৩. ফটোগ্রাফী থেকে নির্গত রূপা (সিলভার)।
১৪. পারমাণবিক জোনিত্র থেকে নির্গত ফ্লুরাইড।
১৫. তেল শোধনাগার থেকে নির্গত ম্যারক্যাপটান এবং
১৬. হালকা পানিয় তৈরির কারখানা থেকে নির্গত সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি পানি দূষিত করে।

(খ) আন্ত মাধ্যমে পানি সংক্রমণ (Water contamination through intermedia)

একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে দূষিত পদার্থ পরিচালিত হয়ে পানি দূষিত করে। যেমন,

১. বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, অ্যাজবেস্টস কণা, পেস্টিসাইড, লবণ, তেল, লিটার, ভারীধাতু, রাসায়নিক সারের কণা প্রভৃতি বৃষ্টির পানির মাধ্যমে পুকুর, হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের পানির সাথে মিলিত হয়ে ঐ সব পানি দূষিত করে।

২. পুকুর, হ্রদে এবং স্থলভাগে স্তুপীকৃত বিষাক্ত জৈব পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে। এই বিষাক্ত বায়ু বৃষ্টির পানির সাথে নেমে এসে আবার পুকুর, হ্রদ, নদী ও সাগরের পানিতে এবং স্থলভাগে এসে পড়ে। স্থলভাগে পতিত দূষিত বৃষ্টির পানির কিছু অংশ পৃষ্ঠ পানি সরণ আকারে প্রবাহিত হয়ে পুকুর, খাল ও নদীতে এসে পড়ে এবং কিছু অংশ চোয়ান প্রক্রিয়ায় মাটির রন্ধ্র পথের মধ্য দিয়ে গভীরে ভৌত পানি দূষিত করে।

৩. কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্যগুলো পানির সাথে মিশে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির সাথে ক্রমে পুকুর, হ্রদ, নদীতে ও পরে সমুদ্রে এসে পতিত হয়।

৪. মাটির নিচে যে সব বর্জ্য পদার্থ পুতে রাখা হয় তা থেকে তরল অংশ বেরিয়ে গভীর, অগভীর ভৌত পানি দূষিত করে এবং মাটির মধ্য দিয়ে ঢালু অনুসারে অগ্রসর হয়ে কূপ, পুকুর ও ঝরণার পানি সংক্রমিত হয়ে পানিকে দূষিত করে।

(গ) পানি দূষণের নিয়ামক (Factors of water pollution)

পানির গভীরতা, পানির পরিমাণ, পানির তাপমাত্রা, আন্তঃমাধ্যমে সংক্রমণের পরিমাণ, দূষকের অধঃক্ষেপণের পরিমাণ, দূষকের প্রকৃতি, দূষকের ঘনত্ব, পানির স্থিতাবস্থা বা প্রবাহমানতা এবং পানির পরিপোষক ও অক্সিজেনের মাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাবে পানি দূষণের প্রকৃতি ও মাত্রায় পার্থক্য হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন নদী, ঝরণা প্রভৃতি প্রবাহমান পানির দূষণের মাত্রা অপেক্ষা পুকুর ও হ্রদের স্থির পানির দূষণের মাত্রা অনেক বেশি।

১. **স্থির পানি** (Standing water): পুকুর ও হ্রদের স্থির পানি সহজে অধিক পরিমাণে দূষিত হয়। পুকুর ও হ্রদের পানি খুব ধীরে প্রতিস্থাপিত হয়। কোনো হ্রদের পানি সম্পূর্ণ মাত্রায় প্রতিস্থাপিত হতে ১০ থেকে ১০০ বছর বা তারও বেশি সময় লাগে। ফলে দূষকের দূষণ মাত্রা সঞ্চারিত হয়ে দ্রুত বিষক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়।

২. **প্রবাহ পানি** (Flowing water): খাল, ঝরণা, নদী প্রভৃতি প্রবাহমান পানি প্রবাহের ফলে সহজে দূষণ মুক্ত হয়। কিন্তু দূষকের সংক্রমণ অবিরামভাবে চলতে থাকলে প্রবাহমান পানিও দূষণ মুক্ত হতে পারে না।

হ্রদের বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চল (Ecological regions of a lake): হ্রদের পানি তিনটি বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চলে বিভক্ত এবং দূষণ হয়।

উপকূলীয় অঞ্চল (Littoral region): হ্রদের উপকূলীয় অগভীর অংশকে উপকূলীয় অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে বেলাবাসী মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদ জন্মায়।

২. **মধ্য হ্রদ অঞ্চল** (Limnetic region): উপকূল থেকে দূরে হ্রদের মধ্যস্থলের মুক্ত পানি রাশির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পানিতে প্রচুর সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে, সেখানে উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন জন্মায়। এই খাদ্যের সন্ধানে সেখানে প্রচুর মাছের সমাগম হয়।

চিত্র ৪: হ্রদের তিনটি বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চল

৩. **অগভীর অঞ্চল** (Profundal region): হ্রদের অত্যন্ত গভীর অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, ফলে সেখানে জলজ প্রাণীর সংখ্যা অনেক কম। হ্রদের বেশি গভীর অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গভীর অংশে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা বেশি থাকে।

(ঘ) ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের ধরন (Pattern of surface water pollution)

ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের কয়েকটি ধরন উল্লেখ করা যায়।

১. **পরিপোষক দূষণ** (Nutrient pollution): নদী হ্রদ ও পানির প্রধানত নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পরিপোষক থাকে বলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকে। যে পরিমাণ পরিপোষক জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে সেই পরিমাণকে পরিপোষকের স্বাভাবিক ঘনত্ব বলে। কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিপোষক পানিতে থাকলে তা দূষক হিসেবে কাজ করে।

২. **জৈব পরিপোষক ঘটিত দূষণ** (Bio nutrientional pollution): কাগজ কল, মাংস, মোড়ককরণ জোনিত্র, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে প্রচুর জৈব দূষক নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি পানিতে এসে পড়ে। এর ফলে ঐরূপ জলাশয়ের পানির উপরের বায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আবার ব্যাকটেরিয়া জৈব দুষককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বলে পানি ক্রমশ পরিশোধিত হয়।

৩. **ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দুষক:** ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দুষকের হ্রাসের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিয়া পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে জৈব দূষক হ্রাসের কাজে লাগায়। এর ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পায়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি কমে গেলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারায়।

৪. **পানিতে অক্সিজেন:** পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলে অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেড়ে যায়। এর ফলে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব দূষক এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবভরকে বিশ্লেষিত করে মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস ও অস্বাস্থ্যকর গন্ধ উৎপন্ন করে।

৫. **গ্রীষ্মকালে নদী:** গ্রীষ্মকালে নদী, ঝরণা প্রভৃতির পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে স্রোতের বেগ হ্রাস পায়, ফলে জৈব দূষকের ঘনত্ব বেশি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দূষকের হ্রাসের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পায়। এ সময় উচ্চ তাপমাত্রার ফলে দূষক দ্রুত ক্ষয় হলেও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। জৈব দূষক সম্পূর্ণ হ্রাস পেলে পানি নির্মল হয়। অবশ্য জৈব দূষক সম্পূর্ণ দূর হবার আগে বিভিন্ন উৎস থেকে আবার জৈব দূষক পানিতে এসে পড়লে পানি নির্মল হতে পারে না বরং, পানি দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(ঙ) অজৈব পরিপোষক জনিত পানি দূষণ (Non nutriential water pollutant)

লোহা, গন্ধক, সোডিয়াম, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস প্রভৃতি অজৈব পরিপোষক পানির উদ্ভিদ বৃদ্ধিকে দ্রুততর করে। মিষ্টি পানির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফসফেট এবং লবণাক্ত পানির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নাইট্রেট উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক। এজন্য পানিতে ফসফেট এবং নাইট্রেটের পরিমাণ বেড়ে

গেলে শৈবাল, কচুরীপানা প্রভৃতি অনেক পানির উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

মানুষ নিজেই অজৈব পরিপোষক সৃষ্টি করে পানি দূষিত করে। কৃষি জমিতে যে রাসায়নিক (অজৈব) সার দেওয়া হয় তার প্রায় ২৫ শতাংশ বৃষ্টির পানির সাথে বাহিত হয়ে নদী, পুকুর ও হ্রদের পানির সাথে মিশে। কাপড় ধোলাই এর লন্ড্রীতে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের সাথে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম ফসফেট বা ট্রাই-ফসফেট (TPP) পানি সংক্রমিত করে।

অবশ্য কয়েকদিন পর অজৈব পরিপোষকের পরিমাণ হ্রাস পেলে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অনেক জলজ উদ্ভিদের বিনাস সাধিত হয়। এই সব মৃত উদ্ভিদের উপর বায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়ার পচন ক্রিয়ার ফলে পানিতে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা (BOD) মান হ্রাস পায় এবং তা চরম মানের নিচে নেমে গেলে সব ধরনের জলজ প্রাণির মৃত্যু হয়। ফলে অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার পচন শুরু হয়। ফলে পানিতে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

(চ) জৈবিক দূষণ (Bilogical pollution)

মানুষের কার্যাবলীর ফলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠের পানি সংক্রমিত হয়। পানিতে এ ধরনের দূষণকে জৈবিক দূষণ বলে। তৃতীয় বিশ্বের সব কয়টি দরিদ্র দেশে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ত্রুটিপূর্ণ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের ফলে এবং খাবার পানিতে জীবাণু সংক্রমণের ফলে পানি বাহিত রোগের সমস্যা গুরুতরভাবে দেখা দিয়েছে।

(ছ) পানিবাহিত রোগ (Water borne disease)

পানিবাহিত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণের ফলে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়। এই সব রোগে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সব বয়সের পুরুষ ও মহিলা আক্রান্ত হয়। নিচে পানিবাহিত কয়েকটি রোগের নাম উল্লেখ করা যায়।

(১) ব্যাকটিরিয়াঘটিত টাইফয়েড,
(২) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত কলেরা,
(৩) ব্যাকটিরিয়াঘটিত সালমোনোপেন্টাসিস,
(৪) ভাইরাস হেপাটাইটিস,
(৫) ভাইরাসঘটিত পোলিও,
(৬) প্রোটোজোয়া জীবাণুঘটিত আমাশয় এবং
(৭) পরজীবী কৃমিঘটিত সিসসোমিয়াসিস (রক্তরাসী ফিতা কৃমিজাত রোগ)।

(জ) বিষাক্ত জৈব পদার্থঘটিত পানি দূষণ (Poisonous biotic water pollution)

মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায় ১০ হাজার কৃত্রিম জৈব যৌগ ব্যবহার করছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই জৈব যৌগের অধিকাংশই পানিতে সংক্রমিত হয় এবং মারাত্মক পানি দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পতঙ্গ নাশক (insecticite), কীটনাশক (pesticitic), লতা-পাতা নাশক (herbicides), ছত্রাক নাশক (fungicides), পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB) এবং পলি সাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (RAH) প্রভৃতি জৈব যৌগ মানুষের স্বাস্থ্যের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে।

(ঝ) বিষাক্ত অজৈব পদার্থঘটিত পানি দূষণ (Poisonous a biotic water pollution)

ধাতু, অ্যাসিড, অজৈব লবণ প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য সুপরিচিত পানি দূষক। এছাড়া পারদ, সীসা, ক্যাডসিয়াম, আর্সেনিক প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতিসাধন করে। যেমন,

(১) পারদ (Mercury): পারদ মানুষের শরীরের উপর সবচেয়ে বেশি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষের অদূরদর্শী কাজের ফলে প্রতি বছর পৃথিবীতে ১০ হাজার মেট্রিক টন পারদ পানিতে ও বায়ুতে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন, ভিনাইল ক্লোরাইড প্লাষ্টিকপেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে উপজাত হিসেবে পারদ পয়ঃনালীর মাধ্যমে নদী ও হ্রদের পানিতে এসে পড়ে। আবার ফ্লোর অ্যালকালি, জোনিত্র, শক্তি উৎপাদন জোনিত্র, ভস্মীকরণ কারখানা, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল থেকে তরল বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পারদ নদী ও হ্রদের পানির সাথে মিশে।

পানিতে সংক্রমিত পারদ নদী ও হ্রদের পানির নিচে কাঁদার মধ্যে বসবাসকারী অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ডাই মিথাইল পারদ এবং মিথাইল পারদে পরিবর্তিত হয়। ডাই মিথাইল পারদ খুব দ্রুত পানি থেকে বায়ুতে বাষ্পীভূত হয়; পক্ষান্তরে, মিথাইল পারদ ধীরে ধীরে পানির নিচে সঞ্চিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে দ্রবীভূত হয়ে পানির সাথে মিশে যায়। আম্লিক তরল মাধ্যমে মিথাইল পারদ উৎপাদন হার ডাইমিথাইল পারদের তুলনায় অনেক বেশি। মিথাইল পারদ সহজে দ্রবীভূত হওয়ায় পানির উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে জীব পুঞ্জীভূত হয়। এর ফলে পানির বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উচ্চ পুষ্টিতলের প্রাণীদের দেহে জীব পারদ বেড়ে উঠে। এ জীব পারদ পাখিও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(ক) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষাক্ত অজৈব পদার্থ পারদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব (Reverse reaction of mercury on human health)

- **প্রত্যক্ষ প্রভাব:** ইলেকট্রিক সুইচ, পারদ বাতি এবং ফ্লুরোসেন্ট বাল্বের অসাবধান প্রক্রিয়াকরণের ফলে পারদ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায়। বৃত্তিমূলক শ্রমজীবী মানুষের প্রশ্বাস গ্রহণের সময় এই বাষ্পীভূত পারদ সহজেই তাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তে সংক্রামিত হয়। আবার পারদ সংক্রমিত খাবার পানির মাধ্যমেও পারদ রক্তে প্রবেশ করে।
- **পরোক্ষ প্রভাব:** খাদ্য শিকলের মাধ্যমে পারদ মানুষের দেহে সঞ্চিত হয়। মিথাইলপারদ সংক্রমিত হ্রদ ও নদীর পারদ মাছের দেহে সঞ্চিত হয় এবং এ মাছ আহার করে মানুষের রক্তে পারদ সঞ্চিত হয়।
- **কোষের স্তরে পারদের ক্রিয়া:** মিথাইল পারদ দ্রবীভূত হওয়ার চর্বি কোষে সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে রক্তের সাথে মিশে রক্ত মস্তিষ্ক (blood brain) পর্দা অন্তরায় অতিক্রম করে মস্তিষ্কের স্নায়ু (nerve) কোষের উপর প্রভাব ফেলে। মিথাইল পারদ মা-এর শরীর থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রুণে প্রবেশ করে, যে ভ্রুণ মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষাক্ত অজৈব পদার্থ পারদের প্রভাব (Effect of mercury on human health)

মানুষের মস্তিষ্কের উপর মিথাইল পারদের মন্দ বিষক্রিয়া কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এর ফলে যেসব সমস্যা হয় :

- মানুষ পেশীর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

- হাত, পা, জিহ্বা ও ঠোঁটে অসাড়তা দেখা দেয়।
- যে কোনো কাজে অনীহা দেখা দেয় এবং সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে।
- মানসিক দুর্বলতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।
- দৃষ্টিহীনতা ও বধিরত্বের সৃষ্টি হয়।
- কথা বলায় বাধার সৃষ্টি হয় এবং
- ভ্রুণ-মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি হয়।

(২) **সীসা** (Lead): মৌল সীসা পানিতে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু সীসার দ্বি-যোজ্যতা বিশিষ্ট আয়ন (Pb^{2+}) সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পানিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সীসা সংক্রমণের নানা ধরনের প্রভাব রয়েছে।

- মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত সংরক্ষিত ব্যাটারির বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষমতা তৈরির জন্য মৌল সীসা ও সীসার অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য পুরাতন ব্যাটারির সীসা পুনরায় কাজে লাগানো হয়। এ সময় অসতর্ক কাজের ফলে সীসা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পরিত্যাক্ত সংরক্ষিত ব্যাটারী পৌর বর্জ্যে পরিণত হলে এর সীসা পরিবেশকে সংক্রমিত করে।
- পানি ও মাটিতে সংক্রমিত সীসা থেকে দ্রবীভূত দ্বি-যোজন বিশিষ্ট আয়ন (Pb^{2+}) উৎপন্ন হয়ে পানির স্থলভাগের উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের দেহের কোষে সীসা সঞ্চিত হয়।
- **পেট্রোল দহন:** পেট্রোলের সাথে স্বল্প পরিমাণে অশুদ্ধ সীসা মিশে থাকে। মোটর গাড়ি চলাচলের সময় পেট্রোল দহনের ফলে সীসা গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে।
- বাতাসে ভাসমান সীসাকণা বৃষ্টির পানির সাথে স্থলভাগের মাটি, পুকুর, নদী, হ্রদ এবং মানুষের পানিতে এসে মিশে। পানির মাছ এবং স্থলভাগের উদ্ভিদ থেকে সীসা খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে।
- **গ্যাসোলিন দহন:** গ্যাসোলিন ব্যবহৃত মোটর গাড়ির গ্যাসোলিন সাথে টেট্রা অ্যালকিল সীসা (PhR_4) মিশানো হয়। মিশ্রিত গ্যাসোলিন দহনের সময় এ থেকে উৎপন্ন সীসা ড্যাইহ্যালাইড ($PbBrCl$) বের হয়ে বাতাসের সাথে মিশে এবং সূর্যের আলোর প্রভাবে তা সীসা অক্সাইডে পরিণত হয়। বাতাসে সীসা অক্সাইডের কণা অ্যারোসলে পরিণত হয়। বৃষ্টির পানির সাথে সীসা অক্সাইড ভূপৃষ্ঠ পতিত হলে পানির ও স্থলের বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি সাধন করে।

(৩) **পানির নাইট্রেট ও নাইট্রাইট** (Nitrates and nitrites of water): নাইট্রেট ও নাইট্রাইট অজৈব পানি দূষক। নিরাপদ পানির ট্যাঙ্ক, দহন ক্ষেত্র, অধিক রাসায়নিক সার যুক্ত শস্য, বর্জ্যপদার্থ প্রক্রিয়াকরণের জোনিত্র প্রভৃতি উৎস থেকে পানির সাথে মিশে নাইট্রেট মানুষের দেহে প্রবেশ করে নাড়ি ভূড়িতে ক্রমে বিষক্রিয়া নাইট্রাইটে পরিণত হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নাইট্রেট ও নাইট্রাইটের প্রভাব রয়েছে।

- মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন নাইট্রাইটের সংস্পর্শে জারিত হয়ে মেটাহিমোগ্লোবিন রূপান্তরিত হলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবাহিতা হ্রাস পায়। মানুষের দেহের কলাকোষে অক্সিজেনের যোগান হ্রাসের ফলে রক্তের স্বল্পতা এবং হৃদপিন্ডের ইসচিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়।

- নাইট্রাইট দূষণ গ্রামাঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রামাঞ্চলে নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় প্রতি বছর অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন উন্নত দেশেও নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় প্রচুর শিশু মারা যায়।

(৪) পানির ক্লোরিন (Water chlorine): ক্লোরিন একটি অতি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ।

- শহর/নগরের পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে যে খাবার পানি সরবরাহ করা হয় সেই পানির ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করার জন্য ক্লোরিন মিশান হয়। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্লোরিন ব্যবহারের ফলে তা মানুষের দেহে ক্লোরিনজাত বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- শহর/নগর আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য পদার্থ যুক্ত পানির জীবাণূ নাশ করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। অধিক পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহারের ফলে সেই পানি পুকুর, নদী ও হ্রদের পানি দূষিত করে।
- শক্তি উৎপাদন জোনিত্র শীতল করার জন্য ব্যবহৃত নলের ভিতরে ও বাইরে যে শৈবাল, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্ম লাভ করে তা ধ্বংস করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। ঐ রকম জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা উদ্বৃত্ত পানি নদীর পানির সাথে মিশে নদীর পানি দূষিত করে।

(৫) লবণ (Salt): শীত প্রধান দেশে শীত ঋতুতে রাস্তার উপর সঞ্চিত তুষার গলাবার জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ ব্যবহার করা হয়। তুষার গলা পানির সাথে লবণ ক্রমশ পুকুর,

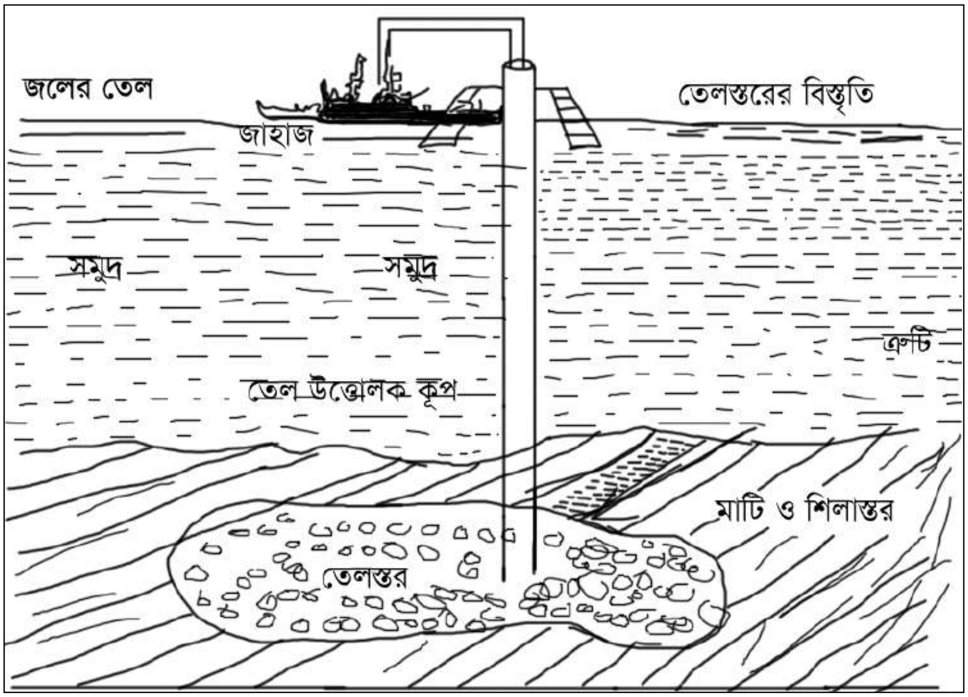

চিত্র ৫ : মহিসোপান থেকে পেট্রোল নির্গমনের ফলে পানি দূষণ

নদী, হ্রদ এবং ভূগর্ভের পানিতে সংক্রমিত হয়। ভূপৃষ্ঠের পানিতে অধিক লবণ থাকলে লবণের প্রভাব সহ্য করতে অসমর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণির বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্তি হয়।

(ঞ) সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean Water Pollution)

সাগর মহাসাগরের পানি দূষণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে সামুদ্রিক তেল থেকে দূষণ ও প্লাষ্টিক দূষণ অন্যতম। পেট্রোল থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due of petroleum) দূষণের অন্যতম কারণ। ২০১৪ সালে সুন্দরবনে তেলবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় পানি, বন পরিবেশ, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি দূষণের শিকার হয় এবং উদ্ভিদ ও জলজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

- প্রতি রাষ্ট্রের সমুদ্র পানি সীমার মধ্যে তীর থেকে দূরবর্তী মহিসোপানের মাটির নিচে প্রাকৃতিক পেট্রোল ভান্ডার রক্ষিত রয়েছে (বাংলাদেশের মহীসোপান থেকে পেট্রোল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)। মহীসোপান থেকে পেট্রোল উত্তোলনের জন্য যে নলকূপ বসান হয় মাটি ও নলকূপের সংযোগ স্থল থেকে প্রতিনিয়ত পেট্রোল চুইয়ে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত বা দূষিত হয়।
- নলকূপ ফেটে যাওয়া, নলকূপে ভাঙ্গন এবং সমুদ্রের উপরের পেট্রোবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজ থেকে পেট্রোল উপচে পড়ে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।
- ট্যাঙ্কার জাহাজ পরিষ্কার করা এবং পানির উপর জাহাজ স্থির রাখার জন্য জাহাজের তলদেশে সঞ্চিত পানি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করার জন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই বর্জ্য পানির সাথে পেট্রোল মিশ্রিত থাকায় সমুদ্রের পানি সংক্রমিত হয়।
- দেশের অভ্যন্তরে অসতর্কভাবে পেট্রোল ব্যবহারের ফলে তা বিধৌত হয়ে মাটি সংক্রমিত করে। বৃষ্টির পানির পৃষ্ঠ সরণের সাথে সেই পেট্রোল নদীর মাধ্যমে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।
- মহীসোপান থেকে পেট্রোল উত্তোলন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি এবং উত্তোলন ক্ষেত্র থেকে উপকূলে পেট্রোল স্থানান্তরের সময় পেট্রোল নির্গমনের ফলে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত হয়।
- দূর্ঘটনার ফলে পেট্রোলবাহী ট্যাঙ্কার বিধ্বস্ত হলে প্রচুর পরিমাণে অশোধিত পেট্রোল সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।

৩.৪ পানির আর্সেনিক ও মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি (Water Arsenic and Health Risk of the People)

মানুষের দেহে আর্সেনিক সংক্রমণের প্রধান উৎস ভূগর্ভের (ভৌম) পানি। নলকূপের পানি আর্সেনিক দূষণের মাধ্যম পরিবেশিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভূগর্ভের পানি কেবলমাত্র গুণগত মানেই নয়, প্রাপ্যতার দিক থেকেও স্বল্পতার দৃষ্টান্ত। নলকূপের পানির ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ততই প্রকট হয়ে উঠছে। খাবার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারণ করলেও পৃথিবীর অনেক দেশে খাবার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ঐ মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি। আর্সেনিক অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ হওয়ায় স্বল্প মাত্রার আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং উচ্চ মাত্রার আর্সেনিকের তাৎক্ষণিক প্রভাবে মানুষের মৃত্যু হয়।

আর্সেনিকের পরিবেশিক উৎস (Environmental Sources of Arsenic)

আর্সেনিক পরিবেশিক কতগুলো উৎস হচ্ছে:

- লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাংলাদেশের নদীগুলো হিমালয় থেকে যে পলি বহন করে এনেছে তার সাথে ভেসে এসেছে আর্সেনিক এবং তা চুঁইয়ে ভূগর্ভের পানিতে সঞ্চিত হয়েছে। নলকূপের মাধ্যমে আর্সেনিক মিশ্রিত পানি ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে আর তা পান করে মানুষ আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়। বেশী দিন আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার হয়।
- আর্সেনিক সমৃদ্ধ কীটনাশক যৌগের অবাধ ব্যবহারের ফলে আর্সেনিক দ্বারা মাটি ও পানি সংক্রমিত হয়। বিভিন্ন কাজে মানুষ আর্সেনিক যুক্ত পোকা-মাকড় নাশক, সীসা আর্সেনেট (As-V) এবং লতা-গুল্ম নাশক, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট (As-V), সোডিয়াম আর্সেনাইট (As-III) এবং প্যারিস গ্রীণ (As-III) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো থেকেই আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টি হয়।
- সোনা ও সীসার আকরিকের সাথে আর্সেনিক থাকে। আকরিক থেকে এই দুইটি খনিজ নিষ্কাশনের সময় কিছু আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।
- কয়লার সাথেও কিছু আর্সেনিক থাকে। এজন্য কয়লা দহনের সময় আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়।
- খাবার পানি, বিশেষ করে ভূগর্ভ থেকে নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি পান করার ফলেই প্রধানত মানুষের দেহে আর্সেনিক অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। আর্সেনিক অ্যাসিড ($H_2A_2O_4$) অথবা ডিপ্রোটোনেটেডে আকারে আর্সেনিক পানির সাথে মিশে থাকে। খাবার পানিতে অজৈব আর্সেনিকের গড় পরিমাণ প্রায় ২.৫ ppb। এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতিদিন ১.৬ লিটার পানি পান করে। সেই হিসাবে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে প্রতিদিন প্রায় ৪ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক প্রবেশ করে।

খাদ্য দ্রব্যে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, আর্সেনিকের মাত্রা মুরগীর বুকের মাংস ০.০০, লাল মরিচে ০.০৬, শুকনা মটর শুঁটিতে ০.০৯, লবণ বিহীন মাখনে ০.২৩, তাজা রসুনে ০.২৪, বেগুনে ০.৮২, চা-তে ০.৮৯, গরুর কলিজায় ১.৪০, চিংড়ি মাছে ১.৫০, মুড়িতে ১.৬০, টেবিল লবণে ২.৭১, সামুদ্রিক লবণে ২.৮৩, ছত্রাকে ২.৯০,লাইখ্যাতে ৮.৮৬ এবং চিংড়ির খোসায় ১৬.০০ পি.পি.এম। আর্সেনিক বিষ ধীরে ধীরে প্রাণি দেহে পুঞ্জীভূত হয়। প্রাণি ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হয়। ধান, পেঁয়াজ ও শিম জাতীয় উদ্ভিদ সহজে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে আপেল, আঙ্গুর ও টমেটোর আর্সেনিক সহ্যগুণ বেশি।

(ক) মানুষের দেহে আর্সেনিকের সহনীয় সীমা (Endurable limit of arsenic in human body)

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের সাথে আর্সেনিক প্রবেশ করে মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র মাত্রায় সঞ্চিত হয়। চুল ও নখে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক সঞ্চিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা মানব দেহে আর্সেনিকের সহনীয় সীমা ০.০৫ পি.পি.এম বলে নির্ধারণ করেছে। অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মানব দেহে আর্সেনিকের সহনীয় সীমা ০.১ পি.পি.এম বলে নির্ধারণ করেছে।

ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যবান মানুষ অপেক্ষা অপুষ্টিতে আক্রান্ত রোগীর দেহ আর্সেনিকের বিষক্রিয়া আক্রান্ত করে। আবার শহর/নগর অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষক ও জেলে পরিবারের লোক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়েছে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব (Effect of airsenic on human health)

আর্সেনিক ধাতু না হলেও ধাতুর অনেক গুণ এর মধ্যে রয়েছে। এটি একটি প্রোটোপ্লাজমিক বিষ। এর বিষ ক্রিয়ার মানব দেহে পচনশীল ক্ষত সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে নির্বাসিত সম্রাট নেপোলিয়ানের মৃত দেহের চুল ও নখ পরীক্ষা করে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল, ফলে তাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

পানীয় ও খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক মানব দেহে প্রবেশ করে ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, মূত্রথলী এবং ত্বকে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। আর্সেনিক প্রভাবিত রোগী ধূমপান করলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি।

আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়ায় বমি, উদরাময় এবং খাদ্য অন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

আর্সেনিক উৎসেচক (enzyme) জীবন্ত প্রাণির দেহ কোষে উৎপন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ, এটি নিজে পরিবর্তিত না হয়ে অন্য পদার্থের পরিবর্তন সাধন করে কাজে বাধার সৃষ্টি করে বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

(গ) আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর দেহে উপসর্গ (Symtom of arsenic affected patients body)

আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর দেহে প্রাথমিক উপসর্গ হচ্ছে গলা জ্বালা করা, পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়া,

চিত্র ৬: মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব

বমি বমি ভাব, পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব, রোগীর গলা ও মুখ শুকিয়ে যায়, উদ্দীপনা হ্রাস পায়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে করতলে ও পায়ের পাতায় কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয় এবং চামড়া ও চুল উঠে যায়। এই উপসর্গ ব্ল্যাকফুট রোগ নামে পরিচিত। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে, এমনকি রোগীর মৃত্যু হয়।

চিত্র ৭: আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর হাত ও পা

(ঘ) আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবার প্রাথমিক ব্যবস্থা (Primary steps to defent from arsenic perverse reaction)

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিক (২০০০), আর্সেনিকের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে দুটি সুপারিশ করেন:

(ক) আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত নলকূপের পানি কখনই পান করা যাবে না।

(খ) আর্সেনিকে সংক্রমিত পানিতে ফিটকিরি মিশিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দেবার পর সেই পানি ব্যবহার করা যাবে।

(ঙ) পেট্রোলিয়ামের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি দূষণের ফলে পরিবেশিক প্রভাব (Environmental effect of sea water pollution through petroleum)

পেট্রোলিয়ামের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি দূষণ হয় এবং পরিবেশগত নানা ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে।

সামুদ্রিক পানি সংক্রমিত হবার ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পুষ্টি পদার্থের উপস্থিতির পরিমাণ, পানি p^H দ্রাব্যতা প্রভৃতি অজৈব পদার্থ এবং পানির উদ্ভিদ ও প্রাণির উপস্থিতি প্রভৃতি জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

পেট্রোল জনিত দূষণের ফলে সামুদ্রিক খাদ্য শিকলের স্বাভাবিক গতিশীলতার বাধার সৃষ্টি হয়। প্রচুর শৈবাল এবং উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও প্রাণি প্ল্যাংকটন বিষাক্ত হয়, খাবার উপযোগী মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

সংক্রমিত তেল ধীরে ধীরে অধঃক্ষেপণের ফলে মাটি সংক্রমিত হয়, মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী কাঁকরা জাতীয় প্রাণি মারা যায়। এর পরও যেসব প্রাণি টিকে থাকে সেগুলোর কোষে পেট্রোলের যৌগ জীব

পুঞ্জীভূত হয় এবং এসব প্রাণি আহারের ফলে মাছ সংক্রমিত হয়, যা খাবার উপযোগী নয়। অর্থাৎ এসব সংক্রমিত মাছ মানুষ ভোগ করলে মানুষের শরীরে একইরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পেট্রোল দূষণের ফলে উপকূলের এবং খাড়ীর মাছের পোনা উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে সেখানে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য নষ্ট হয়।

পেট্রোল সংক্রমিত মাছ আহারের ফলে পাখীর পেশীর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে পাখী ক্রমশ উড়বার ক্ষমতা হারায়।

পেট্রোল দূষণের ফলে পাখির পালকের অপরিবাহী ক্রিয়া হ্রাস পায়। পালকের স্বল্পতার ফলে পাখি বেশি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না এবং বেশি শীতের দিনগুলোতে অনেক পাখীর মৃত্যু হয়।

এসব পরিস্থিতি ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় দেখা দেয়। কারণ এই সুন্দরবন এলাকায় তেলবাহী জাহাজ ডুবে ছিল।

(চ) প্লাষ্টিক থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due to plastic)

প্লাষ্টিক থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে উৎপন্ন প্লাষ্টিক ব্যবহারের পর সমুদ্রে ফেলে দিলে এই প্লাষ্টিকের প্রভাবে সমুদ্রের পানি দূষিত হয়ে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে।

মাছ ধরার নাইলনের জাল, প্লাষ্টিকের থলি, প্লাষ্টিকের ফিতা প্রভৃতি ব্যবহারের পর সমুদ্রে ফেলে দিলে এগুলো জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয় (bio-nondegradationable) বিধায় অবিকৃত অবস্থায় সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হলে এর প্রভাবে পানি দূষিত হলে সামুদ্রিক জীবের ক্ষতি সাধিত হয়।

মাছ এবং অপেক্ষাকৃত বড় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণি প্লাষ্টিক খেয়ে ফেললে অবিকৃত প্লাষ্টিক প্রাণির পাকস্থলীতে সঞ্চিত হয়, যা কখনই প্রাণির দেহ থেকে নির্গত হয় না। ক্রম সঞ্চিত প্লাস্টিকের কারণে প্রাণির অধিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খাদ্যের স্বল্পতার জন্য প্রাণি মারা যায়।

(ছ) চিকিৎসা বর্জ্য ও আবর্জনা থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due to medical wastage and refuges)

বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা বর্জ বস্তু ও রক্ত সংক্রমিত ব্যান্ডেজ, সূচ, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ প্রভৃতি নদী বা সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়, এর ফলে নদী বা সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। আবার আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে নিঃসৃত আংশিক প্রক্রিয়াকৃত এবং একেবারেই প্রক্রিয়া না হওয়া আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ায় বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে প্রচুর জৈব রাসায়নিক এবং বিষক্রিয়া ধাতু সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।

৩.৫ মাটি দূষণ (Soil Pollution)

অজৈব খনিজ, জৈব (উদ্ভিদ-প্রাণির অবশেষ) পদার্থ, পানি ও বায়ু নামক চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মাটি। মাটির উপরিভাগে যাবতীয় পুষ্টি পদার্থ সঞ্চিত হয় বলে পৃথিবী পৃষ্ঠের এই মাটি উর্বর ও উৎপাদনশীল। উপরের স্তরে বসবাসকারী কেঁচো, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি প্রাণি উপরের স্তরের পুষ্টি পদার্থ আত্মস্থ ও মাটির সাথে মিশ্রণ এবং মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে মাটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, মানুষের তৈরি দূষণ ক্রিয়ার ফলে উপরের স্তরের মাটির পুষ্টি পদার্থ

অপসারিত হচ্ছে, মাটি সৃষ্টিকারী জীবের গতিশীলতায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, বহিরাগত অপ্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব উপাদান মাটির সাথে মিশছে। এর ফলে ভবিষ্যতে পরিবেশ সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটির দূষক পানি ও বায়ু দূষণের মাধ্যমে তেমনই পানি ও বায়ুর দূষণ মাটির দূষণ সৃষ্টি করে।

(ক) মাটি দূষণের ধরন (Pattern of soil pollution)

মাটির দূষক ১. জৈব দূষক (biotic pollutants) এবং ২. অজৈব দূষক (abiotic pollutant) এই দুধরনের হলেও তা মূলত ৭ ধরনের লক্ষ্য করা যায়।

১. **জৈবিক দূষণ** (Biotic pollution)ঃ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা অসংক্রমিত স্লাজ, হাসপাতালের রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, সূচ, সিরিঞ্জ প্রভৃতি আবর্জনা এবং প্রক্রিয়াবিহীন পৌর আবর্জনার সাথে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ও কৃমি থাকে। স্থলভাগে স্তূপীকৃত করা ছাড়াও এগুলো সার হিসেবে কৃষিভূমিতে ব্যবহার করা হয়। কৃষি ভূমিতে উৎপন্ন শাক সবজি ও ফল রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানুষ, গরু মহিষ, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি প্রাণি এই সবজি ও ফল আহার করে রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

২. **পরিপোষক দূষণঃ** পুষ্টি পদার্থকে পরিপোষক বলে। মাটির উপরের স্তরে পরিপোষক সঞ্চিত থাকে। এই উপরের স্তরের মাটি থেকেই উদ্ভিদ পরিপোষক গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাটিতে বসবাসকারী মৃতজীবী (detrivorss) এবং বিয়োজক (decomposers) জীবগুলো দ্বারা মাটির খনিজ উপাদানের সাথে মৃত জীব ও জীবের অংশগুলো মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হিউমাসের আত্মীকরণ, বাতান্বয়ন এবং পানি মিলিত হয়ে উপরিতলের মাটির পরিপোষক উৎকর্ষতা সৃষ্টি হয়।

   বর্তমানে কৃষি পদ্ধতিতে কীটনাশক, লতাগুল্ম নাশক প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে মাটির পরিপোষকের পুনরাবর্তন সঠিকভাবে হচ্ছে না। এজন্য পরিপোষকের হ্রাস বা নিঃশেষ হবার ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ছে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। মাটির পরিপোষক হ্রাসের বিষয়টিকে পরিপোষক দূষণ বলে। প্রতি বছর একই জমিতে একই ফসল উৎপাদন, পরপর দুটি চাষের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হ্রাস এবং বেশি বেশি হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য জমিতে ব্যবহারের ফলেই মাটির পরিপোষক দূষণ ঘটে। বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের কারণে মাটি বিয়োজক ও মৃতজীবী জীবগুলো মারা যায়, হিউমাস তৈরি হতে পারে না এবং মাটির মিশ্রণ, বাতান্বয়ন এবং পানি আসক্তির হ্রাস হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে মাটির উৎকর্ষতা হ্রাস পেলে মাটির P^H মান এর পরিবর্তন হয়।

৩. **জৈব পদার্থ জনিত দূষণঃ** প্রধানত আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে কীটনাশক ও মাটি নিয়ন্ত্রকের অবাধ ব্যবহারের ফলে জৈব পদার্থ জনিত মাটি দূষণ ঘটে। এড্রিন, অলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, ডি.ডি.টি প্রভৃতি অগানোক্রোরিন কীটনাশক পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এগুলো মাটির প্রধান দূষক। এই দ্রব্যগুলো অতিমাত্রায় এবং অসাবধানে ব্যবহারের ফলে এর কিছু অংশ দ্বারা মাটি সংক্রমিত হয়। মাটিতে বসবাসকারী মৃতজীবী ও বিয়োজক জীব ও কীট নাশকগুলো জৈব অবক্ষয়যোগ্য (non biodegradable) না হওয়ায় বহু বছর মাটির মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং মাটি ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো সময় পানি সংক্রমিত করে। মাটির মধ্যে আবার, সীসা, পারদ, আর্সেনিক সম্বন্ধ জৈব-যৌগ মাটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টিকারী

(conditioner) হিসাবে ব্যবহারের ফলে ভারী ধাতুগুলো বাগানে ও কৃষি ভূমিতে স্থায়িভাবে সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে মাটি থেকে উদ্ভিদে এবং খাদ্য শিকলের মাধ্যমে প্রাণিদেহে পরিবাহিত হয়।

৪. **অজৈব পদার্থজনিত দূষণ:** বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পৌর সংস্থা যেসব অজৈব কঠিন বর্জ্য অপরিকল্পিতভাবে স্তুপ করে রাখে সেগুলোর প্রভাবে মাটি দূষিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, কয়লা ও খনি শিল্প, প্লাস্টিক ও পেষ্ট উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ফেলে দেয়া পদার্থের মাধ্যমে সীসা; পারদ, দস্তা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি অজৈব বিষাক্ত ধাতু মাটি সংক্রমিত ও দূষিত করে। বিভিন্ন রাস্তা-অলি-গলির পাশে ফেলে দেয়া কঠিন আবর্জনা পৌর কর্তৃপক্ষ এক জায়গায় স্তুপীকৃত করে রাখে। গৃহস্থালির অদাহ্য জ্বালানি, খাদ্যদ্রব্যের অংশ, ধাতব পাত্র, পরিত্যক্ত যানবাহন, অব্যবহৃত ষ্টোরেজ ব্যাটারি, কাচ, কাগজ প্রভৃতি অজৈব পদার্থ স্তুপীকৃত থেকে মাটি সংক্রমিত করে। মাত্রারিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলেও মাটি নাইট্রেট ও ফসফেট দ্বারা সংক্রমিত হয়। মাটিতে ধরে রাখা ভারী ধাতু উদ্ভিদ শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণিদেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৫. **প্লাষ্টিক ও পলিথিন দূষণ:** ব্যবহারের পর প্লাষ্টিক ও পলিথিন দ্রব্য আবর্জনা হিসেবে মাটির উপর ফেলে দেয়া হয় পলিপাটইনের চা-কাপ প্লাষ্টিকের বালতি, জগ, মগ, বাটি প্রভৃতির ভগ্নাংশ, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, পলিথিনের ব্যাগ, কলমের অংশ প্রভৃতি দ্রব্য যেখানে সেখানে ফেলে রাখার ফলে মাটি দূষিত হয়। প্লাষ্টিক ও পলিথিন দ্রব্যগুলো জৈব-অবক্ষয় মাটির সাথে মিশে না। দীর্ঘদিন জলবায়ুর উপাদানগুলোর সংস্পর্শে বর্জ্য প্লাষ্টিক ও পলিথিন থেকে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান নিঃসৃত হয়ে মাটি দূষিত করে। প্লাষ্টিক থেকে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে মাটির মৃতজীবী ও বিযোজক জীব মারা যায়। ফলে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ এবং পরোক্ষভাবে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী দেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।

চিত্র ৮ : পড়ে থাকা প্লাষ্টিক ও পলিথিনের সংস্পর্শে মাটি দূষিত হচ্ছে

৬. **অ্যাসিড দূষণ:** অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে উপরিস্তরের মাটির উৎকর্ষতা হ্রাস পায়। সুতরাং, বায়ু দূষণের পরোক্ষ প্রভাবে অ্যাসিড দ্বারা মাটি দূষিত হয়। বায়ুতে উপস্থিত সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে মাটির উপর এসে পড়ে। অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়।

৭. **তেজষ্ক্রিয় পদার্থ জনিত দূষণ:** কল-কারখানা ও পারমাণবিক পরীক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বর্জ্য এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুতে সংক্রমিত তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বৃষ্টির পানির সাথে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার ফলে মাটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা সংক্রমিত হয়। পারমাণবিক শক্তি জোনিত্র (plant) থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্যবস্তুর সংস্পর্শে মাটি সংক্রমিত হয়। এছাড়া মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ ও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে তেজষ্ক্রিয় কার্বন (C-14) মাটি সংক্রমিত করে। মাটিতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত রশ্মি এবং খাদ্য শিকলের মাধ্যমে জীবদেহে তেজষ্ক্রিয়তা পুঞ্জিভূত হয়ে মন্দ প্রভাব ফেলে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মাটি দূষকের প্রভাব (Effect of soil pollutants on human health)

মাটির জৈব, অজৈব ও জীবজনিত দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মাটি একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে রোগগ্রস্থ মানুষের শরীর থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে এবং রোগাক্রান্ত প্রাণি থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রমিত করে। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীর থেকে মাটিতে সংক্রমিত হয়, আবার মাটি থেকে সুস্থ্য মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও কৃমি, গোলকৃমি, হুকওয়ার্ম ও হুইপওয়ার্ম মাটি থেকে মানুষের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রমিত করে। আবার মাটিতে সৃষ্ট রোগবাহী পতঙ্গের মাধ্যমেও মানুষের শরীর আক্রান্ত হয়।

মাটি ও মৃত জৈব পদার্থের উপর বেড়ে উঠা ছত্রাক মানুষের সারকিউটেনিয়াস রোগের সৃষ্টি করে। প্রশ্বাস বায়ু ও ক্ষত স্থানের মাধ্যমে জীবগুটি (spore) প্রত্যক্ষভাবে মাটি থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি মাটি দূষক ভারী ধাতু প্রত্যক্ষভাবে বা খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। আবার কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, লতাগুল্ম নাশক দ্রব্য, পি.এ.এইচ, পি.সি.বি প্রভৃতি খাদ্য শিকলের মাধ্যমে জীবদেহে পুঞ্জিভূত এবং বর্ধিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।

৩.৬ তেজষ্ক্রিয় দূষণ (Radion Active Pollution)

তেজষ্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণের সময় তেজষ্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের ফলে পরিবেশের যে পরিবর্তন হয় তাই তেজষ্ক্রিয় দূষণ। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি তেজষ্ক্রিয় পদার্থের ব্যাপক ও অদূরদর্শী ব্যবহারের ফলে তেজষ্ক্রিয় দূষণের সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন জোনিত্র জ্বালানি হিসাবে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আবার পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে তেজষ্ক্রিয় শক্তি ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লীর তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তরের সময় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে পরিবেশের জৈব উপাদানের প্রাণপ্রবাহ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। এর ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং মানুষসহ বহু পাখি মারা যায়। অনেক উদ্ভিদ ও মানুষসহ প্রাণির চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে।

তেজস্ক্রিয়া দূষণের ধরন (Pattern of radion active pollution)

(ক) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় দূষণ: মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সাথে সাথে এর প্রভাবে স্বল্পায়ু মৌল কার্বন ১৪ এবং হাইড্রোজেন-৩ উৎপন্ন হয়। এই উভয় মৌল প্রত্যক্ষভাবে জীব জগতের ক্ষতি সাধন করে। উৎপন্ন কার্বন-১৪ ও হাইড্রোজেন-৩ দ্রুত কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং পানিতে জারিত হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলে প্রবেশ করে।

ভূত্বকে বর্তমান ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আকরিক থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হয়। এছাড়াও পটাসিয়াম-৪০ ও রুবিডিয়াম-৮৭ থেকেও তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে। প্রবাহিত পানি স্রোত তেজস্ক্রিয় আকরিক বিশিষ্ট পাহাড় ও মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় পানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়।

(খ) মানুষের সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণ: তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ, পারমাণবিক অস্ত্র ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের সময় তেজস্ক্রিয় দূষণের সৃষ্টি হয়। আবার গবেষণা কাজে ও চিকিৎসা প্রণালীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার করা হয়।

বাতাসে ভেসে বেড়ানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা ও তেজস্ক্রিয় গ্যাস শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফলে দেহকোষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। আবার খাবার পানি পান করার সময় প্রত্যক্ষভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রমণকে পরোক্ষ প্রভাব বলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তরের সময়ে মাটি ও পানি সংক্রমিত হয়। কতিপয় জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়। খাদ্য শিকলের মাধ্যমে তা উদ্ভিদ থেকে প্রাণি দেহে এবং প্রাণিদেহ থেকে মানুষের শরীরে প্রবাহিত ও সংক্রমিত হয়।

চিত্র ৯ : গাড়ির হর্ণ থেকে শব্দ দূষণ

৩.৭ শব্দ দূষণ (Sound Pollution)

একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের পারস্পরিক এবং ভৌত পরিবেশের সাথে প্রাণির মিথস্ক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম শব্দ। সুরযুক্ত শব্দ কোন শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে, সুরবর্জিত শব্দই দূষণের জন্য দায়ী। মানুষের কার্যকলাপ শব্দ দূষণের প্রধান কারণ। বনভূমি ধ্বংস, নগরায়ণ, শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির প্রসার, পরিবহণের প্রসার এবং মানুষের জীবন ধারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে শব্দ দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। এই শব্দ দূষণ দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এর দ্বারা নাক, কর্ণ, মস্তিষ্ক এদের উপর আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাত বারংবার হওয়ার কারণে মানুষের হৃদস্পন্দন, মস্তিষ্কক্রিয়া দেখা দেয় বা মাথায়, কানে আঘাতের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ দূষণের প্রভাব (Effect of Sound Population on Human Health)

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ দূষণের নানা ধরনের প্রভাব ফেলে। যেমন,

(ক) শব্দ দূষণের ক্ষণস্থায়ী প্রভাবঃ

- হঠাৎ তীব্র শব্দে কানের পর্দার ক্ষতি হয়, কখনও কখনও কানের পর্দা ছিড়ে যায়।
- শ্রবণতন্ত্রের যে কোনো অংশে ক্ষতির কারণে শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস পায়।
- অবিরত সূরবর্জিত শব্দ হতে থাকলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ শ্রবণে বাধার সৃষ্টি হয়।

(খ) শব্দ দূষণের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবঃ

- বিশেষ তীব্র শব্দে কানের মধ্যে শব্দ গ্রাহক কোষের ক্ষতি হলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে।
- সূর বর্জিত শব্দে কানের পর্দা চিরতরে নষ্ট হতে পারে। কানের মধ্যস্থলের তিনটি অস্থি থেকে মস্তিষ্কে শব্দ প্রবাহকারী স্নায়ুর (nerve) কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় বা বধিরতার সৃষ্টি হয়।

(গ) পরোক্ষ প্রভাবসমূহ

- সূর বর্জিত শব্দের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে হৃদস্পন্দন পরিবর্তিত হয়।
- সূর বর্জিত শব্দের প্রভাবে গড় রক্তচাপ বাড়ে।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তের গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রার কমে বা বাড়ে।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তে দানাযুক্ত শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ে।
- শব্দ দূষণের কারণে শ্বসনের (শ্বাস-প্রশ্বাস) হার পরিবর্তিত হতে পারে।
- সূরবর্জিত তীব্র শব্দের প্রভাবে শ্বসন গভীরতা বাড়ে।
- শব্দ দূষণের ফলে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে চোখের রন্ধ্রের প্রসারণ হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে চোখে বর্ণ প্রত্যক্ষকরণ কমে।

- শব্দ দূষণের ফলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সক্রিয়তা বাড়ে।
- শব্দ দূষণের ফলে বুকের স্নায়ুক্রিয়া হ্রাস পায় এবং চলাচল ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে ঘুমে ব্যাঘাত হয়, অনেকের স্বাভাবিক ঘুমের পরিমাণ বাড়ে।
- শব্দ দূষণের ফলে মাথা ধরা ও উত্তেজিত হবার প্রবণতা দেখা যায়।
- শব্দ দূষণের ফলে অনেকের স্মৃতিশক্তি কমে।
- শব্দ দূষণের ফলে অনেক শ্রমজীবী মানুষের মানসিক অবসাদ ও কাজে অনীহার সৃষ্টি হয়।

৩.৮ গন্ধ দূষণ (Odour Pollution)

প্রায় সব ধরনের বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জৈব অবক্ষয়যোগ্য উপাদান রয়েছে, যা উদ্বায়ী ও গন্ধ সৃষ্টি করে। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অস্বস্তিকর গন্ধ ছড়ায়। গ্যাসীয় অবস্থায় এগুলো নাকের মধ্যে প্রবেশ করলে নাক জ্বালা করে, শ্বাস আবরণী কলার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে ক্ষুদা মন্দা, মাথা ঝিমঝিম, বমি বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এ রকম গন্ধযুক্ত স্থানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলে গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলো রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের সাথে বাহিত হয়ে বিভিন্ন তন্ত্রে পৌঁছায় এবং তন্ত্রগুলোর অস্বাভাবিক কাজ বৃদ্ধি করে। বায়ুমণ্ডলের কয়েকটি প্রভাবকের উপর গন্ধের উপস্থিতি ও ঘনত্ব নির্ভর করে। গন্ধের উৎস, মানুষ থেকে এর দূরত্ব, বাতাস প্রবাহের গতিপথ, বাতাসের বেগ প্রভৃতির উপর গন্ধ দূষণ নির্ভর করে।

গন্ধের উৎস ও এর প্রভাব (Sources of odour and its effects)

যে সব যৌগ থেকে গন্ধের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. **গন্ধ বিমুক্তকারী, রেচনকারী ও ক্ষরণকারী জীবিত বস্তু :** কিছু সংখ্যক অণুজীব বা জীবাণু এবং প্রাণি নানা প্রকার গন্ধ সৃষ্টি করে। কিছু সরলবর্গীয় গাছ এবং উন্নত ধরণের কিছু উদ্ভিদ, রজন ও তারপিন জাতীয় গন্ধবহ পদার্থ ক্ষরণ করে; এগুলো তীব্র সুগন্ধি। মাইক্রোমোনোস্পোরো ও স্ট্রেপ্টোমাইসোটিস নামের পরভোজী ব্যাকটিরিয়াগুলো বিভিন্ন প্রকার গন্ধ ছড়ায়। অনুরূপ, অনাবিনা সারসিনালিস নামক নীলাভ সবুজ শৈবাল এবং ট্রাইকোডারমা নামক ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের গন্ধ ছড়ায়। বাঘ, সিংহ, কুকুর, ছুঁচো (চিকা), গান্ধীপোকা প্রভৃতি প্রাণির দেহ থেকে নির্দিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

২. **গৃহস্থালী ও শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত পদার্থ:** গৃহস্থালী ও শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিন প্রচুর গন্ধবাহী হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), অ্যামোনিয়া (NH_3) বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইন যৌগ, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড যৌগ, ফেনল, বিভিন্ন এস্টার, ক্লোরিন, ক্লোরিনযুক্ত বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ পদার্থ বেরিয়ে এসে পরিবেশ অস্বস্তিকর করে তোলে ও অস্বাস্থ্যকর গন্ধ ছড়ায়; অধিকাংশ সময় এই পদার্থগুলো জৈব ক্রিয়া ব্যাহত করে।

৩. **জৈব যৌগের জীবাণু ঘটিত পচন:** মৃত জীব দেহ থেকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ পচনকারী জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত ও সরলীকৃত হয়। এই সময় কটুগন্ধ সৃষ্টি লাভ করে পরিবেশ দূষিত করে তোলে। বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের ফলে নানা প্রকার জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল, মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_3S), অ্যামেনিয়া (NH_3) প্রভৃতি পরিবেশে মিশে নিজস্ব গন্ধ দ্বারা বায়ু দূষিত করে তোলে।

৪. **অতি পৌষ্টিকতা:** অধিকাংশ নীলাভ সবুজ শৈবাল দ্বারা বস্তু পচনের ফলে মিথেন (CH_4) এবং কিছু ক্ষতিকারক পদার্থের সৃষ্টি হয়ে কটু গন্ধ সৃষ্টি করে এবং জলাশয়ে জৈব অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি করে।

৩.৯ আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution)

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান এসব দেশে বহুকাল আগে থেকেই ওষুধ ও বিষ হিসাবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হচ্ছে। অজৈব পরিবেশের উপাদান হওয়ার সব সময়ই স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক পরিবেশ থেকে জীবদেহে সংক্রমিত হয় এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পুনরায় জীব দেহ থেকে পরিবেশে ফিরে যায়। মাটি ও পানি থেকে উদ্ভিদ আর্সেনিক গ্রহণ করে। খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে আর্সেনিক জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশে ফিরে যায়। আর্সেনিক সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট বিষক্রিয়া জীবজগতের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করে থাকে। আর্সেনিক সংক্রমণে মানুষসহ সমগ্র জীব পরিবেশের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে আর্সেনিক দূষণ বলে। বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই আর্সেনিক দূষণের কথা শুনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সোনারগাঁও, নোয়াখালী, যশোর, বরিশাল এবং ঢাকা আশপাশ জেলায় থানা বিশেষে আর্সেনিকের দূষণের প্রকোপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ক) মাটিতে আর্সেনিকের বণ্টন (Allocation of arsenic in earth)

প্রকৃতিতে সব সময়ই স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক থাকে। মাটির আর্সেনিকের অধিকাংশই লোহা, নিকেল ও সালফারের যৌগ হিসেবে রয়েছে। মাটি সৃষ্টিকারী শিলাই আর্সেনিকের প্রধান উৎস। শিল্প বর্জ্য পদার্থ ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্য মানুষের সৃষ্ট উৎস এবং এই উৎসগুলো মাটির আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মাটিতে স্বাভাবিক আর্সেনিক সংযুক্তিমাত্রা ৫ PPm। অবশ্য মানুষের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সংক্রামিত আর্সেনিকের মাত্রা এই মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। আর্সেনিক ও অন্যান্য বিষপূর্ণ (Toxic) পদার্থের সঞ্চয়, রূপান্তর ও বিস্তারে মাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কীটনাশক, লতা-গুল্ম নাশক, ছত্রাক নাশক হিসাবে আর্সেনিক যৌগের বেশি বেশি ব্যবহারের ফলে, মাটিতে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটি থেকে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল প্রভৃতিতে আর্সেনিক সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণিদেহে আর্সেনিক প্রবেশ করছে। প্রাণি ও লতাপাতা, ফলমূল ইত্যাদি থেকে খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে।

(খ) পরিবেশে আর্সেনিকের উৎসসমূহ (Sources of arsenic in environment)

ভূত্বকের সব জায়গায় আর্সেনিক মৌল রয়েছে। অ্যালবারটাস ম্যাগনাস ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে আর্সেনিক আবিষ্কার করেন। মাটি উৎপাদনকারী শিলায় পরিবেশের মোট আর্সেনিকের ৯৯ শতাংশের বেশি রয়েছে।

(১) প্রাকৃতিক উৎস (Natural source): আগ্নেয়শিলা বা রূপান্তরিত শিলার তুলনায় পাললিক শিলায় আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি আগ্নেয়গিরি, চুনাপাথর ও বেলে পাথরে আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব যথাক্রমে ১.৫, ২.৬ ও ৪.৪ PPm।

মাটি, উদ্ভিদ, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণি, সমুদ্র ও মাইক্রেবস এবং বায়ুমণ্ডল আর্সেনিকের অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস। উদ্ভিদ, প্রাণি, মাইক্রোবস ও বায়ুমণ্ডলের তুলনায় মাটি ও সমুদ্রে সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণ অনেক বেশি। সারা বিশ্বে মাটির গড় আর্সেনিক ঘনত্ব ৭.২ PPm হলেও অসংক্রমিত প্রাকৃতিক মাটিতে

স্বাভাবিক আর্সেনিক ঘনত্ব ৫.৬ PPm। অবশ্য স্থানভেদে এই ঘনত্ব স্বতন্ত্র। সালফাইড আকরিক সমৃদ্ধ মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ৮০০০ মিলিগ্রাম As/kg। সালফারের সাথে আর্সেনিকের সংযোগ আছে বলে কাঁদা, গ্যাস, ভূগর্ভের পানি ও মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি।

(২) মানুষের তৈরি আর্সেনিকের উৎসসমূহ: (Sources of man made arscnic):

- **খনি প্রক্রিয়া ও ধাতু নিষ্কাশন:** তামা, সীমা ও দস্তার আকরিকের সাথে প্রাকৃতিক ভাবে আর্সেনিক রয়েছে। খনি থেকে এই ধাতুর আকরিক ধাতবগুলো উত্তোলনের সময় এবং আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

- **কয়লা:** আর্সেনিক-পাইরাইট হিসাবে কয়লায় আর্সেনিক থাকে। এর পরিমাণ ১ মিলিয়াম/কে.জি. এর কম থেকে ৯০ মিলিগ্রাম/কে.জি. এর বেশি হতে পারে। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় এবং তাপ বিদ্যুৎ জেনিত্র ও রেলগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লা পোড়াবার সময় আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

- **কয়লা দহন উপজাত:** তাপ বিদ্যুৎ জেনিত্রে কয়লা পোড়াবার সময় নির্গত ফ্লাই-অ্যাশে (Fly-ash) সংযুক্ত আর্সেনিক দ্বারা মাটি সংক্রমিত হয়। প্রতি কিলোগ্রাম ফ্লাই-এ্যাশো সর্বোচ্চ ৬৩০০ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকে। কয়লার উপস্থিত +৩ এবং +৫ যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনিক পোড়াবার সময় তা গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। পোড়াবার পর কয়লা শীতলিকরণের সময় গ্যাসীয় আর্সেনিক ঘনীভূত হয়ে ফ্লাই-অ্যাশ কণার সাথে লেগে থাকে। ফ্লাই-অ্যাশ বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষেপিত হলে সেই আর্সেনিক মাটি ও পানি সংক্রমিত করে।

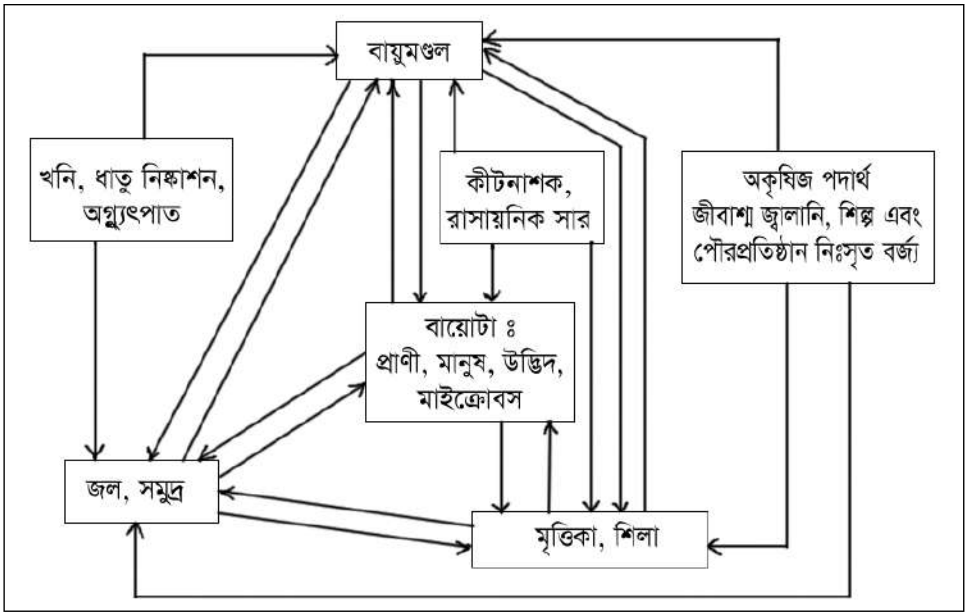

চিত্র ১০: আর্সেনিক চক্র দেখানো হয়েছে

- **নর্দমার আবর্জনা:** রাস্তার পাশের নর্দমার ময়লায় কিছু পরিমাণে আর্সেনিক থাকে।
- **ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণ:** মাটির কণার গায়ে আর্সেনিক লেগে থাকে। মাটিতে লোহা, অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড না থাকলে বা কম থাকলে মাটি বেশি পরিমাণে আর্সেনিক ধারণ করতে পারে না। ফলে পানির সাথে বিধৌত হয়ে মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে আর্সেনিক ভূগর্ভে পৌঁছায় এবং ভৌম পানি সংক্রমিত করে। এছাড়াও আর্সেনিক সমৃদ্ধ পাললিক শিলা, গন্ডশিলা ও গ্রানাইট শিলাস্তরে ও খনিজ আকরিকের সাথে সঞ্চিত আর্সেনিক ভৌম পানি আক্রান্ত ও দূষিত করে। [পানি দূষণ অংশে আর্সেনিক দূষণ আলোচনা করা হয়েছে।]

(গ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার প্রভাব (Perverse reaction of arsenic on human health)

আর্সেনিকের স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের গঠনগত ও কাজের অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধন করে, ফলে বিভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। বেশি মাত্রার আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় শ্বসন যন্ত্র ও পাকস্থলী প্রভাবিত হলে ৩০ মিনিটের মধ্যেই তার বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দেয়, অবশ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ ঘটলে এই বিষক্রিয়া লক্ষণ কিছু পরে দেখা দেয়। আর্সেনিক সংক্রমিত পানি পান করলে বা সংক্রমিত খাদ্য আহার করলে আর্সেনিক মানব দেহে ক্রমে অধিক থেকে অধিক হারে সঞ্চিত হলে তার দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণগুলো ক্রমে প্রকাশ পায়। এর ফলে মানব দেহে গঠনগত ও কার্যগত স্থায়ী অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে মানুষের মৃত্যু ঘটে। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য আর্সেনিক যৌগ খেয়ে ফেলার ৩০ মিনিটের মধ্যেই আর্সেনিক বিষক্রিয়া শুরু হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে কিছু বিলম্বে এর বিষক্রিয়া শুরু হয়।

১. পাকতন্ত্রের উপর আর্সেনিকের প্রভাব (Effects of arsenic on stomach)

- স্বল্প মাত্রায় আর্সেনিকের সংক্রমণের বিষক্রিয়ায় মুখগহ্বর ও গলা শুকিয়ে যায় ও ঢোক গিলতে কষ্ট হয়।
- অবিরত বমি বমি ভাবসহ পুনঃ পুনঃ বমি হয়।
- ক্ষুধা, পিয়াসা ও দৈহিক ওজন হ্রাস পায়।
- উর্ধ্ব ও নিম্ন উদরে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়।
- পেটে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- যকৃতের অস্বাভাবিকতা শুরু হয়, কখনও কখনও জন্ডিস রোগ শুরু হয়।
- নিঃশ্বাস বায়ু ও মলে রসুনের গন্ধ প্রকাশ পায়।
- পাকস্থলীর রক্তনালীর প্রাচীর নষ্ট হয়, রক্তনালী প্রসারিত হয়।
- পাকস্থলী ও আন্ত্রিক সরলপেশীর যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মধ্যবর্তী তীব্রতাসহ উদরাময় দেখা দেয়।
- চাল ধোয়া পানির মত পাতলা দুর্গন্ধময় মল সবেগে বেরিয়ে আসতে থাকে।

২. শ্বসন ক্রিয়ার উপর প্রভাব (Effects on exhalation)

- আর্সেনিকে আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- গ্যাসীয় আর্সেনিকের প্রভাবে ফুসফুসের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- ফুসফুসের রক্ত জালিকার প্রাচীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রক্তরস ফুসফুসে সঞ্চিত হয়।

- আর্সেনিক গ্যাসের প্রভাবে, রক্তের মাধ্যমে কলাকোষে অক্সিজেন পরিবহণে বিঘ্নিত হয়।
- ফুসফুসের প্রদাহ এবং হাপানির উৎপত্তি হয়।

৩. **ত্বকের উপর প্রভাব** (Effects skin)

- আর্সেনিক কণার সংস্পর্শে শরীরের চামড়ার সব জায়গায় ফুসকুড়ি দেখা দেয়।
- আর্সেনিক গুড়া বা কণার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে মুখ ও চোখের পাতায় জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়।
- পায়ের পাতা ও হাতের তালুর ত্বকে অতিরঞ্জন হয়।
- অপেক্ষাকৃত কালো দেহতট অধিকতর সৃষ্টি হয়।
- কখনও কখনও ত্বকে লাল সিটে চাগের সৃষ্টি হয়।
- হাত, পা, বুক ও মাথার চুল সামঞ্জস্যহীনভাবে ঝরে যায়।
- হাত ও পায়ের নখের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- হাত ও পায়ের নখে অসংখ্য সাদা ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- মুখগহ্বর ও কাঁধের ত্বকে নীলাভ লাল রক্তোচ্ছাপ ঘটে।
- সূর্যের আলোকে উন্মুক্ত দেহ ত্বক আর্সেনিক সংস্পর্শে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

৪. **রক্তের উপর প্রভাব** (Hematologic effects)

- অস্থিমজ্জার জনিত্ব কোষ থেকে রক্তকোষ উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- আর্সেনিক হিমোগ্লোবিন ও সংশ্লেষণে বাধা দেয়।
- আর্সেনিকের প্রভাবে হিমোলাইসিস ত্বরান্বিত হয়, রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়।
- রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- অ্যানিমিয়া ও থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া সংঘটিত হয়।

৫. **যকৃতের উপর প্রভাব** (Hepatic effects)

- যকৃতের (লিভারের) অসংশোধনযোগ্য অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়।
- যকৃতের ক্ষয়িষ্ণুতা ঘটে।
- চূড়ান্ত অবস্থায় যকৃতের আকৃতি বৃদ্ধি পায়, ইসোফেগাস থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং জন্ডিস রোগের সৃষ্টি হয়।
- অ্যালকোহল আর্সেনিক প্রভাবিত যকৃত সিরোসিসকে ত্বরান্বিত করে।
- আর্সেনিক যকৃত কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াকে বিনষ্ট করে।

৬. **বৃক্কের উপর প্রভাব** (Renal effects)

- আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বৃক্কে (কিডনী) অভিঘাত (shock) সৃষ্টি হয়।
- রক্তের আয়তন ও বৃক্কের রক্তচাপ হ্রাস পায়।
- বৃক্কের মূত্র উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বৃক্কের বহিরাংশ নষ্ট হয়।
- আর্সেনিকের ক্রিয়া দ্বারা, রেনাল ক্যাপিলারী, রোনাল টিবিউল এবং গ্লমেরুলাস বিনষ্ট হয়।
- মুত্রের মাধ্যমে রক্ত কণিকা নির্গত হয়।
- মুত্রের মাধ্যমে প্রোটিন নির্গমন শুরু হয়।

৭. **হৃৎপিন্ডের উপর প্রভাব** (Cardivasculer effects)

- আর্সেনিকের প্রভাবে রক্ত প্রবাহী শিরা, উপশিরাগুলো প্রসারিত হয়।
- রক্তের আয়তন ও প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস পায়।
- ভেন্ট্রিকলের স্পন্দন হার বৃদ্ধি পায়।
- হৃদপিণ্ড ও কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়।
- হৃদপেশীর গঠনগত অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়।
- হাত ও পায়ের কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী রক্তনালীর ব্যাস হ্রাস পায়। ফলে হাতের পাতা ও পায়ের তলায় কালো ও পিণ্ডাকৃতি ক্ষত সৃষ্টি হয়।

৮. **স্নায়ুর উপর প্রভাব** (Neurological effects)

- কেন্দ্রিয় ও প্রান্তীয়স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনের অ্যাক্সল বিনষ্ট হয়।
- স্পর্শ ও যন্ত্রণা অনুভূতি লোপ পায়।
- প্রসারিতকরণ মাংসাপেশীর পক্ষাঘাত ঘটে।
- হাতের আঙ্গুলে কম্পন দেখা দেয়।
- স্পর্শ, চাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতির অনুভূতি লোপ পায়।
- সুষুম্মাকাণ্ডের অঙ্কীয় শৃঙ্গের বক্ষীয় স্নায়ুকোষ বিনষ্ট হয়।
- গ্রন্থিভাঁজ করার সহায়ক ক্লেক্সর মাংসপেশী ও অঙ্গ প্রসারিতকরণ এক্সটেনসার মাংসাপেশীর ক্ষয়িষ্ণুতা ঘটে এবং সংকোচন ক্রিয়া হ্রাস পায়।
- মাথা ধরা, স্মৃতি শক্তি লোপ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্থির নিদ্রা ও অনিয়ন্ত্রিত মূত্র ক্ষরণ দেখা দেয়।

৪. পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিসমূহ (Government Policy for Environmental Management to Reduce Pollution)

দূষণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ জোটবদ্ধ হয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে। দূষণ অর্থনীতিও প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন ও সমতায়নে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক জোট দলবদ্ধভাবে কাজ করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি উন্নত দেশগুলোর উপর যারা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী তাদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের উচিত পরিবেশ ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেয়া। এজন্য পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জনগণের বিদ্যমান জীবন-জীবিকার চাহিদা এবং সুষ্ঠু পরিবেশগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাস্তবভিত্তিক সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। এর কার্যক্রম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যবস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ এর আওতাভুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধির মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যকর করা হয়। এই কর্মসূচিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলমান থাকবে এবং শক্তিশালী করা হবে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ, আন্তর্জাতিক কনভেশনের বাস্তবায়ন এবং সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রোটোকল এবং দেশে বিদ্যমান পরিবেশ আইন বাস্তবায়ন কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কর্মসূচি গ্রহণ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত পরিকল্পনা সময়ে বিপুল পরিমাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি, সরকার কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়ন এবং রক্ষার জন্য আরও বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি হলো:

(ক) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি/নীতি (Controlling program/policies for air pollution)

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ (ইসিএ, ৯৭) বায়ুদূষণের বহুমুখী ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সংশোধনী গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরের বিদ্যমান বায়ুদূষণের বর্তমান ধারার উর্ধ্বগতি অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারি হতে টু-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়। ২০০৫ সালের ১৯ জুলাই তারিখে ইসিআর৯৭ এ উল্লিখিত বায়ুর আদর্শমান সংশোধন করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) ক্লিন এয়ার এবং টেকসই পরিবেশ এর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যাতে শহর এলাকার বায়ুর বিভিন্ন প্রকার দূষণ চিহ্নিত এবং এ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) বায়ু দূষণ রোধের জন্য ইট ভাটাগুলোতে জ্বালানি সাশ্রয় পদ্ধতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং মূল্যবান বনজ সম্পদের ক্ষতি এবং কৃষিভূমি অবনতি না করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইট ভাটা হতে নির্গমন প্রশমনের জন্য ডিওই সম্প্রতি একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যে, ২০১০ সালের পর হতে ১২০ ফুট স্থায়ী চিমনি অনুমোদন দেয়া হবে না। জিগজ্যাগ, হাইব্রিড হাফম্যান এবং উলম্ব স্তম্ভ আকারের ইট ভাটা প্রতিস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা হবে। ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধান এবং বিষাক্ত নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাস্তবে কোনো ব্যবস্থাই কাজে আসেনি।

(খ) যানবাহন সংক্রান্ত বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of vehicular air pollution)

বাংলাদেশের বড় শহর, বিশেষ করে ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের অন্যতম একটি বড় কারণ যানবাহন হতে নির্গমন। যানবাহন হতে নির্গমন কমানোর জন্য সিএএসই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যাবলি গ্রহণ করা হবে এবং এর মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থার গতিময়তা বৃদ্ধি এবং পথিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; যানবাহন সংক্রান্ত ট্রাফিক গতিময়তা এবং পথিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং রাস্তার যানবাহন পরিবীক্ষণ এর মাধ্যমে যানবাহন সংক্রান্ত ট্রাফিক গতিময়তা এবং মান উন্নয়ন কার্যকরী করা। শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা জোরদার করা উচিত। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ ও পরিবহন সমস্যা সমাধান করা না গেলে শহরে বাস করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

(গ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of noise pollution)

ঢাকা শহরে শব্দ দূষণ হচ্ছে যেখানে সেখানে এবং যখন তখন শব্দ করা থেকে বিরত থাকার আইনিব্যবস্থা। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ জনগণসহ সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের মতামতের আলোকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৬ আইন পাশ করা হয়। ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের কিছু শহরে বিভিন্ন ধরনের দূষণের মধ্যে শব্দদূষণ সবচেয়ে খারাপ দূষণগুলোর অন্যতম। পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০ সালের মধ্যে ৯০-১১০ ডেসিবেল হতে ৪৫-৫৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দদূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বাস্তবে এ কাজের গতি বৃদ্ধি পায়নি। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-শৃংখলার লোকদের প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(ঘ) শিল্প সংক্রান্ত দূষণ ব্যবস্থাপনা (Management of industrial pollution)

বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবিত শিল্প সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এনভাইরনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ইসিসি) বিতরণ করা হয় (ইসিএ, ৯৫ এবং ইসিআর, ৯৭ অনুসরণে)। একমাত্র এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর যে শিল্প সংক্রান্ত প্রস্তাবিত উদ্যোগটি গ্রহণযোগ্য এবং এ শিল্পের দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকবে। উচ্চ দূষণ মুক্ত শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে ইসিসি কেবল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি)-স্থাপন এবং এ সমস্ত প্লান্ট (ইটিপি) এর ফলপ্রসূতা প্রমাণিত হবার পর দেয়া হয়।

২০০২ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ কালে ১১,১৪৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫২৪টি প্রতিষ্ঠানকে ইসিআর, ৯৭ অনুযায়ী রেড ক্যাটাকরি হিসেবে চিহ্নিত করে। ৫২৪টি লাল তালিকাভুক্ত শিল্প কারখানার মাঝে ৪১৭টি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপিমস স্থাপন করে এবং ১০৫টির কোনো ইটিপি বিদ্যমান ছিল না। শিল্প আইনে দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে কাজে লাগাতে হবে।

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Conservation of biological diversities)

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে ৮টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas) হিসেবে ঘোষণা করে। যথাঃ কক্সবাজার এবং টেকনাফ উপ-দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত হাওর, গুলশান বারিধার লেক এবং সুন্দরবনের ১০ কিমি এলাকা। ২০০৯ সালে ঢাকা শহরের ৪টি (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ) নদী ও নদকে ইসিএ ঘোষণা করে এর সংখ্যা ১২-তে উন্নীত করা হয়। কক্সবাজার, টেকনাফ উপ-দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওর এর জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানকে সুবিন্যস্তকরণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য এবং অন্যান্য ইসিএসমূহের সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(চ) ইকোসিস্টেম নিশ্চিতকরণ (Perfection of Ecosystem)

ভারসাম্যপূর্ণ ইকোসিস্টেম এবং পরিবেশ এর জন্য পার্বত্য এলাকাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার মার্চ, ২০০২ সালে অবৈধ পাহাড় কাটাকে নিষিদ্ধ করেছে। পাহাড় কাটা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে অবৈধ পাহাড় কাটার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas)-এর নোটিশ জারি হয়। এই এলাকা হলো দশ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সুন্দরবন সংরক্ষিত বন, কক্সবাজার এবং টেকনাফ সমুদ্রতীর, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজপট হাওর এবং গুলশান লেক। এ সব এলাকা থেকে গাছপালা সংগ্রহ, শিকার করা, বন্য পশু ধরা বা হত্যা করা, শিল্প উন্নয়ন, মাছ ধরা বা মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো কাজ করা অথবা কোনো কাজ যা এই এলাকার মাটি বা পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা পরিবর্তন করে সেই সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বন, পাহাড়, নদী-নালা, হাওর দ্বীপ ইত্যাদিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এর জন্য রাষ্ট্রকেই জোর পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্রের জনবলকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(ছ) ওজোন স্তর রক্ষা (Protection of ozone layer)

বাংলাদেশ ঐসব দেশের মধ্যে অন্যতম যারা ওজোন স্তর রক্ষার জন্য এবং এ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী গৃহীত কার্য সম্পাদনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী বস্তু সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রটোকল-এ প্রবেশের পর বাংলাদেশ-এর সব ধরনের সংশোধনে স্বাক্ষর প্রদান করে যথা–লন্ডন সংশোধন, মনট্রিল সংশোধন, কোপেনহেগেন সংশোধন এবং খুব সম্প্রতি বেইজিং সংশোধন। ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি হতে বাংলাদেশ এ্যারোসোল সেক্টর, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার সেক্টর, অন্যান্য বাণিজ্যিক সেক্টর হতে সিএফস্থিস (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন) পরিত্যাগ করেছে। মনট্রিল প্রটোকল অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে কিছু পরিমাণ সিএফস্থিস মিটারডডোস ইনহেলারস (এমডিআই) তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণত এ্যাজমা রোগীদের জন্য এবং ইসেনশিয়াল ইউজ নোমিনেশন (ইইউএন) এর আওতায় সিওপিডি রোগীদের জন্য কিছু সিএফসি ব্যবহৃত হয়। ২০১২ সালের মধ্যে সিএফসি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। তা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি। পরিবর্তনমূলক কৌশল এবং রূপান্তরের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এমডিআই প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো হতে এমডিআই তৈরিতে ব্যবহৃত সিএফসি পরিত্যাগের বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা দেয়ার কথা রয়েছে।

(জ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Wastage management) নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে গৃহস্থালী এবং অন্যান্য নানাবিধ বর্জ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্জ্যের আয়তন এবং পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে বর্জ্য পুনঃব্যবস্থার এবং বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ন্যাশনাল থ্রি-আর (রিডিউস, রি-ইউজ, এন্ড রিসাইকেল) প্রোগ্রাম ইউনাইটেড ন্যাশনাল সেন্টার ফর রিজিউনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি) এর সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকার পুনঃব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্জ্যের হ্রাসকরণ, পুনঃব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে একটি জাতীয় কৌশল গঠন করা হয়েছে। দেশে পশুসম্পদ এবং হাঁস-মুরগী বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে গোবর এবং হাঁস-মুরগীর বিটা আবর্জনা উৎপাদিত হচ্ছে। এই জৈব পদার্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জৈবসার-এর ভাল উৎস হতে পারে।

(ঞ) নদীরক্ষা নিশ্চিতকরণ (Saving the river)

ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় অবৈধ দখলের পর্যায়ে প্রশমনের বিষয়ে এবং নদী দূষণের পরিমাণ কমানোর উপায় বের করা পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়েছে:

- নদী পাড়ের বিভিন্ন কাঠামোর উপর জরিপ পরিচালনা করা এবং দখলদাররা কীভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করছে তা নিরূপণ করা এবং ভবিষ্যত অবৈধ স্থাপনা উৎখাতের কার্যাবলির পরিকল্পনা তৈরি করা।
- নদীর দুইপাড়ের শিল্পকারখানায় দূষণ চিহ্নিত করা, শ্রেণিবিভাগ করা এবং দূষণ কমানোর জন্য সুপারিশ তৈরি করা;

- বুড়িগঙ্গা নদীতে বর্জ্য নিঃসরণের হার ও এর দূষণ মাত্রা নির্ধারণ করা এবং এর সুব্যবস্থাপনার জন্য পরামর্শ বা সুপারিশ তৈরি করা।

জানুয়ারি, ২০১০ হতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটি ঢাকা শহরকে ঘিরে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদী পরিদর্শন করে এবং নিমজ্জিত বর্জ্য সরানোর কাজ শুরু করে:

- নদীর পানির মান পরিবীক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, পানির মান পর্যবেক্ষণ করা, কারণ এবং উৎস খুঁজে বের করা, এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিল্প এলাকায় আকস্মিক পরিদর্শন পরিচালনা করে আইন অমান্যকারী দূষণ মুক্ত শিল্প কারখানা চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারের আইনের আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে হাইকোর্টের রায় অনুসরণে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে যাতে ঢাকা শহরের চারদিকে বেষ্টিত নদীসমূহ সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

(ট) পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ এবং বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ (Ban for polythene shopping bag)

বাংলাদেশ সরকার ১ মার্চ, ২০০২ হতে সারাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং কার্যকর করে। একই বছর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ '৬-K' নামে একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সমিতি এবং চেম্বার অব কমার্স এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের তৈরি খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারজাত করণে সমস্যা বিবেচনা করে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এর '৬-K' অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এনে দ্রব্য সামগ্রী প্যাকেটজাত করণের জন্য ৫৫ মাইক্রোন এর কম পুরু পলিথিন শপিং ব্যাগকে মাছের চালান পরিবহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর পলিথিন ব্যাগের উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং ঘনঘন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে।

(ঠ) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ (Medical waste management and Controll)

চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির আওতায় 'মেডিক্যাল ওয়াস্ট (ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্রসেসিং) রুলস-২০০৮' জারী করে। এই আইন পরিবেশগত নিরাপদ বিযুক্তি প্যাকেটজাতকরণ, মজুতকরণ, পরিবহণ, চিকিৎসা এবং সর্বশেষে ধ্বংসকরণ পর্যন্ত বিষয়ে যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। বেসরকারি বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিজ এর সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কার্যকরভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগত সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করে। জাইকা-এর সহযোগিতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২০ বছরের মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধির চাহিদা অনুযায়ী সার্বিক দিক নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

(ড) পরিবেশ রক্ষায় এনজিওদের কার্যাবলি (Function of NGO's to environment conservation)

সরকারের সহযোগিতায়, কিছু সংখ্যক এনজিও ১৯৮০ সাল হতে দেশের দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশ এর সমস্যা এবং পরিবেশগত পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিছু এনজিও পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দা কনভারশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন), সেন্টার ফর সাসটেইনেইবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভ্যান্সড স্টাডিস (বিসিএস), এনভাইরনমেন্টাল কনভারসন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) ইত্যাদি। দূষণ অর্থনীতি, পরিবেশ সুরক্ষা, গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দূষণ অর্থনীতির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করছে।

(ঢ) বনজ সম্পদ সংরক্ষণ (Conserving forest resources)

বন বিভাগ ভৌত, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করা এবং টেকসই ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পুরাতন ধরনের পদ্ধতি। শুরুতে বন বিভাগের প্রধান কাজ ছিল বনকে রক্ষা করা এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বন সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জীববৈচিত্র্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে ভূমির ২০ শতাংশ বনায়নের আওতায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণ এবং বন্য পশু, পাখি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য ২৮টি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ১৯টি এলাকাসহ ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ১৯৮১ সাল হতে বন বিভাগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় ৪টি সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বনবিভাগ এ সব সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। গত তিন বছরের বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন বিষয়ে ৪৬,০২১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা দরিদ্র গ্রামীণ জনগণকে এ সম্পদ হতে লাভবান হতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬,৪৮৪ হেক্টর অবৈধ এবং পতিত বন এলাকা ইতোমধ্যে সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়। বনায়ন কর্মসূচিতে যোগদানের পর মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দূর হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কেবল কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ফল সরবরাহ এবং পরিবেশের অবস্থার উন্নয়ন করে না, এটি দারিদ্র্য দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ণ) পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা ও সংরক্ষণ (Environmental health problem and protection)

পরিবেশগত স্বাস্থ্য বলতে মানব স্বাস্থ্য এবং রোগের ঐ সকল দিকের সংগঠন যা পরিবেশের উপাদানসমূহ নিরূপণ করে থাকে। পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হলো শিল্প সংক্রান্ত এবং

চিকিৎসাগত বর্জ্য, দূষিত বায়ু এবং পানি নির্গমন, মানব বর্জ্য, ভোগ্যপণ্য, জীবন-ধারণ মান এবং আয়নিত ও আয়নিত হীন বিকিরণ। স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সম্পর্কিত পরিচিত এবং সন্দেহজনক পরিবেশগত রোগের কারণের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, ক্যান্সার, হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ, এ্যাজমা এবং অন্যান্য শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ, এলার্জি, স্নায়ু বিষাক্ততা এবং স্নায়ু বৈকল্য, পাকস্থলী ও আন্ত্রিক জনিত রোগ, ক্রমবর্ধমান এবং জন্মগত অপ্রকৃতস্থতা এবং তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির পরিণাম সম্পর্কে অন্যান্য দেশে বিদ্যমান পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশে দূষণ এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু বাংলাদেশে এই অসুবিধা মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং সীমিত কিছু পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য নীতি রয়েছে। একটি জাতীয় পরিবেশ স্বাস্থ্য কর্মসূচির মূল কার্যকরী উপাদান হিসেবে গবেষণা কৌশল, পরিবীক্ষণ, সক্ষমতা উন্নয়ন, মূল্যায়ন এবং পরিবেশ ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস এবং বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ জানানোর জন্য প্রতিষ্ঠানিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ মানোন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত তৈরিতে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটি সামগ্রিক পরিবেশ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সক্ষমতা এবং একটি ব্যবহারিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত খাতগুলোর উন্নতি সাধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণার অন্তর্ভুক্তি, সরকার, শিল্প এবং এনজিওসমূহ-এর পাশাপাশি এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা গঠন করা প্রয়োজন।

৫. পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ (International enterprising of environmental protection)

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conference on the human environment) এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) এর সুপারিশমালা গ্রহণ আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়াটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশন। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল এপ্রিল, ২০১২ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। ২০১২ সালে Kyoto Protocol-এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol এর স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবদান মাত্র ২৭ ভাগ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocal এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ ভাগে নেমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তালিকা সারণি-১ এ দেয়া হলো :

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ডিসেম্বর ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

সারণি ১ : বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের বিবরণ

স্বম্ছত্রন্দ্রm	ণ্ডাn	ব্রছন্ধত্রক ছব্য ণ((((:স্বন্ধশ্চত্রুছ ব্রন্ধ স্ছর্ত্রnত	দ্রস্ন্ডছন্ধত্রক ব্রm
নথK	স্ক্ষাK	য]যননK	পভথকK
পথK	ত্ত লক্রK	ভ]বপভK	নযথরK
ফথK	লক্রুজ্জগুর্বKক	ন]ভযপK	ভথপK
বথK	দ্বক্লচ K	ন]মধপ K	ভথযK
ভথK	কক্রুগুক্যK	ন]ধলর K	ফথমK
মথK	কক্র ব্রKক্ষ	যমম K	পথভK
যথK	ব্ক্যক্রুজ্জK	ভবনK	নথরK
রথK	ত্ত লক্র K	ভপধK	নথষK
লথK	জৈ্জ ঘদ্দ্বক্রজ্জবটর্বK	ভপরK	নথষK
নধথষK	ৣক্য K	ভপযK	নথষK

উৎস : *EIA (Energy Information Administration) এর ২০০৯ সালের তথ্য।*

সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে "কোপেনহেগেন সমঝোতা" নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমণ কমিয়ে আনার নিমিত্ত একটি "বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি" প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে সুপারিশ করা হয়। সল্পোন্নত দেশসমূহের নাজুকতা উপলব্ধি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো যৌথভাবে প্রতিবছর ১ হাজার কোটি ডলার দেয়ার সুপারিশ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- পরিবেশ সংরক্ষণে পানি, বায়ু, মাটি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ; পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাটরোধ, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও এর পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়, রিডিউস-রিইউজ-রিসাইক্লিংকে (থ্রি-আর) উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
- শিল্প বর্জ্য, ভূ-উপরিস্থ পানি, বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে কার্যকর অবদান রাখা;
- পরিবেশ আইন ও বিধিমালার যুগোপযোগীকরণ এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের যথার্থ প্রয়োগ;
- পরিবেশ আদালতে মামলা পরিচালনাসহ উচ্চ আদালতে রীটমামলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মিট দ্য পিপল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা শ্রবণ যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে পরিবেশ বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে যেসব কাজ হয়েছে:

- পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে গত পাঁচ বছরে নতুন ৮১২টি শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।
- একই সময়ে প্রায় ২১৪১টি বায়ু দূষণকারী ইটভাটা আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
- বায়ুমান পরিবীক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- Pollutes Pay Principle-এর আওতায় শিল্পদূষণ, বায়ু দূষণ, পাহাড় কাটা, নদী ও জলাশয় ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের জন্য গত জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ১৭৮৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ১০৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।
- গত পাঁচ বছরে অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী ৬৪২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২৬৭ টন পলিথিন জব্দ, ৬২টি কারখানা বন্ধ এবং প্রায় ৪ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

৬. প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণ নীতি প্রয়োগযোগ্যতা ও বাস্তবায়ন (Applications for Growth and Equity in Pollution Policy)

প্রবৃদ্ধি ও সমতার জন্য দূষণ নীতির কতগুলো কর্মসূচি (programs) বা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সমতায় কতগুলো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে (৪ অনুচ্ছেদ) এই নীতিগুলো বাস্তবতায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আলোচনার বিষয়।

১. বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা শহরে টু-স্টোক থ্রি-হুইলার (১ জানুয়ারি ২০০৩ সালে) যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে পুরাতন গাড়ির কালো ধোয়ার বিষয়ে নোটিশ করা হলেও বাস্তবে তা আইনের সামনে চলমান আছে। বায়ু দূষণকে আরও বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত লোক নিশ্চয় বিনিময়ের কারণে কোনো কথা বলছে না। ২০১০ সালের পর ১২০ ফুট ইট ভাটার চিমনীর জন্য দীর্ঘস্থায়ী অনুমোদন দেবে না। বাস্তবে তা প্রয়োগ হয়নি।

২. যানবাহনের কালো ধোয়া নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বে ট্রাফিক ব্যবস্থা কাজ করার কথা। বাস্তবে, তারা নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য তা নিয়ন্ত্রণ করছে না।

৩. শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০০৬ সালে আইন পাশ হয়। ২০১০ সালের মধ্যে ৯০-১১০ ডেসিবেল হতে ৪৫-৫৫ ডিসেবেল পর্যন্ত শব্দ দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি।

৪. শিল্প সংক্রান্ত দূষণ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকার আইন করা হয়। বাস্তবে জরিপ গবেষণায় ৫২৪টি শিল্প তালিকাভুক্ত। শিল্প কারখানার মধ্যে ৪১৭টি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপিমস স্থাপন করে এবং ১০৫টির কোনো ইটিপি বিদ্যমান নেই।

৫. বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৮টি এলাকাকে সংকটনাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যেমন–কক্সবাজার, টেকনাফ উপদ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত হাওর, গুলশান বারিধারা লেক, সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এলাকা। এছাড়া ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষা, তুরাগ, বালুনদী সংকটাপন্ন ঘোষণা করা হলেও পরিবেশগত প্রবৃদ্ধি ও সমতার লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে হয়নি।

৬. ইকোসিস্টেম এর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বার বার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাজ শুরু হলেও দীর্ঘসময় চলেনি। ফলে, অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৮. নদীরক্ষার বিষয়ে সবগুলো জেলা পরিষদ হাইকোর্টের আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

৯. পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ আইন থাকলেও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালগুলোর উপর লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপিলিটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আইনত ভূমিকা পালনের কথা।

১১. ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট, নগরবাসীর ফুটপাথ রক্ষার ক্ষেত্রে নগর পিতারা এখনও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। উদ্যোগ নিলেও হকার আন্দোলন, রাজনৈতিক দলের লোকদের অসহযোগিতার কারণে দখলমুক্ত করতে পারেছে না।

পরিবেশগত সমতা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আইন, গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসেনি।

৭. উপসংহার (Conclusion)

দূষণ অর্থনীতির মাত্রাগত ব্যাপ্তি যেসব কারণে হয়ে থাকে যেমন বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, মাটি দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ, শব্দ-দূষণ ইত্যাদি পরিবেশকে মারাত্মক দূষণের দিকে নিয়ে যায়। আর এসব দূষণ সৃষ্টির মূলে মানুষই দায়ী। প্রাকৃতিকভাবে যেরূপ দূষণ সৃষ্টি হয় তা প্রাকৃতিকভাবে পরিশোষণ হয়ে থাকে বিধায় প্রাকৃতিক দূষণকে সমস্যা বলে মনে করা যায় না। সমস্যা আছে মূলত মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ ও দূষণ অর্থনীতি, দূষণ পরিবেশ যা মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য সমতায়নে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য উন্নয়নশীল দেশ যারা দূষণ দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে এর কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব। এজন্য উন্নত দেশ যারা বিশ্বব্যাপীদূষণ অর্থনীতির জন্য দায়ী তারা ক্ষতিপূরণ দেবে পরিবেশের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে। এই ক্ষতিপূরণ দ্বারা দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশ যতটুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো তারা নিজেরাই নিজেদের দেশ ও পরিবশকে দূষণ করছে। যেমন বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় বৈর্জ্য নদী-নালা, খাল-বিলে প্রবাহিত হওয়ার কারণে পানি, বায়ু, মাটি, গন্ধ, শব্দ, আর্সেনিক দূষণ দ্বারা মানুষ ও প্রাণীকূল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মনুষ্য সৃষ্ট দূষণের কারণে নিজস্ব দেশের জলবায়ু আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতি, অর্থনীতির ব্যক্তি এবং দেশের সরকার, দেশের মানুষের বিশুদ্ধ নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা কম করছে। রাজনীতি, অর্থনীতির, সামাজিক অস্থিতিশীলতা

ও অস্থিরতার কারণে এসব বিষয়ে কম ভাবছেন। গুটিকয়েক ব্যক্তি, কয়েকজন সমাজসেবক ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক ভাবছেন, তারা সেমিনার, সিমপোজিয়াম, মানব বন্ধন, লং মার্চ করে যাচ্ছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূষণে আক্রান্ত সব পরিবেশ ও এর মানুষ-জনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নৈতিকতার আদর্শকে সবার মাঝে জাগ্রত করতে হবে। এক্ষেত্রে গুটি কয়েক সচেতন নাগরিক ও সংস্থা কাজ করলে চলবে না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, সংস্থা, দপ্তরকে আর্থিক সহযোগিতাসহ এগিয়ে অসতে হবে। দেশের সব এলাকার মানুষের মধ্যে সেচ্ছায় সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। তবেই কেবল দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সফলতা আসবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর যারা পরিবেশকে দূষণ করে যাচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণ নয় বহুগুণে বাড়ালেও কাজে আসবে না। রাষ্ট্র, দেশ, মানুষ, সমাজ সবাই সচেতন থেকে কাজ কারলে দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আনা দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব।

তথ্যসূত্র

1. Anastasios, X. (1997); Advanced Principles in Environmental Policy, Edward Elgar.
2. Barry C Field; Environmental Economics, An Introduction.
3. Baumol, W.J. and W.E. Oates, (1988); The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press.
4. Clifferd, S.R. (2001); Applying Economics to the Environment, Oxford University Press.
5. David, P. et al. (1990); Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World, Edward Elgar.
6. Eugine, T; Environmental Economics, Vrinda Publication (P) Ltd. University of Massachusetts Megraw Hall Co. N.Y.
7. Goldin, Ian and L. Alan Winters, ed., (1995); The Economics of Sustainable Development, Cambridge University Press.
8. Gunter, S & Jeremy J. Warford. (1994); Environmental Management and Economics Development, John Hopkins University Press.
9. Keith, C. (2000); Economic Development and Environmental Gain, Earth Scan Publication Ltd.
10. Pearce, David and et al., (1990); Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World, Edward Elgar Publishers Ltd.
11. Pearce, David W and R. Kerry Turner; Economic of Natural Resources and the Environment, Harverter Wheatsheat, N.Y. Mayur Vihar, Delhi-110001.
12. Pearce, David W. and Jeremy J. Warford, (1993); World Without End : Economics, Environment and Sustainable Development, Washington D.C. : Oxford University Press.
13. Rajarathanam, K. (1993); Development and Environmental Economics, C.R.N.I.E.O.
14. Rouf, Dr Kazi Abdur; Environment and Resource Management, Shujonesu Prokashani, Dhaka-1100.
15. Rouf, Dr Kazi Abdur; Geography and Human Environment, Shujonesu Prokashani, Dhaka-1100.
16. Scott, J & Janet M. Thomas; Environmental Economics and Management, Harcourt College Publishers.
17. Seneca, Joseph. J. Taussing M. K. (1979); Environmental Economics, New Jersey, Prentice Hall.

18. Thomas, H. (1999); Environmental and Natural Resources Economics, Addison Wesley Publications.

19. William, A (1991); The Encyclopedia of Environmental Studies, Facts of Life.

20. সিকদার, জহিরুল ইসলাম; জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ২০১৫।

21. সিকদার, জহিরুল ইসলাম; পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ২০১৫।

22. নিশাত, আইনুন; পানি বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ, দৈনিক প্রথম আলো।

23. স্যাকস, জেফরি; কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নের অধ্যাপক।

24. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫); সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

25. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪।

26. বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১; রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

27. বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৪, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

28. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 163-176
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা

সাজ্জাদ আলম খান*

সারকথা: *অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা ক্রমশই এগোচ্ছে। বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, অনলাইন বার্তা সংস্থায় এ সাংবাদিকতা এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। পৃথকভাবে রেডিও, টেলিভিশন আর অনলাইনে প্রচার হচ্ছে অর্থনৈতিক সংবাদ। সংবাদপত্রেও এ নিয়ে রয়েছে বিশেষ পাতা। এক সময় বাজেট কাভার, ব্যাংক-বীমা-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি আর সরকারি-বেসরকারি কোম্পানির উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রচার হতো। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে- পণ্য বাজার পরিস্থিতি, পুঁজিবাজার, মুদ্রাবাজার, বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, রাজস্ব আহরণ, সঞ্চয়ের নানামুখি পণ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সমবায়ভিত্তিক তৎপরতা, উন্নয়ন প্রকল্পসহ নানা বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা প্রকাশ করছেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লুটপাটের নানা কাহিনী। অদক্ষতা আর অদূরদর্শিতার কারণে ব্যয় আর দুর্ভোগ বাড়ছে যাপিত জীবনে। ব্যষ্টিক আর সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরতে গণমাধ্যমে চলে রীতিমতো প্রতিযোগিতা। আর এসব সংবাদ যারা প্রস্তুত করেন, তারা উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হবেন- এমন প্রত্যাশা সবাই করেন। সংবাদ পরিবেশনের বিনিময়ে কোন উপহার সামগ্রী বা সুবিধা নিলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এ বিষয়টি যেন সাংবাদিকরা ধারণ করেন, সে প্রত্যাশা রয়েছে পাঠক মহলে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যারা সম্পৃক্ত সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখার মতোই তাদেরও আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। কিন্তু, নৈতিকতা ও আচরণবিধি এক নয়। নৈতিকতা আইনি বিষয় নয়। কারও সুপারিশে এটা মেলে না। কেউ এটা চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রতিটি সংবাদমাধ্যম জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। তারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা এনে দিতে পারে কিংবা এর বিপরীতটা করতে পারে। একজন ব্যক্তির ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হতে পারে কিংবা কাউকে সমাজের কাছে বড় করে তুলতে পারে। এ কারণেই ভুল পথে চললে কিংবা উদ্দেশ্যমূলক কিছু করা হলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এখানেই নীতি ও নৈতিকতার বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ।*

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা কী?

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাকে যদি সংবাদপত্র বিহীন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র বিহীন সংবাদপত্র, এই দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি

* বিজনেস এডিটর: যমুনা টেলিভিশন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এবং ইকনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)

অবধারিতভাবে পরেরটি বেছে নেবো'। এ মন্তব্য থেকে সাংবাদিকতার গুরুত্বের বিষয়টি বোঝা যায়। সাংবাদিকতা হল বিভিন্ন ঘটনাবলী, বিষয়, ধারণা, ও সর্বোপরি মানুষ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি ও পরিবেশন, যা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। একজন সাংবাদিক যোগাযোগের এই মেলবন্ধন তৈরি করেন সময়ের সাথে সময়ের। এ কারণে সাংবাদিকতা দায়িত্বশীল পেশা। সংবাদকে বলা হয় ইতিহাসের প্রথম খসড়া। আজ যা খবর, আগামীকাল তা ইতিহাস।

একজন সত্যিকারের সাংবাদিক মনের ইচ্ছে অনুযায়ী লিখতে পারেন না। কারণ তিনি আইন ও বিবেকের ঊর্ধ্বে নন। পরিবেশিত সংবাদ বা প্রতিবেদনের দায়-দায়িত্ব শুধু তাকে নয় সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমকেও তা বহন করতে হয়। সে জন্য একজন সাংবাদিককে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা ব্যবসা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কার্যক্রমের খোঁজ-খবর দেয়। ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে। সেটা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় এবং এমনকি বিশ্ব পরিসরে হবারও সুযোগ থাকে। যেখানেই ব্যবসা বা অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সেখানেই সংবাদ। প্রতিটি মানুষকে জীবন-জীবিকার জন্য অর্থকড়ি লেনদেন করতে হয়; মুদি দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনাকাটা, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, বাসে ভাড়া গোনা, আয়কর রিটার্ন দাখিল বা মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করা, বিকাশ বা রকেটের মতো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অর্থ পাঠানো সবই অর্থনৈতিক বিষয়। এমনকি, অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থাৎ সড়ক, বন্দর, সেতু নির্মাণ, গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুত খাতে বিনিয়োগ এগুলোও অর্থনীতির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। তাই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পরিধি বেশ বড়, এর ক্যানভাস অনেক দূর বিস্তৃত। কেবল আর্থিক বা বাণিজ্যিক বিষয়াদি নয়, এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশা ও শ্রম, বাজেট ও উদ্যোগ, ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার মার্কেট, পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণন, বাজার দর, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি, কর্পোরেট অর্থায়ন; অর্থাৎ বড় শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কিংবা কারখানার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মতো নানাবিধ বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তবে এতো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ শতকের শুরুর দশক পর্যন্ত সাংবাদিকতা চর্চায় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিষয়টি কমই গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতায় মূল আগ্রহের বিষয় ছিল তখন রাজনীতি, সাহিত্য ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স। বেসরকারি উদ্যোগের খবর সংবাদমাধ্যমে স্থান পেতো না বললেই চলে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী দেশের সংবাদ মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের কোনো খবর থাকতো না। আর থাকলেও তাদের অবস্থান থাকতো প্রান্তিক পর্যায়ে; শ্রমিক স্বার্থ-দাবির খবর সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হতো যে, শ্রমিক সংগঠন ও তাদের নেতাদের মনোভাব ছিল শত্রুভাবাপন্ন। দু-দুটি মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা আর বড় বড় শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়; এর ফলে বিশ্বব্যাপী এমন ধারণা তৈরি হয়, "বিজনেস ইজ এভরিবডিজ বিজনেস"; যেমন তা মালিকের, তেমনি তা শ্রমিকের, ম্যানেজার ও কর্মচারীর, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি থেকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার-বিজনেস সবার জন্যই হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক।

কেলি মেকব্রাইড এবং টম রোজেনটিল (২০১৪) মন্তব্য করেছেন, 'সাংবাদিকতায় বর্তমানে যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে সত্য উদঘাটন করা এবং যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়া।' বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অনেক সময় সত্য জানা সহজ হয়ে গেছে। তবে কোনো কোনো সময় ও ক্ষেত্রে তা অনুদঘাটিত এবং অসত্য থেকেও যেতে পারে।

নৈতিকতা

নৈতিকতা একটি আদর্শিক মানদণ্ড। এটি বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। নীতি হলো ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের ধারণা। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে আমরা যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি। নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানবজীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। বিশ্বের কল্যাণকর বিষয়গুলোর অন্যতম নির্ণায়ক হলো নৈতিকতা। সাধারণের কাছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পার্থক্য নজরে পড়ে না। পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থানের ওপর মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নির্ভরশীল। মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছানির্ভর।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা

'স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির পাশাপাশি নৈতিকতার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় সাংবাদিকদের নানা ধরণের উপহার ও উপঢৌকন দেয়া হয়, এমনকি বিদেশ সফরের প্রস্তাব আসে; এসব বিষয় সযত্নে এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। কোন ধরণের উপহার বা সুবিধা নিলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। 'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা প্রসঙ্গে ওয়েব সাইটে এমন অভিমত তুলে ধরেছে, ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক। সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেখা যায়, অসৎ প্রতিবেদন কারও চরম সর্বনাশ করেছে, সুনাম নষ্ট করেছে। সাংবাদিকরা যেন স্বচ্ছ থাকে, সত্য তুলে ধরে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কিছু না করে এটাই কাম্য। নৈতিকতা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যারা সম্পৃক্ত সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখার মতোই তাদেরও আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। কিন্তু, নৈতিকতা ও আচরণবিধি এক নয়। আইন দিয়ে নৈতিকতা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। নৈতিকতা হচ্ছে ন্যায়পরায়নতা, সততা ও শুদ্ধতা; যার তাগিদ আসে কারও ভেতর থেকে। কারও সুপারিশে এটা মেলে না। কেউ এটা চাপিয়ে দিতে পারে না। আমরা মানুষকে ভাল কিংবা মন্দ করতে পারি না। আমরা কেবল তাদের কার্যক্রম প্রভাবিত করতে পারি। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় সম্পৃক্তরা কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অনেক প্রতিষ্ঠান আচরণবিধি তৈরি করে দেয়। এতে নীতি ও নৈতিকতার কথাও থাকে। কী করবে এবং কী করবে না, সেটা বলা থাকে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ব্যক্তি অর্থাৎ সাংবাদিকের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র কিংবা বেতার বা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যদি সঠিক নৈতিক অবস্থানে না থাকে, তাহলে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়। মনে রাখতে হবে, নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত যদিও প্রতিষ্ঠানের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

নীতি ও নৈতিকতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

প্রতিটি সংবাদমাধ্যম জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। তারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা এনে দিতে কিংবা এর বিপরীতটা করতে পারে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা কেবল প্রতিবেদন প্রকাশ কিংবা ফিচার তৈরি নয়। এর সঙ্গে নীতি-নৈতিকতাও জড়িত। আর এ পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন তার ওপর পাঠক-দর্শক এবং ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট নানা মহলের আস্থা সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার বেশ আস্থাভাজন। তার কাছ থেকে নিয়মিত অর্থনীতির খবরাখবর মেলে। এর কোনো কোনোটা স্কুপ হয় এবং তার সুনাম বৃদ্ধি করে। এদের কারও গুরুতর অনিয়মের খবর পাওয়া গেল। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক কী করবেন? তিনি কি বিষয়টি চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন?

তিনি কি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবেন? আরেকভাবেও বিষয়টি দেখা যেতে পারে। একজন রিপোর্টার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির ভেতরের খবর নিয়মিত জানতে পারে। কাজের সূত্রে তিনি এমন কিছু তথ্য জানলেন যা থেকে ধারণা করা যায় যে আগামীতে কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যেতে পারে। তিনি কি নিজে ওই কোম্পানির কিছু শেয়ার কিনে রাখবেন? তিনি কি সহকর্মী ও নিকটজনদের এ কোম্পানির শেয়ার কিনে রাখতে কৌশলে পরামর্শ দেবেন? অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যুক্ত থাকলে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন। তাদের পরিচিতির গন্ডি বেশ বড় এবং সমাজের নানা স্থানে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণের সুযোগ পান। তাদের কাছে নানা ধরনের তথ্য আসে এবং তা থেকে কখনো কখনো লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। তারা ক্ষমতাবান রাজনীতিক এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন এবং এ সূত্রেও বদলে যেতে পারে নিজের ভাগ্য। তিনি কি এ সুযোগ গ্রহণ করবেন? না-কি সাংবাদিতার নীতি ও নৈতিকতার প্রতি অনুগত থাকবেন? নোবেলজয়ী মিলটন ফ্রিডম্যান (২০০২) মন্তব্য করেছেন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতে হবে। ফ্রিডম্যানের এ বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে তিনি অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে যা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক সাংবাদিকের সরকারের উচ্চ মহলে, মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যাতায়াত থাকে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেউ হয়তো নিজের এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। সাংবাদিক এটা করছেন জনকল্যাণে। কিন্তু যিনি সুবিধা দিচ্ছেন, তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এটা করছেন না। সরকারের অর্থ কাজে লাগাচ্ছেন। তবে যার মাধ্যমে এ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, সেই সাংবাদিকের কাছে আনুকূল্য চাইতে পারেন তার কিংবা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক খবর যেন প্রকাশ বা প্রচার না হয় সে বিষয়টি দেখতে বলতে পারেন। এ অবস্থায় সাংবাদিক কী করবেন?

এখানেই আস্থার প্রশ্ন। আপনার ওপর থেকে যদি কর্তৃপক্ষের, সর্বোপরি পাঠক-দর্শক- শ্রোতার আস্থা চলে যায় তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না। নৈতিকতার চ্যালেঞ্জে জয়ী হতে না পারলে গুণে-মানে সেরা সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নও পূরণ হবে না। আপনাকে যেমন খবরের পেছনে ছুটতে হবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে, যেমনভাবে খবরটি সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে উপস্থাপন করতে হবে সহজ-সরল কিন্তু আকর্ষণীয় ভাষায়, তেমনি সততা হতে হবে প্রশ্নাতীত। আপনি নিজের বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থাকবেন এবং প্রতিমুহূর্তে জবাবদিহি করে যাবেন। আর নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করবেন সমাজের কাছে।

ফেলোশীপে সতর্কতা

বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, এমনকি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানও অনেক সময় সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জন্যে ফেলোশীপ প্রদানের ঘোষণা দিয়ে থাকে। আর এসব ফেলোশীপের জন্যে আবেদন করে থাকেন সাংবাদিকরা। যারা বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা করেন, তাদের যত্রতত্র ফেলোশীপে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। বলা হচ্ছে, করপোরেট প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্য সংগঠনগুলো মূলত ফেলোশীপ দেয়, তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্যে। আর্থিক প্রণোদনায় পরিচালিত এ ধরণের ফেলোশীপ পেলে, সাংবাদিকদের বেশ কয়েকটা রিপোর্ট তৈরি করে প্রকাশ বা প্রচার করতে হয়। মনোনীত সাংবাদিককে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে ফেলোশীপের জন্যে মনোনীত করেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা

সমিতি। এ সংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রতিবেদনই প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। পুঁজির সাধারণ ধর্ম অনুসারে মূলত সংশ্লিষ্টের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। সংবাদমাধ্যম মূলত গণমানুষের স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে বিষয়টি উপেক্ষিত হতে পারে। তবে ফেলোশীপের বিষয়ে রিপোর্টারের কাছেই প্রস্তাব আসে, তা নয়। নীতি নির্ধারকরা এ বিষয়ে কথা বলে থাকেন রিপোর্টারেরর সাথে। এ অবস্থায় সবসময় কৌশলী হয়ে পেশাদারীত্বকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। কোনভাবেই যেন পাঠক-দর্শকের কাছে মনে না হয়, এটি এক ধরণের এমবেডেড স্টোরি। তবে পেশাজীবী সমিতি বা গবেষণা সংস্থার ফেলোশীপ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

সেনশনাল জার্নালিজম

শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে সতর্ক না থাকলে, বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বা তাগিদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এসব সংস্থা নিজস্ব রীতি মেনেই সরকারের অর্থনৈতিক পদক্ষেপের সমালোচনা করে। আবার বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পর্যলোচনা করে আর্থিক ব্যবস্থাপনার। এসব ক্ষেত্রে সংস্থার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোন প্রতিনিধির উদ্বৃতি দিয়ে, উদ্বেগ প্রকাশের খবর তৈরি করা হয়। এক ধরণের উত্তেজনা তৈরি করতে বা সংবাদের ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে এ ধরনের শব্দ চয়ন করা হয় বলে মনে করেন অনেক সাংবাদিক। অথবা দৈনন্দিন সংবাদে বিশ্লেষকের বক্তব্য ছাড়াই রিপোর্টার নিজেস্ব অভিমত প্রকাশ করে। এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির সুযোগ থাকে যথেষ্ট। অথবা কোনো সরকারি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় রিপোর্ট। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে, দেখা যায় ওই বিষয়ে রিপোর্টটা যথাযথ নয়। এরপর আবারও তৈরি করা হয়, যে কারণে পাল্টে গেল সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ রিপোর্টার তার দুর্বলতা এড়িয়ে যেতে এ ধরণের রিপোর্ট করে থাকে। এতে তৈরি হয় নতুন বিভ্রান্তি। এসব বিষয় এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

পরিসংখ্যান বিভ্রান্তি

অর্থনৈতিক সংবাদ সমৃদ্ধ করতে পরিসংখ্যান ব্যবহারের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হয়। কিন্ত অনেক সময় দেখা যায়, সুবিধামতো তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করছেন রিপোর্টার। আমাদের বাজেট বক্তব্যে দেখা যায়, তুলনার সুবিধার জন্য একেক বছরের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে অনেক সময় সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য হয়ত ধরা পড়ে। ধরুন, বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরতে কোন রিপোর্টার হয়ত ব্যবহার করছেন অর্থবছরের পরিসংখ্যান আর কেউবা ব্যবহার করছেন বর্ষ পঞ্জিকার তথ্য। হালনাগাদ তথ্য গোপন করার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, যে কারণে পাঠক বা দর্শককে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

সাংবাদিক যখন বিনিয়োগকারী

সাংবাদিক অনেক সময় বিনিয়োগকারী হয়ে ওঠেন। অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর সহযোগীও হন। সাংবাদিকতার সুবাদে সমাজের উচ্চস্তরে যোগাযোগের সুযোগ হয় তাদের। নীতি নির্ধারকদের সাথেও তৈরি হয় সখ্যতা। আর সরকারের মাঝারি পর্যায়ের নির্বাহীদের সাথে গড়ে ওঠে আন্তরিক সম্পর্ক। এর সুবাদে স্পর্শকাতর তথ্য অনেক সময় এসে যায় রিপোর্টের কাছে। শুধু বিজনেস রিপোর্টারাই এসব তথ্য

পান, তা নয়। জ্বালানি, টেলিকম, তথ্য প্রযুক্তি খাতের রিপোর্টারও পেয়ে থাকেন তথ্য। নিজে পুজিবাজারে বিনিয়োগকারী হলে, এর সুফল তিনি নিজেই নিতে পারেন। আর তা না হলে, বিনিয়োগকারীর সহযোগী হিসেবে তথ্য দিয়ে বাজারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারেন। এ ধরনের অনৈতিক কাজে বরাবরই নষ্ট হয় ব্যবসার স্বাভাবিক পরিবেশ। অথবা বাজার প্রভাবিত সম্পর্কিত মনগড়া তথ্যে তৈরি করা রিপোর্টও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়ে থাকে। ঢাকায় মূলত এ ধরণের অপবাদ রয়েছে, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারদের কারো কারো বিরুদ্ধে। অন্য বিটেও এ ধরনের সুযোগ কম নেই। ধরুন, ব্যাংক বিটে যিনি কাজ করেন, তার আগেই ধারণা তৈরি হয়ে থাকে, কোন কোন ব্যাংক মুনাফায় এগিয়ে থাকবে। বা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি খাতের তথ্য সংশ্লিষ্ট বিটের রিপোর্টারের কাছে আসবে। এক্ষেত্রে সরকারি কোম্পানিগুলো সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করতে বেশ সময় নেয়। অথচ সিদ্ধান্ত কার্যকরের আগেই তা রিপোর্টের হাতে এসে যায়। এতে তিনিও সুবিধা নিতে পারেন। অনিতা এ এ্যালন (২০০৪) মন্তব্য করেন, সাধারণ মানুষের সত্য জানার অধিকার আছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা সংবাদের শিকার হন। অসৎ ব্যক্তিরা জেনে শুনে আইন লঙ্ঘন এবং সামাজিক সহযোগিতাকে বিনষ্ট করে। তার এ বক্তব্য থেকে সুপষ্ট অর্থনৈতিক সাংবাদকিতায় সততা ও নৈতিকতা রক্ষা করে কাজ করা উচিৎ। এতে প্রতারণা বন্ধ করা যাবে।

প্রতিবাদ না ছাপানো

বিভিন্ন সংবাদের প্রতিবাদ আসে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিনে ভুল তথ্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে পারে। এতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর প্রতিবাদ জানায়। সেই প্রতিবাদপত্রও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ বা প্রচার করতে হয়। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সংবাদপত্র তা প্রকাশ করছে না। টেলিভিশনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা করে না। এতে প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এটি কি নৈতিকতা পরিপন্থী নয়। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে রাজনৈতিক, আর্থিক, আয় কর বা অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হলে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য অবশ্যই রিপোর্টের সঙ্গে থাকতে হবে। ঐ ব্যক্তির বক্তব্য ছাড়া ঐ সংবাদ প্রকাশ হতে পারে না। কিন্তু, ঢাকার বহু পত্রিকায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ছাড়াই প্রায়শ বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত খবর প্রকাশিত হচ্ছে।

সত্য গোপনের অধিকার আছে কী?

সত্য প্রকাশের অধিকার আছে সাংবাদিকের। সত্য প্রকাশে তিনি হবেন অবিচল। কিন্তু, সাংবাদিক কি তথ্য গোপন করবেন? তথ্য বিকৃত করবেন? অবশ্যই না। এ পেশায় আসতে তাকে নিবন্ধিত হতে হয় না। তাই তথ্য বিকৃতি কিংবা তথ্য গোপন করার জন্য তার নিবন্ধন বাতিলের প্রশ্ন আসে না। সমাজ তার কাছ থেকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচরণ আশা করে। সত্য প্রকাশে তাকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়।

বিজ্ঞাপন বনাম ব্যবসায় সাংবাদিকতা

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো পণ্য, সেবা বা কোম্পানির প্রচার করা হয়। এখানে প্রতিপক্ষের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ থাকে না। কেবল সংশ্লিষ্ট পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা হয়। কিন্তু, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না। সাংবাদিকদের একক

নয়, বরং অনেক সূত্র ও উৎসের তথ্য নিতে হয়। পুর্ণাঙ্গভাবে চিত্র তুলে ধরতে হয়। এমনকি সব প্রতিপক্ষের বক্তব্য দিতে হয়। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনো কিছু বাদ দেয়া চলে না। জনগণের কাছে যেন মনে হয়, সাংবাদিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

কী করবেন? কী করবেন না

১. সব তথ্য যাচাই করুন।
২. দ্রুত প্রতিবেদন দিতে হবে, তবে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রতিবেদন লেখা চলবে না।
৩. কাউকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা যাবে না।
৪. সূত্র সুনিশ্চিত করে উল্লেখ করুন। তথ্য হালনাগাদ করুন।
৫. তথ্য পেতে অনৈতিক পথ অনুসরণ বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না।
৬. অনুমাননির্ভর হবেন না। ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু বলবেন না।
৭. তথ্য বিকৃত করা অনুচিত। অপছন্দনীয় তথ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন।
৮. তথ্যের উৎস উল্লেখ করতে হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশনার তথ্য দিলেও তা উল্লেখ করা চাই।

নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন (১৯৮৯) মন্তব্য করেছেন, কল্যাণ অর্থনীতি আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। যাতে অন্তঃস্থ নৈতিকতা এবং আধুনিক নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে সাংবাদিকদের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আসলে নৈতিকতা বজায় রেখেই সাংবাদিকতা করা বাঞ্ছনীয়।

এনরন কেলেঙ্কারি

যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি জায়ান্ট এনরন এক সময় ফুলেফেপে উঠেছিল। বাজারে তাদের এক একটি শেয়ারের দাম ২০০০ সালে ৯০৫৬ ডলারে উঠেছিল। কিন্তু এক সময় ধস নামল। তারা তথ্য গোপন করেছিল। এ কাজে তাদের সহায়তা করেছিল অডিট কোম্পানি। কিন্তু, সাংবাদিকদের সম্পর্কেও অভিযোগ, তারা এ বিষয়টি ধরতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেননি। সিকিউরিটজ এক্সচেঞ্জ কমিশন তদন্ত শুরু করে। কোম্পানির ব্যবসায়ে ধস নামে। কোম্পানিটিকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। শেয়ারের দাম নেমে আসে মাত্র ২৮ সেন্টে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠানামা করে। কোনো কোনো শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক ওঠানামা করে। এটা কেবল ভাল ব্যবসার জন্য? ভাল ডিভিডেন্ট দেবে বলে? না-কি কারসাজি আছে? এসবই দেখার বিষয়।

ইথিকাল জার্নালিজম প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক টাইমস

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে তারা নিউজ ও সম্পাদকীয় পাতার জন্য হ্যান্ডবুক তৈরি করে। এতে বলা হয়, সাংবাদিকরা তথ্য দিতে আপত্তি জানানো কিংবা গোপন সংবাদ প্রদানে অসহযোগিতাকারী ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ হয় এমন কিছু করবেন না। আবার সহযোগিতার জন্য কাউকে বিশেষ কভারেজ দিতে পারবেন না। সোর্সের সঙ্গে (বিশেষ করে নির্দিষ্ট বিটের ক্ষেত্রে) এমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে না, যাতে তাকে বিশেষ সুবিধা দিতে হয়। এটাও মনে রাখতে হবে, সোর্স কিন্তু তার স্বার্থ স্বার্থ পূরণের জন্য নিউইয়র্ক টাইমস এর সুনাম ব্যবহার করতে চায়। সাংবাদিকদের বিশেষভাবে সোর্সের সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্কের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

কোনো সাংবাদিক এমন কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করতে পারবে না কিংবা তাদের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কে জড়াতে পারবে না যাদের নিয়ে প্রতিবেদন বা লেখা প্রকাশিত হবে। যেমন, কোনো গ্রন্থের সম্পাদক কোনো প্রকাশনা সংস্থায় বিনিয়োগ করতে পারবে না। পেন্টাগন প্রতিবেদক কোনো প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে না।

নিউইয়র্ক টাইমস বিশেষ ক্ষেত্রে সোর্সের জন্য অর্থ ব্যয় করে। যেমন, সোর্সকে খাওয়ানো কিংবা যাতায়াতের ব্যয় বহন। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে সংবাদ-সোর্স খাবার খেতে অনুরোধ করে। এটা এড়িয়ে যাওয়া হয়ত কঠিন। কোনো কোম্পানির বস হয়ত কোম্পানির ব্যক্তিগত ডাইনিং রুমে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। তবে সম্ভব হলে এ জন্য যে বিল হয়, সাংবাদিক সেটা দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে চা বা কফি খেতে দোষের কিছু নেই। তবে মধ্যাহ্ন ভোজ বা প্রাতঃরাশের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এফবিসিসিআই, ঢাকা চেম্বার বা বিজিএমইএ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক সম্মেলনে দুপুরে খাওয়ানোর আয়োজন থাকলে সাংবাদিক কী করবেন? সেখানে খাওয়ানো হলে কিংবা উপহার দিলে প্রতিবেদক কি নিজের মতো করে লিখতে পারবেন? সাংবাদিকরা বিশেষ অবস্থা ছাড়া বিমানের টিকেট বা হোটেলে থাকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। বিশেষ অবস্থা যেমন, কোনো বৈজ্ঞানিক অভিযান কিংবা বিকল্প নেই এমন পরিস্থিতি। তবে ব্যতিক্রম হতেই পারে। যেমন, কোনো করপোরেট বস সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য তাদের নিজস্ব বিমানে চলাচলের সময়টি ব্যবহার করতে চান। তবে এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতি বিষয়ে সাংবাদিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

যাদের খবর প্রকাশ করা হবে কিংবা যাদের বিষয়ে সম্পাদকীয় কলামে লেখা হবে কিংবা হতে পারে তাদের কাছ থেকে কোনো উপহার নেয়া যাবে না। তবে কোম্পানির লোগো যুক্ত ক্যাপ কিংবা মগ অথবা ২৫ ডলার (৪ হাজার টাকা) বা তার কম মূল্যের কিছু হলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। উপহার প্রত্যাখানের সময় মনে রাখতে হবে সেটা যেন বিনয়ের সঙ্গে করা হয়। তবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো উপহার হলে সেটা ভিন্ন কথা। প্রতিষ্ঠানের কোনো সাংবাদিক লাভজনক উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন না কিংবা এ ধরনের কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হবেন না।

বিজনেস উইকের আচরণবিধি

বিজনেস উইক একটি মর্যাদাসম্পন্ন সাময়িকী। তারা সাংবাদিকদের নৈতিকতা বিষয়ে একটি আচরণবিধি তৈরি করেছে। প্রতি বছর সেখানে কর্মরত প্রত্যেককে স্বাক্ষর করতে হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালের ২ ডিসেম্বর এ আচরণবিধি হালনাগাদ করা হয়। এখানে তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সাংবাদিকদের জন্যই তা অনুকরণীয় হতে পারে। বিজনেস উইকের যাত্রা শুরু ১৯২৯ সালে। পত্রিকাটি মনে করে, সমাজে তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। আর এ স্বাধীনতা নিয়ে আসে কিছু দায়িত্ব। তারা যা প্রকাশ করে তার জন্য অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকা চাই। অন্যথায় হারিয়ে যাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ পাঠক, অনলাইন দর্শক, দর্শক ও শ্রোতাদের আস্থা। তাদের কাছে যেসব তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় তার গুরুত্ব কমে যেতে থাকবে, এমনকি কমে যাবে। বিজনেস উইক-এর বিশ্বাস, তাদের ভবিষ্যৎ এই আস্থা সংরক্ষণ ও বাড়ানোর ওপর। এজন্য সাংবাদিকের সততা ও নিষ্ঠা থাকতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায়।

সংগৃহীত তথ্য হতে হবে নির্ভুল, সংগ্রহ করা হবে সৎ উপায়ে এবং উপস্থাপনে থাকবে পক্ষপাতহীনতা সততা। সাংবাদিকদের পেশাগত আচরণ হতে হবে অনতিক্রম্য এবং ব্যক্তিগত আচরণ থাকবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে। বিজনেস উইক তার সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম পৃথক রাখে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে রয়েছে একটি অদৃশ্য দেয়াল, যাতে কেউ কারো কার্যক্রম প্রভাবিত করতে না পারে। সাংবাদিক বা সম্পাদক তাদের প্রতিবেদন বা গ্রাফিকস তৈরি করেন তার সম্পাদকীয় মান অনুযায়ী। যারা বিজ্ঞাপন দেয় এবং দেয় না তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য টানা হয় না। বিজনেস উইক কাউকে আনুকূল্য দেখায় না কিংবা কারও প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। কোম্পানি কিংবা ব্যক্তি নির্বিশেষে সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। কেউ বিজ্ঞাপন দিতে রাজী না হলে তার সম্পর্কে নেতিবাচক খবর প্রকাশ করা যাবে না। বিজনেস উইক নির্ভুল তথ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয় হয়, তা অবশ্যই হতে হবে যুক্তিপূর্ণ। সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে যাদের সরাসরি সম্পর্ক এবং অন্য যেসব সম্পাদকীয় কর্মী রয়েছেন তাদের হতে হয় সত্যনিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজনেস উইকের কণ্ঠ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তারা কোনো রাজনৈতিক প্রার্থী বা দলকে সমর্থন দেয় না। অর্থনীতিতে তারা কোনো পণ্য নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সব বিষয়ে তারা নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিজনেস উইক তাদের প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের মতামত তুলে ধরার সুযোগ দেয়। এমনকি তা যদি প্রতিবেদনের মূল ভাবনার পরিপন্থীও হয়, সেটা তুলে ধরা হয়। কেউ কোনো প্রতিবেদন বিষয়ে অভিযোগ করলে তা দ্রুততার সঙ্গে এবং গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। যদি দেখা যায়, প্রতিবেদনের বক্তব্য যথার্থ তাহলে বিজনেস উইক অভিযোগকারী যেই হোক না কেন নিজের বক্তব্য থেকে এক চুলও সরে আসে না। আর যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে দ্রুত সংশোধনী দেয়া হয় এবং অন্যান্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়। সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া যাবতীয় বক্তব্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারেন। তাদেরকে অবশ্যই সূত্র যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হবে। 'নাম প্রকাশ করা যাবে না' তথ্য পাওয়ার জন্য এটাও গ্রহণযোগ্য। তবে বিজনেস উইকের এটা পছন্দের তালিকায় নেই। একক সূত্রের ওপর নির্ভর না করাই কাঙ্ক্ষিত। এতে বিভ্রান্তির সুযোগ থাকে। কেউ পরিকল্পিতভাবে ভুল পথেও নিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আচরণ বিধি

বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর ১১: (বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিতে বলা হয়েছে:

১. জাতিসত্তা বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সংবিধান বিরোধী বা পরিপন্থী কোনো সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ না করা;

২. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুন্নত রাখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা থেকে বিরত থাকা;

৩. জনগণকে আকৃষ্ট করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকদের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা;

৪. সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা;

৫. বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনো ধরনের শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দেয়া;

৬. গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এ সব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয়, তবে সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা;

৭. যে সকল সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা আছে, সে সকল সংবাদ প্রকাশ না করা;

৮. সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন, কিংবা এরূপ করতে গিয়ে :

   (ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা;
   (খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনাকে বিকৃত না করা;
   (গ) মূলভাষ্যে অথবা শিরোনামে কোনো সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা;
   (ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।

৯. কুৎসামূলক বা জনস্বার্থ পরিপন্থী না হলে বাহ্যত ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যে কোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু, এ ধরনের বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা' বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

১০. ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশের বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদা হানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা;

১১. ব্যক্তিবিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেয়ার সুযোগ প্রদান;

১২. প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয়, তবে তা' অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করা;

১৩. জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ পরিপন্থী চাঞ্চল্যকর মুখরোচক কাহিনীর মাধ্যমে পত্রিকা কাটতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ এবং অনুরূপ ছবি পরিবেশন না করা;

১৪. অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের যুক্তিসংগত পক্ষাবলম্বন করা;

১৫. অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি; এ কারণে যে

সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তিনি সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রগুলো সংরক্ষণ করা;

১৬. কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায় প্রভাবিত হতে পারে, এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগে পর্যন্ত সাংবাদিকের বিরত থাকা;

১৭. সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষগুলোর প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনাকালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;

১৮. সম্পাদকীয়ের কোনো ভুল তথ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা;

১৯. বিদ্বেষপূর্ণ কোনো খবর প্রকাশ না করা;

২০. সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা;

২১. কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করা;

২২. প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বশীল প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে, তবে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে নিছক এই অজুহাতে কোনো সাংবাদিক অন্য কোনো সাংবাদিকের কোনো খবর সম্পর্কে দায়িত্ব না এড়ানো;

২২. সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পুরুষ ঘটিত অথবা কোনো নারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা;

নৈতিকতা ও আচরণ বিধি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, একজন সাংবাদিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। তবে ঘটনা সম্পর্কে সংবেদনশীল থাকবেন। নিজেকে একটি নিরপেক্ষ জায়গায় রেখে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করবেন। ঘটনা বিচার করবেন যুক্তি ও কারণ দিয়ে; আবেগ দিয়ে নয়। অনেক সময় চোখের সামনে যা দেখছি, তা ঘটনার প্রকৃত কারণ নাও হতে পারে। চুলচেরা বিশ্লেষণই একজন সাংবাদিককে সত্যসন্ধানী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য কি প্রযোজ্য?

উন্নত দেশগুলোতে সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যে সব নৈতিকতার কথা বলা হয়, তা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা অনেকটাই চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এখানে কারও বাড়িতে গেলে আপ্যায়নের রীতি আছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানালে কেবল চা নয়, অন্য খাবারও দিতে হয়। এ অবস্থায় সাংবাদিক কী করবেন? বিজ্ঞাপনের ওপর সংবাদ মাধ্যমের নির্ভরতা ব্যাপক। কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিবেদন

প্রকাশিত হলে বিজ্ঞাপন মেলে না। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে জিম্মি। এ অবস্থায় সাংবাদিক কিংবা তার প্রতিষ্ঠান নৈতিকতা কতটা ধরে রাখতে পারবে?

ভঙ্গুর এবং অস্থির এই নীতিমালা মেনে জীবীকার স্বার্থে কৌশলী অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে নৈতিক চর্চার বিকল্প এই মুহূর্তে আর নেই। সাংবাদিকতার সাথে নীতি-নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র নৈতিকতা চর্চায় সাংবাদিক সমাজের পাশে দাঁড়াতে পারে। জোরালো অবস্থান নিতে পারে সাংবাদিক সংগঠন; কিন্তু, রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক বিভাজনে জড়িয়ে আছেন সাংবাদিক সমাজ। সেজন্যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বা ইন্সটিটিউট অব চার্টার এ্যাকাট্যান্ট অব বাংলাদেশ, আইসিএবি'র মতো ভূমিকা রাখার সুযোগও তৈরি হচ্ছে না। একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর মাধ্যমে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। নৈতিকতা চর্চার সময় যেন আইনি সুরক্ষা মেলে। এই সময় আমাদের সম্পাদকীয় নীতি অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই নীতি যথেষ্ট পরিবর্তনশীল।

বলতে গেলে প্রতিটি মুহূর্তেই এ পেশায় নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হয়। কী লিখতে যাচ্ছি- কী লিখবো- কতটুকু লিখবো- কাকে কী প্রশ্ন রাখবো- কখন করবো অথবা কাউকে কোনো 'আনুকূল্য' দেখানো হচ্ছে কিনা কিংবা কাউকে কোনোভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে কিনা বা কারও ব্যক্তিস্বার্থে গণস্বার্থকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা -এসব প্রশ্ন এ পেশায় একবারেই আটপৌরে ব্যাপার। এককথায়, এই পেশা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নীতি-নৈতিকতার সাথে যতোটা সম্পৃক্ত করে ততোটা অন্য কোনো পেশায় সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে। তাই সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা মেনে চলা মানে এই পেশার মর্যাদা ও জনকল্যাণমুখী চরিত্রকেই আরও সমৃদ্ধ করা।

তথ্যসূত্র

১. ব্যবসায় সাংবাদিকতা: অজয় দাশগুপ্ত ও রোবায়েত ফেরদৌস, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

২. বিষয়: সাংবাদিকতা; পার্থ চট্টোপাধ্যায়- লিপিকা, কলকাতা, ভারত

৩. মানুষ, মাধ্যম ও যোগাযোগ; উইলবার শ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪. আচরণ বিধি; বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৫. উইকিপিডিয়া

৬. Dow Jones Code of Ethics

7. Thomson Reuters Code of Ethics

8. American Business Code of Ethics

9. The Press Council of Indias norms of journalistic conduct

10. Ethical Journalism, New York Times

11. The Guardians Editorial Code

12. The New Ethics of Journalism, principal of 21^{st} century, Kelly McBride & Tom Rosentiel, Sage Publishers.

13. Capitalism & freedom, Milton Friedman, University of Chicago press

14. Icfj, Journalism ethics- The Global debate

15. Cheating the Big mistake; in the new ethics, Anita L Allen, Miramax Book

16. On ethics & Economics, Amartya K. Sen, Wiely Blackwell.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 177-190
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি: টেকসই উন্নয়নে অশনি সংকেত

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারকথা: *আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নের পথে একটি মৌলিক বাধা হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা যেমন উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার তেমনি এক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতি উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। বক্ষ্যমান আলোচনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং এই সংস্কৃতির নেতিবাচক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুষম ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। পরিশেষে, একটি সুষম ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থায় এখন কর্পোরেট সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে। এদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সেবা প্রদানের নামে কর্পোরেট পুঁজির প্রত্যক্ষ ছত্র-ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সব স্তরে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নামে এসব প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট আদলে পরিচালিত হচ্ছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে কিছু ব্যক্তি রাতারাতি শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাবিদ সেজে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমগ্র দেশ ও জাতি, পুরো শিক্ষাব্যবস্থা। পরিতাপের বিষয়, রাষ্ট্র কাঠামো দেশ ও জাতির দিকে না তাকিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লাভের পথ সুগম করে দিচ্ছে।

প্রকৃত শিক্ষার উন্নয়নে ও শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত বিস্তারে গণমুখী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা হবে সুলভ, সহজলভ্য ও গণমুখী। আমাদের দেশের প্রকৃত বাস্তবতায় যে কোন মূল্যে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙ্গে একটি যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু জরুরি। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ উল্লেখ আছে, এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ এরকম বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সংস্কৃতি এদেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রায় এক বিরাট বাধা।

একটি প্রতিষ্ঠান যদি এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারে আর প্রতি জনের কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ বছরে ১০০০০ টাকা আদায় করে তাহলে ভর্তি ফি হতে বার্ষিক আয় হয় ১ কোটি টাকা। জনপ্রতি প্রতি মাসের বেতন ৫০০ টাকা ধরা হলে বেতন বাবদ বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। এছাড়া বই, খাতা, মনোগ্রাম, জরিমানা, পোশাক, আইডি কার্ড, শিক্ষা সফর, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি ছোটখাট অনেক বিষয়ে ফি ধার্য করে সরল হিসাবে বছরে ২ কোটি টাকা আদায় করা যায় সহজেই। এর জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল উদ্যোগ, সামান্য জমি, সাদামাটা একটি বাড়ী, দু'য়েকটি ফ্লাট (ভাড়া করা হলেও চলে)। এখন ব্যয়ের প্রসঙ্গে আসি। যদি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন হয় এবং প্রতিজনের মাসিক বেতন ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকা ধরা হয় তাহলে বাৎসরিক ব্যয় কত হয়? সরল হিসাবে ১২ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য ব্যয়সহ মোট ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা ধরে নেই। বাকী আয়ের ভাগীদার উদ্যোক্তা। কত সরল হিসাব। এটি সাধারণ একটি কিন্ডার গার্টেন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্পিত হিসাব হলেও দেশের বাস্তব চিত্র তেমনি। কত সহজেই আয় করা যায়। শিক্ষাসেবা প্রদানের নামে কত নিরাপদে বিপুল অর্থ উপার্জন করা যায়। এতে প্রয়োজন হয় কেবল কোন মতে সুনাম অর্জন করা। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে এখন এরকম প্রতিষ্ঠান অনায়াসেই স্থাপন করা যাচ্ছে।

এধরনের উদ্যোগ ব্যক্তি, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক। কিন্তু দেশ, জাতি, গণমানুষের অগ্রগতি, উন্নয়ন তথা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর এক ভয়ংকর আঘাত।

শিক্ষাসেবার নামে কত সহজে মুনাফা উপার্জন করা যায়। ঢাকা শহরে এ প্রবণতা বেশী। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে এমনকি উপজেলা শহরগুলোতেও এখন এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে এই শিক্ষা বাণিজ্য। যেন দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি মনিটরিং হয় বলে মনে হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এ সংস্কৃতি এদেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে যাচ্ছে এক অনিশ্চিত গন্তব্যে।

স্বচ্ছল ব্যক্তির হাত ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিষয়টি নতুন নয়। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, শুরু থেকেই স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠেছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশী দিনের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশরা তাদের ছত্র-ছায়ায় এদেশে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। পরবর্তীতে জমিদার, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমান সময়ে অবস্থা এমন যে, স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই।

বর্তমানে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মানেই স্বচ্ছল ব্যক্তি। আগে স্বচ্ছল ব্যক্তির বাইরেও কিছু শিক্ষিত শিক্ষানুরাগী অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার নজির আছে। বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। আগে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে এলেও তারা তা করেছে এলাকার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে। আর এ যুগে স্থাপন করা হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, মুনাফার বিষয়টি মাথায় রেখে। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম বাদে এ চিত্রই দেশব্যাপী দেখা যাচ্ছে। তার মানে, আগে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা ছিল স্বচ্ছল এবং একই সাথে সজ্জন। এ যুগে শিক্ষানুরাগীরাও স্বচ্ছল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সজ্জন বলা যাবে কি?

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো সুনাম অর্জনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। একবার সুনাম অর্জন করতে পারলেই হয়। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। সবাই তাদের ছেলে মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ কড়ায়-গন্ডায় কাজে লাগায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার হার থাকে তুলনামূলক অনেক কম।

চাকচিক্য বা বিলাসিতার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা নেই। প্রকৃত অর্থে, শিক্ষিত হতে হলে শিক্ষার্থীকে হতে হবে অতি সাধারণ, সাদামাটা। বিলাসিতার মাঝে বড়, শিক্ষিত হতে পেরেছে এমন নজির সম্ভবত নেই। সুতরাং, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষার্থীকে সাদামাটা সাধারণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ সংস্কৃতি ক্ষয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত মানুষগুলো ক্রমান্বয়ে লেবাসধারী হয়ে উঠছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে গড়ে তোলার চেয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো চাকচিক্যময় করে গড়া তোলা হচ্ছে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরের ফলাফল কেমন হওয়া উচিৎ। এর সরল উত্তর কিছু শিক্ষার্থী খুব ভালো ফলাফল করবে। মধ্যম সারির বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী মাঝামাঝি পর্যায়ে ফলাফল করবে। কিছু ফেল করবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছরের ফলাফল এমন হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে শতভাগ পাশ করতে পারে না। শতভাগ ফেলও করতে পারে না। যদি বছরের পর বছর একটি প্রতিষ্ঠান ভালো ফলাফল করে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হবে। সবাই চাইবে তার ছেলে-মেয়েকে ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে। ভর্তির জন্য শুরু হবে অসুস্থ, তীব্র প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় স্বল্প আয়ের মানুষেরা পরাস্ত হয়, হয়ে চলছে। এটি মোটেও কাম্য নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এই অনৈতিক কাজ করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাসেবাকে কেবল মাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য নিশ্চিত করে মুনাফা অর্জন করে চলছে।

বাংলাদেশের মত দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে সবার আগে। একই সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে এর কোন বিকল্প নেই। যে কোনো মূল্যে দ্রুততম সময়ে সব মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার প্রচলন বিশেষ করে, মুসলিম নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারী শিক্ষার তিন অগ্রদূত ফয়েজন্নেসা চৌধুরী, খায়েরুন্নেসা খাতুন, এবং বেগম রোকেয়া আজীবন নিরলস কাজ করে গেছেন। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরে ফয়েজন্নেসা চৌধুরী, ১৮৯৫ সালে সিরাজগঞ্জ মহকুমার হোসেনপুর গ্রামে মুনশি মেহেরুল্লা ও খায়েরুন্নেসা খাতুন এবং ১৯১১ সালে কলকাতায় বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আগে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শত প্রতিকূলতার মাঝেও শিক্ষা বিস্তারে নিরলস কাজ করে গেছেন। এ যুগে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষা অনুরাগীর নামে মূলত উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলছে। কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, 'কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য'। জ্যাঁ জ্যাকস রুশোর শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার প্রতিবন্ধক। এদেশে শিক্ষা প্রসারে এবং শিক্ষার প্রকৃত মান উন্নয়নে প্রধান বাধা শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি। আলোচ্য প্রবন্ধে শিক্ষা বাণিজ্যকরণ কিভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? টেকসই উন্নয়নে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে? এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এ বিষয়ে আলোকপাত করা। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যে কোনো মূল্যে এই সংস্কৃতিকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী, এর স্বরূপ ও কারণ আলোচনা করা।
২. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো আলোকপাত করা।
৩. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকা তুলে ধরা।
৪. কর্পোরেট সংস্কৃতির কবল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করতে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা।

৩. তথ্য ও পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল, বিভিন্ন গ্রন্থ, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী এবং এর স্বরূপ?

শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী? এ বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া কঠিন। সরল কথায় বলা যায়, শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ বা শিক্ষার মত একটি অতীব জরুরি সেবাকে পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়াই কর্পোরেট সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির আড়ালে লুকিয়ে আছে অর্থ লিপ্সা। মুনাফালোভীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের নামে মুনাফা অর্জনই এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। ফলে সব স্তরের সব মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কথা উপেক্ষা করে কেবল স্বচ্ছল ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা নিশ্চিত করা কর্পোরেট সংস্কৃতির একটি নিন্দনীয় দিক। মুনাফার চিন্তা আছে বলে এখানে সনদ বাণিজ্য, জালিয়াতি, অধিক ফি আদায়, তথ্য গোপনের মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। শিক্ষা প্রদানের আড়ালে এসব অনৈতিক কাজ হবেই বা না কেন? কর্পোরেট সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য শিক্ষা প্রদান নয়, মুনাফা অর্জন। শিক্ষা প্রদান উপলক্ষ মাত্র।

বিনয় মিত্র তার 'বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রূপ ও রীতি' নামক গ্রন্থে "আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এখন আর বিদ্যাগ্রহীতা নয়, বিদ্যাক্রেতা" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "বিদ্যা, যা আগে ছিল পূজার পর্যায়ে, একদিন তা হলো আত্মোজ্জ্বল হওয়ার অলংকার। পরে হলো চাকরিপ্রাপ্তির অস্ত্র, এখন হয়েছে বাজারি পণ্য। শিক্ষালয় নামক সুদৃশ্য ভবনগুলো পবিত্রতা হারিয়ে, যেন একেকটা বিপনি-বিতান হয়ে উঠেছে। শিক্ষা এখন চড়ামূল্যের পণ্য, যার খুচরা ক্রেতার নাম ছাত্র, খুচরা বিক্রেতার নাম শিক্ষক, এর পাইকার ব্যবসায়ী হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, অথবা ক্ষমতাসীন কোন রাজনীতিক। যারা বিদ্যালয়ের দেহ গড়েন, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়-মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে যথাযথ স্বীকৃতি বা অনুমতিপত্র নিয়ে আসেন, তারা বহু টাকা বিনিয়োগ করেন অবশ্যই। বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে মুনাফা

না এলে ব্যবসায়ী তার টাকা খাটাবেন কেন? লাভ বিনা টাকা দান, জনকল্যাণমূলক নিঃস্বার্থ বিনিয়োগ-বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে এমন উদার, নির্মোহ ব্যক্তির দেখা মেলা ভার। সত্যি তাই। শিক্ষার লক্ষ্য চাকরি নয়, জ্ঞানার্জন। জ্ঞানের আলোই নিজেকে আলোকিত করে সে আলোয় অন্যকে আলোকিত করবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সুশিক্ষিত হওয়া, সুন্দর মনের মানুষ হওয়া - দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে, এই মূল্যবোধের অবনতি হচ্ছে, অবক্ষয় হচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন শিক্ষিত হয়ে যেনতেনভাবে অর্থ উপার্জন করা। যে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ সৎ, উদার, কর্মঠ, মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে সে শিক্ষাই এখন মানুষের এসব মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করে চলছে। সংকোচিত হতে চলছে সুকুমারভিত্তি, মননশীলতা, মানবিকতার চর্চা। শিক্ষা এখন মুনাফা অর্জনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে। দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টিউশন ফি কমানো এবং দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আহবান জানান।” সমাবর্তনে তিনি আরো বলেন, “Keep in mind that education shouldn’t be only based on curricula and certificates, and universities should not be merely profit-making organizations” (The Daily Star, 10 January, 2010).

অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোচিং সেন্টার স্থাপন করে অনেক উদ্যোক্তা কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। প্রচুর বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়ে গেছেন রাতারাতি এমন নজির পাওয়া যাবে অনেক। কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্যের হিসাব জানতে দেশে প্রথমবারের মত একটি জরিপ পরিচালনা করে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। জরিপে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থী বছরে তার শিক্ষার পেছনে যে টাকা ব্যয় করে, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ চলে যায় কোচিং আর হাউস টিউটরের ফি বাবদ। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী বছরে তার পেছনে যে টাকা ব্যয় করে, তার মধ্যে ৩০ টাকা খরচ হয় কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনিতে (কালের কণ্ঠ ২৯ এপ্রিল, ২০১৬)।

একজন ব্যক্তি যার জীবন মুনাফার জন্য নিবেদিত। মুনাফার পেছনে ছুটে প্রচুর অর্থ কড়ি, বিত্ত বৈভবের মালিক বনে গেছেন। এরকম একজন দেশ ও জনগণের কথা চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা করার কথাও না। মুনাফালোভী অর্থলিপ্সু একজন মানুষ সব সময় নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের ভোগ বিলাসিতা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে। হতাশাজনক সত্য এরকম মুনাফালোভী ব্যক্তিবর্গ আজ রাতারাতি শিক্ষানুরাগী বনে যাচ্ছে। এ দেশের আইন, রাজনীতি, প্রশাসন তাদের অনুপ্রাণিত করছে। কর্পোরেট আদলে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একই নামে বিভিন্ন শহরে অথবা একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে চলছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শ্রমজীবি স্বল্প আয়ের মানুষের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করার ন্যূনতম কোন সুযোগ নেই। আর্থিক স্বচ্ছলতা এসকল প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার মূল মানদণ্ড। শিক্ষা বাণিজ্যকরণ আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে পড়াশুনার অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। উল্টো তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যকরণের এই সংস্কৃতি এমন এক পর্যায়ে যাচ্ছে যে, শিক্ষা আজ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য দুর্লভ পণ্যে পরিণত হচ্ছে। আর তা কর্পোরেট পুঁজির কাছে দিনে দিনে জিম্মি হতে চলছে, যেন কৃত্রিম সংকট তৈরী করে দাম বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষা লাভের অধিকারটুকু ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মোতাহার হোসেন চৌধুরী তাঁর ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে বলেছেন, “মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা

করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানব সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানব সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে।" শিক্ষা মানুষকে মানবিক করে তোলবে। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই হওয়া উচিৎ। এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক। প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়বদ্ধতার দিক বিবেচনায় স্বল্প আয়ের মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ। শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি এ বিষয়টিকে শতভাগ অস্বীকার করে। এতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, শিক্ষার গুণগত মান ক্ষুন্ন হচ্ছে, থমকে আছে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি। কেবল স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা নিশ্চিত করা দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। দেশের প্রকৃত উন্নয়নে যে গণমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তার পথ সত্যিকার অর্থে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো শিক্ষা দানের পাশাপাশি শিক্ষক কর্মচারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। এজন্য প্রয়োজন আর্থিক ও অআর্থিক সব সুবিধা নিশ্চিত কল্পে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিক্ষা বাণিজ্যকরণ এদিকে কোনো চিন্তা করে না, করার প্রয়োজনও মনে করে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষক কর্মচারীদের মুনাফা লাভের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। এখানে একজন শিক্ষক শ্রমিক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এছাড়া চাকুরীর স্থায়িত্ব, আবাসন সুবিধা, একেবারেই নগণ্য। বাণিজ্য করার নিমিত্তে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত চিত্র এমনই। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন ভাতা সময় বিবেচনায় নিতান্তই কম। প্রশ্ন হলো, এসব প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করছে কেন? দেখা যাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করে বলে টিউশনি, কোচিং বাণিজ্য করে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়। হচ্ছেও তাই। এক্ষত্রে নীতি নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ বিবেচনা করা হচ্ছে না। প্রাইভেট টিউশনি করে সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় বলে বেতন ভাতার গুরুত্ব কমে যায়। কিছু বেকার যুবক বাধ্য হয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে কেবল রুটি-রুজির জন্য শিক্ষকতা করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তব চিত্র এমন যে, একটি কলেজ পর্যায়ের স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন শিক্ষক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরি পেয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি কোনটি বেছে নেবেন? এক্ষেত্রে কলেজের চেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা তার কাছে বেশী লোভনীয় নয় কি?

শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির নেপথ্য কারণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের বাণিজ্যিক মনোভাব, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের না আসা, অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে এই বলে যে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তেমন পড়াশুনা হয় না। সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নে নিবেদিত বলা হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এখনো গ্রামের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভাঙ্গাচোড়া, শিক্ষক সংকট, অনুন্নত রাস্তঘাটসহ অনেক সমস্যা। গত ২৭ মে, ২০১৫ ইং তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ২০১২ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ হাজার। ২০১৩ থেকে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো ২৬ হাজার। সাত বছর ধরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। ফলে পুরণো সেই ৩৬ হাজার বিদ্যালয়ের ১৫ হাজারেই নেই প্রধান শিক্ষক। বেশির ভাগ স্কুলেই শিক্ষক সংখ্যা চারজন। প্রধান শিক্ষক না থাকলে বাকি তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যস্ত থাকতে হয় প্রশাসনিক, এবং সরকারি ও স্থানীয় নানা কাজে। ফলে দুজনকেই মূলত চালাতে হয় ক্লাস। একটি স্কুলে

প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাসের সময় আড়াই ঘণ্টা। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে চারটি ক্লাস এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৪৫ মিনিটের ছয়টি ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু দুজন শিক্ষকের পক্ষে এত ক্লাস নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। কোনো রকমে এসব স্কুলে সিলেবাস শেষ করানো হলেও শিশুরা আসলে কতটুকু শিখছে, সে প্রশ্ন শিক্ষাবিদদের। ২০১৫ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারি কালের কণ্ঠ পত্রিকার 'পাহাড়চূড়ায় শিক্ষা লড়াই' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৮ সালে জাতীয়করণ করা হলেও রোয়াংছড়ির সাইঙ্গ্যাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংকটে শিশু শ্রেণির ছুটির পর ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বসানো গেলেও সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বসতে হয় খোলা আকাশের নীচে। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লিখে ক্লাস নেন শিক্ষক। আর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নেন একনিষ্ঠ মনে। এ চিত্র দুই-এক দিনের নয়, সারা বছরের।

প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও শিক্ষা খাতে ব্যয় কিন্তু কম নয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭১০৩ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮৪৭ কোটি টাকা এবং এক বছরে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৭ শতাংশ (Dhaka Tribune, 03 June, 2016)। প্রতি বছর বাজেটে ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষা খাতের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে। এর পরেও সারা দেশে রোয়াংছড়ির সাইঙ্গ্যাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়ে গেছে। তার মানে দাঁড়ায় শিক্ষা খাত উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চলছে বলা হলেও এখাত উন্নয়নে আমরা সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্যয় নিশ্চিত করতে পারছি না। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি বিস্তারে এটি একটি অন্যতম কারণ।

এসব কারণে সবাই মনে করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন আর আগের মত পড়াশুনা হয় না। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকচিক্য দেখে সবাই আকৃষ্ট হয় এবং মনে করে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার মান অনেক ভালো। বিশেষ করে শিক্ষিত, সচেতন, স্বচ্ছল মানুষেরাই তাদের ছেলে মেয়েদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াতে আর আগ্রহী নয়। বিশেষ করে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের পড়াতে তাঁরা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বেছে নেয়।

২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যারা সচিব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবসরে গেছেন ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে তাদের কৈশোর জীবন কেটেছে। এটি সত্য যে তাঁদের অধিকাংশই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামে বা মফস্বল শহরে পড়াশুনা করেছেন। আর তখনকার সময়ে পড়াশুনা করার প্রধান অনুসঙ্গ ছিল হারিক্যান। বিদ্যুতের ব্যবহার তেমন ছিল না বলে গ্রাম ও মফস্বল শহরের শিক্ষার্থিদের হারিক্যানের আলোই পড়াশুনা করতে হয়েছে। আর হারিকেনের আলোয় পড়াশুনা করে ঐ সময়ে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের মানসিকতা এমন পর্যায়ে যে, হারিক্যানের আলোই পড়াশুনা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আজ তারাই তাদের ছেলে মেয়েদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে পড়াশুনা শেখানো হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চায়। যে ব্যক্তি হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনা করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনিই তার ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছল ঘরের মানুষগুলো সচেতন নয়। একজন সত্যিকার সচেতন মানুষ তার ছেলে মেয়েদের সাধারণ হতে উদ্বুদ্ধ করবে। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করার জন্য প্ররোচিত করবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি গড়ে উঠার পেছনে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনেকাংশে দায়ী। এ সংস্কৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভয়ানক ব্যাধি হলেও সরকার, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম,

গবেষক, তথা সচেতন মহল এ বিষয়ে চরম উদাসীন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি এক প্রতিষ্ঠিত রূপ পেতে যাচ্ছে।

৫. কর্পোরেট সংস্কৃতির নেতিবাচক দিক

শিক্ষা বাণিজ্যকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে এই সত্যতা মেলে। মালিকে মালিকে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আলাদা আলাদা ক্যাম্পাস স্থাপন, দীর্ঘদিনেও স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে না তোলা, বিনা নোটিশে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া, অর্থের জন্য শিক্ষার্থীদের হয়রানী, অযৌক্তিক ফি আদায় এমন কি কাউকে না জানিয়ে মালিকদের পলায়নের মত ঘটনা গণমাধ্যমের বদৌলতে দেখতে পাই। উচ্চ শিক্ষার নামে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও মুনাফা লাভের নেশায় অনাকাঙ্খিত এতসব ঘটনা ঘটছে। গত ৩ অক্টোবর, ২০১৬ ইং তারিখে সমকাল পত্রিকার এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'মালিকরা গা ঢাকা দিয়েছে বিপদে ১২ হাজার শিক্ষার্থী'। এতে উল্লেখ করা হয়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের চার মালিকপক্ষের শীর্ষ ব্যক্তিদের সবাই গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারাও তাদের খুঁজে পাচ্ছেন না। এতে ১২ হাজার শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। অদ্ভুত বিষয় নয় কি? মানুষের মেধা ও মননের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে কত ছোট করতে পারে। ভাবা যায়? আমাদেরকে তাই ভাবতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে শিক্ষিত মানুষেরা কিভাবে নিজেদের আত্মমর্যাদা বিলিয়ে দেয়। গত ০৪ এপ্রিল, ২০১৬ ইং তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় শরিফুল আলম সুমনের 'অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফি ট্রাস্টিদের ভাগবাটোয়ারা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয় হবে সম্পূর্ণ অলাভজনক। বিশ্বদ্যিালয়ের খরচ বাদে আয়ের পুরো অর্থ ব্যবহার হবে উন্নয়নকাজে। অথচ উল্টো নিয়মে চলছে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়। মাস শেষে টিউশন ফি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা। এমনকি কে কত টাকা নেবেন তা বোর্ড সভার কার্য বিবরণীতে আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেয়া আছে। আর যারা সরাসরি টাকা নিতে পারেন না তাঁদের বিশ্বদ্যিালয়ে সন্মানজনক পদে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে টিউশন ফির ভাগ। এমনকি ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েক সদস্যের বিরুদ্ধে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

দেশের প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রতি বছরে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তাই সামগ্রিক শিক্ষা খাতের ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি। বাস্তবে কি তাই দেখতে পাচ্ছি?

দেশ ও সমাজের সেবায় মানুষকে উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রধান মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মানবিক গুণগুলো বিকশিত হবে। একজন মানুষ দেশ প্রেমিক, মানব হিতৈষী তথা নিজের কর্ম দক্ষতাকে মানব কল্যাণে ব্যয় করবে। একজন শিক্ষার্থী গণিত, দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান বিষয়গুলো রপ্ত করার পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে। নিজ দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনোবৃত্তি, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হবে। বিশ্ব বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিজ দেশের অবস্থান নির্ণয় করবে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি সম্ভবত এ বিষয়টি উপেক্ষা করে একজন মানুষকে কেবল নিজের ভোগবিলাসী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অর্থ উপার্জনই মানুষের জীবনের প্রধান কাজ। অর্থ উপার্জনে নীতি নৈতিকতা, বিবেক, বিবেচনা বোধ বিবেচিত হয় না। অর্থ উপার্জনই যেন মূল কাজ। আমাদের দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কেবল

দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীর দিকে তাকালে চলবে না। মননশীল, দেশ ও জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, সৎ, দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী তৈরীর দিকে নজর দিতে হবে। উদার, মুক্তমনা, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননশীল, সংস্কৃতিবান নাগরিক তৈরী করে তারপর দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীর কথা ভাবতে হবে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি এ ধরনের মানব সম্পদ তৈরীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। সুতরাং, কর্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নীরব ঘাতক। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রসারের কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়।

১. শিক্ষা সেবা নয়, পণ্য হিসেবে বিবেচিত।
২. শিক্ষার অধিকার কেবল মাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত।
৩. শিক্ষকের মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি উপেক্ষিত।
৪. শিক্ষাব্যবস্থা দিনে দিনে মুনাফালোভী চক্রের হাতে জিম্মি হচ্ছে।
৫. গুণগত শিক্ষা নয়, ফলাফল সর্বস্ব শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট আমাদের দেশ, সমাজ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন, প্রসার, মানব কল্যাণের সাথে সাংঘর্ষিক। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছে। বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকেরা দেখতে পাচ্ছে টিউশনি করে, কোচিং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়। ফলে তারাও অধিক উপার্জনের আশায় টিউশনি, কোচিং এর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। স্কুলে যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাদানের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের বাইরে পড়াতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষকের আন্তরিকতা, মমতা ও যত্নের সাথে শিক্ষাদানের সুযোগ কেবলমাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েরা পাচ্ছে।

শিক্ষা বঞ্চিত, নিরক্ষর, স্বল্প আয়ের শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এভাবেই। আর তাই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কাজটি দিনে দিনে কঠিন হয়ে পড়ছে। কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না শিক্ষার হার। কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করে হাজারো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে বলা হলেও এদেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। আমাদের মত দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি হয়। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি বিস্তৃতিরই একটি কালো দিক। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষার প্রসার নয়, সংকুচিত করে। আর আমাদের সমাজে এ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা মানে পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় এক অশনি সংকেত।

৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমগুলো এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো ফলাফল এমনভাবে প্রচার করে যাতে তাদের সুনাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত শিক্ষার উন্নয়নে একটি প্রতিষ্ঠানে যেমন প্রতি বছর শতভাগ ফেল করা কাঙ্ক্ষিত নয় তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর সবাই পাশ করার বিষয়টিও অস্বাভাবিক। শতভাগ জিপিএ-৫ পেলে ভালো প্রতিষ্ঠান এবং শতভাগ ফেল করলে খারাপ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে কেন একটি প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর শতভাগ জিপিএ-৫ পায় এবং কেন আরেকটি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ফেল করে তার কারণ

অনুসন্ধান করা জরুরি। আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কারণ চিহ্নিত না করে ভালো ফলাফল করে এমন প্রতিষ্ঠানের সুনাম প্রচারে ব্যতিব্যস্ত থাকে।

মনে করা যাক, 'ক' নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম রয়েছে। ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা হতে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রধান মানদণ্ড হলো আর্থিক স্বচ্ছলতা। এছাড়া প্রতি বছর ভর্তি পরিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের ফলাফল দেখে যাচাই বাছাই করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরই নজর কাড়া ফলাফল করে থাকে। জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেই এ প্রতিষ্ঠান পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয় প্রায় প্রতি বছরই। প্রশ্ন হলো, এভাবে ফলাফল অর্জন সমর্থনযোগ্য কি না? অবশ্যই না। ভালো ফলাফল অর্জন করলেও এধরনের প্রতিষ্ঠান প্রশংসা পেতে পারে না। গণমাধ্যমগুলো যদি তা করে তাহলে তা হবে অযৌক্তিক। এই প্রশংসা সমাজে বৈষম্য ও অস্থিরতা তৈরী করবে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোকে আরো সজাগ, সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিৎ। ধরা যাক, রাঙামাটি জেলার বড়কল উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি বিদ্যালয়ের নাম 'খ' যেখানে ৫০০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। এখন 'খ' স্কুলের ৫০০ জন শিক্ষার্থি যদি 'ক' স্কুলে প্রতিস্থাপন করা যায় এবং ঐ স্কুল ভালো ফলাফল করে তবেই তা প্রসংশনীয় ও সমর্থনযোগ্য। গণমাধ্যম কেবল তখনই ঐ প্রতিষ্ঠানের স্তুতি ও প্রশংসা গাইতে পারে।

যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও দক্ষতায় দেশ ও জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে ধারাবাহিক ভালো ফলাফল করে তাহলেই তা সমর্থনযোগ্য। শুধুমাত্র সে প্রতিষ্ঠানই প্রশংসার দাবী রাখে। মনে করা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে না। স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের এখানে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করে না। ভর্তি ফি বেতনের পরিমাণও সামান্য বা স্বল্প। এখানে দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করে আমাদের সমাজে কেবল এমন প্রতিষ্ঠানই সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যৌক্তিক। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে। এতে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন ও প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান এরকম চর্চা বাদ দিয়ে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে কৃত্রিমভাবে অথবা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে।

গণমাধ্যমগুলো এমন গর্হিত কাজের সমালোচনা না করে বরং তাদের গুণগান গেয়ে চলছে। শতভাগ ফেল করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত না করে বরং তাদের দুর্নাম রটাচ্ছে। এতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যকরণের পথ আরো উন্মুক্ত হচ্ছে। বৈষম্য, অস্থিরতা, বিভেদ ও বিভাজন বাড়ছে। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার হার বৃদ্ধির স্বার্থে গণমাধ্যমগুলোকে আরো দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হওয়া জরুরি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি শিক্ষার জন্য সুখকর নয়। এটি কোনো শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। ভর্তি পরিক্ষা হবে কেবল উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নয় এমন একটি সংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরি। উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কিন্তু, সর্বক্ষেত্রে কেন তা হচ্ছে না? এ দেশের সব মানুষকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার মূল বাধা কী? এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোর কোনো পর্যবেক্ষণ খুব একটা নজরে পড়ে না।

একটি দেশের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার তথা জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা কতটুকু হবে? শিক্ষার ধরন, দর্শন, সমস্যা, অসুবিধা, উত্তরণ, সম্ভাবনা ইত্যাদি সব বিষয়ে গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষণ থাকা জরুরি। একই সাথে শিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার সুযোগ আছে। বাংলাদেশের মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। বাংলাদেশকে প্রসারমান দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে বের করা, দেশব্যাপী আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা আমাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। GINI অনুপাত বেড়ে চলছে। এমন বাস্তবতায় একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র অনেক বড়। কিন্তু, আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কি? তাদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। গণমাধ্যমগুলো খেলার খবর, বিনোদন বা খুন-খারাবিসহ নেতিবাচক খবরগুলো খুব গুরুত্বসহ প্রচার করে থাকে। তেমনি শিক্ষার মত জরুরি সেবাখাতের বেহাল দশা নিয়ে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনার বিষয়গুলো অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছে। যেন কর্পোরেট আদলে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম প্রচারই তাদের কাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের এ রকম আচরণ অনেকাংশে দায়ী।

শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণের এই সংস্কৃতি একজন শিক্ষকের দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও আন্তরিকতা থাকে তা শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনে। এতে অর্থই হয়ে ওঠে শিক্ষা প্রদানের মূল মাধ্যম। এটা সত্য, আগে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের যে দরদ, মমতা, আন্তরিকতা ছিল দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে এ যুগের শিক্ষকদের মধ্যে তা দেখা যায় না। শিক্ষা বাণিজ্য শিক্ষকদের এ মহান গুণটুকু কেড়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠান নয় শিক্ষা অর্জনের মূল ভূমিকা এখন পরিবারের হাতে। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন সুনাম অর্জনের জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়- অভিভাবকরাও তাদের ছেলে-মেয়েদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সরকার, গণমাধ্যমের সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলে যায়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীকে পড়াতে বছরে লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। দেখা যায়, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ধর্মসহ বাংলা প্রথম পত্রের মত বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের চাইতে শিশুদের পড়াশুনায় পরিবারের গুরুত্বই বেড়ে চলছে। শিক্ষকদের একটি অংশ ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে। দেশ ও সমাজের জন্য এটি কোনো শুভ লক্ষণ নয়। কেন হচ্ছে? এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলোর কোনো উৎসাহ নেই।

৭. সুপারিশ মালা

দেশের প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিক্ষা হয় সুলভ ও সহজলভ্য। আর এ জন্য প্রয়োজন একটি সুষম, সুন্দর, অর্থবহ, গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত করতে সক্ষম না হলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে না। আজ বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের দেশে তা নিশ্চিত করতে চাইলে প্রতিটি শিশুর জন্যই শিক্ষার সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যক্রম এবং সহ পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষাকে কর্পোরেট সংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন তথা সুস্থ ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধক। দেশ ও গণমানুষের স্বার্থে,

উন্নয়নের স্বার্থে যেকোনো মূল্যে এ সংস্কৃতি প্রতিহত করতে হবে। একটি সুন্দর, সুষম, গ্রহণযোগ্য, গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

১. সব বেসরকারি স্কুল, কলেজ দ্রুততম সময়ে জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো দিতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক ও অআর্থিক সুবিধা বাড়িয়ে তাদের মর্যাদা বাড়াতে হবে।

২. বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা বাণিজ্য করে যারা প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছে তাদের তালিকা তৈরী করতে হবে। একই সাথে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বাণিজ্য করছে তাদের তালিকা তৈরী করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার শতভাগ বন্ধ করতে হবে।

৩. সব বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। বেতন হার, ভর্তি ফি সারা দেশে একই থাকবে।

৪. বিভিন্ন নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। ভর্তি ফি-তে কী কী বিষয় থাকবে এবং প্রতিটি ক্যাটাগরিতে কি পরিমাণ ফি থাকবে তা জাতীয়ভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাসিক বেতন আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার আগে কোচিং-এর নামে কোচিং ফি আদায়ের সংস্কৃতি দেশব্যাপী চালু আছে। একই সাথে মডেল টেস্ট নেয়ার নামেও ফি আদায় করা হয়। এ ধরনের ফি সারা দেশে যেন একই পরিমাণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের বাইরে গণমাধ্যম এর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং এর নেতিবাচক দিক পর্যবেক্ষণ, এই সংস্কৃতি থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ, গবেষক, জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

৭. **শেষ কথা:** শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি দেশ ও জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কর্পোরেট সংস্কৃতির মূল কথাই হলো মুনাফা। শিক্ষার মত জরুরি সেবাকে পণ্যে পরিণত করে মুনাফা অর্জনের সংস্কৃতি পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত। প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে যেকোনো মূল্যে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং একই সাথে কর্পোরেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অস্থির ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এ থেকে পরিত্রাণে নতুন করে সুন্দর, গোছানো, পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং, কাল বিলম্ব না করে এখনই আমাদের এই সংস্কৃতি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Farashuddin, Mohammed. Education, Employment and Equity: The Bangladesh Context, BEA: SMS Kibria Memorial Lecture. BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, Volume 26 Number 1, June 2010.
2. Marching towards Growth, Development and Equitable Society, Budget Speech, 2016-17, Ministry of Finance, Peoples Republic of Bangladesh, 02 June, 2016.
3. Internet.
4. Zaman, Jasimuz. Rural High Schools in Bangladesh: An Experiment on Quality Education, Bangladesh Education Journal, Volume-15, Number – 2, December, 2016.

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬।

৬. চক্রবর্তী, উত্তরা, যবনিকা সরে যায়, শিক্ষা: এক নিঃশব্দ বিপ্লব, সম্পাদনায় স্বরাজ সেনগুপ্ত, রেনেসাঁস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬।

৭. জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৮. মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য (নবম-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৪।

৯. মিত্র, বিনয় : বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রূপ ও রীতি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

১০. সমকাল, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলো Daily Star, DhakaTribune সহ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকশিত প্রতিবেদন, কলাম, ফিচার।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 191-222
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা

(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের পর্যালোচনা)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারকথা: *বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটা কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫% এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। এদেশের অর্থনীতির গতি মন্থর হলেও কৃষির উপর নির্ভর করে এখানে বেশকিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ ভুখণ্ডে অনেকগুলো পাট শিল্প গড়ে ওঠে। মূলত শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারীরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়ত্ব জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মত কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। অবশ্য এ দেশে ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতি সর্বোপরি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত জুট মিলের সংখ্যা ৯টি। এর মধ্যে যেগুলো চালু আছে তার অবস্থাও সংকটাপন্ন। পাট শিল্পের এ দুরবস্থার কারণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জানা, সর্বোপরি, বিদ্যমান বাস্তবতা অর্থনীতি এবং নীতি-নৈতিকতার সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ বা সংগতিহীন সেই বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।*

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভালমানের পাট এখানে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ ভাগ এখানে উৎপাদিত হয়। এ দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ ভূখণ্ডে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত ৭৮টি পাটকল ছিল। সম্প্রতি, এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে। লোকসানের অজুহাতে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মত কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেগুলো চালু আছে সেগুলোতে বকেয়া মজুরীর কারণে শ্রমিক অসন্তোষসহ

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা

বহুবিধ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিজেএমসি-র ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জুট মিলের শ্রমিকেরা মজুরীসহ বেশকিছু দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। তাদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রমিকরা তাদের পিএফ এবং গ্রাচুইটির টাকাসহ বকেয়া প্রাপ্তির জন্যও লড়াই করছেন। এ অবস্থা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা অর্থনৈতিক নীতি-নৈতিকতার বিচারে চরম অমানবিক।

পাট শিল্পের সংকট: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা

বাংলাদেশ, তৃতীয় বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল দেশ। সশস্ত্র সংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা লাভের বয়স প্রায় পাঁচ দশক। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায় ৯৯.৯৯, শতাংশ নয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তাদের আত্মদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ আর লাল সবুজের পতাকা। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা যায়: মুক্তিযোদ্ধা ছিল দুই রকম, (এক) ঘটনাচক্রে (By chance) (দুই) দেশ মাতৃকার টানে স্বপ্রণোদিত তারা ছিলেন স্বেচ্ছায় (By choise) মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার এত দিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, হিসাব পত্তর, সুযোগ-সুবিধাসহ সামগ্রিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন চাকুরির কারণে বা বিভিন্ন বাস্তবতায় এমন কি জীবন বাঁচাতে নিরাপদে বিদেশে অবস্থান করতে, পরবর্তীতে বিভিন্ন সংযোগ ব্যবহার করে অর্থাৎ ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন তারা সুবিধাটাও গ্রহণ করেছেন বেশী। অন্যদিকে, যারা ১০০ ভাগ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মা, মাটি, মানুয়ের টানে দেশ-মাতৃকার জন্য স্ব-উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন আশ্রয়- প্রশ্রয় অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র-বুদ্ধি দিয়েছেন তারা আজ বহুলাংশে বঞ্চিত, বহিঃস্থ, নিঃস্ব এমনকি অনেকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকেও বঞ্চিত।

এছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তাকারী বেশীরভাগই গ্রামীণ জনপদের প্রান্তিক মানুষ। তারা বেশীর ভাগই ছিলেন নির্মোহ এবং নির্লোভ তবে প্রত্যাশা ছিল এক জায়গায়, তাহলো, মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে তারা আর বহিঃস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব থাকবেন না। মুক্তির প্রকৃত স্বাদ পাবেন প্রজন্মকে সেই স্বপ্ন সাধের অংশিদার করতে পারবেন। দেশ মাতৃকা হবে তাদের। ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের চার মূলনীতির মর্মবাণীও তাই। অর্থাৎ বঞ্চিত, বহিঃস্থ মানুষদের দুর্দশা ঘুচিয়ে সুষম বণ্টন- সুষম উন্নয়ন, শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ রাষ্ট্র পরিকাঠামো বিনির্মাণ। মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশাও ছিল তাই। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার পরিকাঠামো এবং মৌল মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায়ও এদেশের বেশীরভাগ মানুষ যারা আজ কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিপুষ্ট। রাষ্ট্র তার সংবিধানের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের অধিকারকে মেনে নিয়েছে। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সত্যিকার মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিতের প্রশ্নে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করছে কী? শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে পাটশিল্প এবং তার শ্রমিকেরা অগণিত সমস্যায় জর্জরিত।

এমনকি চাকুরি জীবন শেষেও তাদের ন্যায্য পাওনা (অর্জিত) পিএফ, গ্রাচুইটির জন্যও লড়াই করতে হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূলনীতি, সর্বোপরি স্বাধীন দেশের মৌল মানবিকতা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির সাথে সংগতিহীন, নীতি-নৈতিকতা (Ethics) এর সাথে সাংঘর্ষিক; এটি কাম্য নয়।

পাট শিল্প রক্ষা এবং পাট শিল্প শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের লড়াই

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

- পাটশিল্পের বর্তমান সংকটে অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ;
- পাট এবং পাট শিল্পের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ;
- পাট ও পাট শিল্পের সাথে কৃষি অর্থনীতির যোগসূত্র বিশ্লেষণ;
- পাটের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং সমস্যা চিহ্নিত করা;
- পাট ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা;
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকটি খুঁজে দেখা এবং সুপারিশমালা তৈরি করা।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত তথ্য; বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা এবং প্রকাশনা, এবং এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত নানা প্রবন্ধ। এছাড়াও, সরাসরি পাট শিল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ভুক্তভোগী শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের সাথে ছোট দলে নিবিড় অনুসন্ধান করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চল মূলত খুলনা বিভাগ কেন্দ্রিক। বলা যায় পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০ জেলা আর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী চির সবুজ অনুপম ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যমণ্ডিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশ নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ত; বাকী অধিকাংশ সমভূমি। এখানে কৃষি শষ্যের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চল রবি শস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। পাট চাষের উর্বর ক্ষেত্র বলেই এ অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে।

মানচিত্রঃ

ভৌগোলিক অবস্থান: খুলনা বিভাগের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা রয়েছে। এটি নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি, ভৈরব ও কপোতাক্ষ। এছাড়াও, অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশ হতে উত্তর অংশে এবং পূর্ব দ্রাঘিমা হতে পূর্ব দ্রাঘিমায়।

পাট চাষের ইতিকথা

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের মধ্যে মাত্র ডজন খানেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, মিয়ানমান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিল। তবে এক সময় বাংলাদেশ বাণিজ্যিক দিক থেকে এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসাবে বিবেচিত হত। বিশ্ব বাজারের ৮০% পাট আমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হত। বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে। ১৯৭৮ সাল নাগাদ ভারত পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রথম স্থান দখল করে। আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বাণিজ্যিকভাবে আমাদের এ অঞ্চলের পাট চাষের সূচনা করে বৃটিশরা। ১৮৭৩ সালে এইচ সি কারকে চেয়ারম্যান করে পাট বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী। এই কমিশন পাট চাষের সূচনা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। কমিশন বাংলায় পাট চাষ এবং ব্যবসার উপর প্রতিবেদন শিরোনামে ১৮৭৭ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ৪ এর দশক ও তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের রংপুরে পাটের আবাদ শুরু হয়। ক্রমশ তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট চাষের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ ভূ-খন্ডের কৃষক। কৃষি অর্থনীতিতে জায়গা দখল করতে থাকে সোনালী আঁশ। একে ভরসা করে পরবর্তীতে গড়ে ওঠে পাট শিল্প।

পাট ও পাট শিল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এদেশের ২০ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় যা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫%। পাটের উপর দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। এ সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের আগে পর্যন্ত এ ভূখণ্ডে কোন পাট শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল। ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে পাটকল গড়ে ওঠে। বর্তমানে চালু পাটকলগুলোতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মে.টন পাটজাত দ্রব্য তৈরি হয় যা বিদেশে রপ্তানী করে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলার আয় হয়। সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বেড়েছে। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল ছিল ৭৮টি। ২০০৪ সাল নাগাদ লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় প্রায় ৬০টি। বর্তমানে বিজেএমসি-র অধীন পাটকলের সংখ্যা ২২টি। গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা খুলনা/যশোর অঞ্চলের বিজেএমসি-র নিয়ন্ত্রিত ৯টি পাটকলের অবস্থা সংকটাপন্ন। শ্রমিকদের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ।

বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর পাট চাষাধীন মোট জমি, মোট উৎপাদন ও একর প্রতি উৎপাদনের চিত্র, ২০০০-২০০৪ সময়ে

ন্দ্রণ্টক্র ও	থ[[[ঢথ[[ও					থ[[ঢথ[[থ ও					থ[[থ ঢথ[[ধ ও					থ[[ধ ঢথ[[ন ও				
	দ্রওদ্রও	ংক্টস্শ্চদ্রৈও্েওস		দ্ধম্ব ড়স্ট্রডও		ষ্ঠঅদ্রওদ্রও	ংক্টস্শ্চদ্রৈও্েওস		দ্ধক্ষৎস্ট্রডওঙৎ		ষ্ঠঅদ্রওদ্রও	ংক্টস্শ্চদ্রৈও্েওস		দ্ধম্ব ড়স্ট্রডও		ষ্ঠশদ্রওদ্রও	ংক্টস্শ্চদ্রৈও্েওস		দ্ধ ড়স্ট্রডৎ	ষ্ঠশ
	ুৃ ও দ্রঙ্কৈ ও ংক্টস্শ্চ			ঙ ও		ুৃ ও দ্রও ংক্টস্শ্চদ্রডেও					ুৃ ও দ্রঙ্কৈ ও ংক্টস্শ্চ			ঙ ও		ুৃ ও দ্রঙ্কৈ ওংক্টস্শ্চদ্রডে			ঙ ও	
		ডৈঙ্কৈ ও				কৈ ও	কৈ ও					ডৈঙ্কৈ ও					কৈ ও			
ব ও	থও	ধও	নও	পও	ফও	বও	ভও	মও	ব[ও	ব ও	বথ ও	বধ ও	বন ও	বপ ও	বফ ও	বব ও	বভ ও	বম ও	থ[ও	থ্ব ও
বষ্ঠওগুশ্চস্ট্রশ্চন্দ্রও	ব৭ ও	[ণভ্র ও	[ণবন ও	ধ্বণ[ও	&b&	বণথভ ও	[ণমথ ও	[ণবথ ও	ধ[ণ[ও	&b&	বণ[প ও	[ণবভ ও	[ণবন ও	থপণ[ও	&b&	বণ[প ও	[ণবথ ও	[ণফভ ও	থনণ[ও	&b&
থষ্ঠওট্টশ্চক্ষ্ণ	থ৭ফ ও	বণফথ ও	[ণবপ ও	ফ্নণ[ও	&b	থণনথও	বণভম ও	[ণবভ ও	ফথণ[ও	&b	থণপধও	থণ[ফ ও	[ণভ্র ও	ফফণ[ও	&b	থণধবও	বণমভ ও	[ণভধ ও	ফবণ[ও	&b
ধষ্ঠওক্তৈও	[৭থ ও	[৭ধ ও	বণ[থ ও	[পণ[ও	&&b	[৭থ ও	[৭ ও	[ণভফ ও	[নণ[ও	&&b	[৭ন ও	[৭ফ ও	ব৭থ ও	[পণ[ও	&&b	[৭ন ও	[৭ব ও	ব৭প ও	[ফণ[ও	&&b
নষ্ঠওদ্রঙ্গশ্চৈশ্চও	[ণ[ব ও	[ণ[ধ ও	[ণধফ ও	ৎণ[ও	&&b	[৭ধ ও	[ণ[প ও	[ণধভ ও	[থণ[ও	&b	[৭প ও	[ণ[ন ও	[ণথম ও	ৎণ[ও	&b	[৭প ও	[ণ[ন ও	[ণথম ও	ৎণ[ও	&&b
পষ্ঠওীস্শ্চও	[ণ[ন ও	[ণ[থ ও	[ণনথ ও	ৎণ[ও	&b	[ণ[ধ ও	[ণ[থ ও	[ণপম ও	[[ণ[ও	&&b	[ণ[ধ ও	[ণ[থ ও	[ণপম ও	ৎণ[ও	&b	[ণ[ধ ও	[ণ[থ ও	[ণপম ও	ৎণ[ও	&b
ফষ্ঠওশ্চেয় শ্চ	[ণ[প ও	[ণ[ধ ও	[ণফথ ও	ৎণ[ও	&&b	[ণ[ম ও	[ণ[ফ ও	[ণফথ ও	[থণ[ও	&&b	[ণ[ভ ও	[ণ[ফ ও	[ণফব ও	[থণ[ও	&&b	[ণ[ফ ও	[ণ[ন ও	[ণপম ও	ৎণ[ও	&&b
ৣগু ভ্রশ্চ	ধণপপও	থণফন্ও	[ণবন ও	ব[[ণ[ও	b	নণ[বও	ধণ[প ও	[ণবপ ও	[[ণ[ও	b	ধণমভও	ধ৭থ ও	[ণবভ ও	ব[[ণ[ও	b	ধণভ[ও	থণমবও	[ণবভ ও	[[ণ[ং	b

ঢ

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন এবং এলাকার পরিমাণ

ঙ্গ ও	ংক্টস্প্চ্ছৈওজ[[ঞ্চঝৈ ও	্লশুচশচওজ[[ুৃঝ ও
বমমধ ঢমনও	ভ[ভ ও	বভথ ও
বমমন ঢমপও	মফনও	বধভধ ও
বমমপ ঢমফও	বধম ও	বধধ ও
বমমফ ঢমবও	ভভধ ও	বথপধ ও
বমমব ঢমভও	ব[পব ও	বনথব ও
বমমভ ঢমম ও	ভ্রথ ও	বভ্র ও
বমমম ঢথ[[[ও	ব্ব ও	ব[[ভ ও
থ[[[ঢ্র ও	ভথ্ব ও	ব[ব ও
থ[[ব ঢ[থ ও	ভপমও	বথভ ও
থ[[থ ঢ[ধ ও	ভ[[ও	ব[বম ও
থ[[ধ ঢ[ন ও	বমনও	ব[[ভ ও
থ[[ন ঢ[প ও	ব[ধপ ও	মফপও
থ[[প ঢ[ফ ও	ভধভ ও	মধম ও
থ[[ফ ঢ[ব ও	ভবমও	ব[ধন ও
থ[[ব ঢ[ভ ও	ভধথ ও	ব[ভম ও

পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র এ ভূখণ্ড

বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। এদেশের মাটি, পানি, জলবায়ু, পরিবেশ পাট চাষের উপযোগী। তুলনামূলক সুবিধা এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় এ দেশের কৃষি এবং শ্রমজীবি মানুষের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় পাটের উৎপাদন যেমন বেশি। ফলে কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানীর পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। পাট জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিজেএমসি-র নিয়ন্ত্রিত জুট মিল ও তার বর্তমান পরিস্থিতি

মজুরীর সাথে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক নিবিড়। একজন শ্রমিক তার কায়িক এবং মানসিক শ্রমের যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে তেমনি তার জীবন-জীবিকাও দুর্বিসহ হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ একটা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে, পাট শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরী ও বিভিন্ন দাবিতে উৎপাদন বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছে। এ প্রসংগে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হলো।

মজুরী এবং জীবন জীবিকা

একজন শ্রমিকের মজুরী প্রচলিত বাজারব্যবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়হীন হলে জীবন ও জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। মজুরীর সাথে উৎপাদনশীলতা এবং জীবন-জীবিকার সম্পর্ক বিদ্যমান। মজুরী কম হলে জীবন-জীবিকার সংকট বাড়ে। কতগুলো সূচকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়।

বিশ্বে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, ১৯৯৮-২০০৩ সময়ে

	কাঁচা পাট								পাটজাত পণ্য							
বছরসমূহ	বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব		বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব	
	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৮-১৯৯৯	০.৩২	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩৪	১০০.০	০.৪০	৫৩.০	I	০.২৪	৩২.০	II	০.৭৫	১০০.০
১৯৯৯-২০০০	০.৩০	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩২	১০০.০	০.৪৩	৬২.০	I	০.১৬	২৩.০	II	০.৬৯	১০০.০
২০০০-২০০১	০.২৮	৯০.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩১	১০০.০	০.৩৮	৫৯.০	I	০.১৮	২৮.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০১-২০০২	০.২৫	৮৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩০	১০০.০	০.৪১	৬৪.০	I	০.১৫	২৩.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০২-২০০৩	০.৪১	৯৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.88	১০০.০	০.৪০	৫৯.০	I	০.১৯	২৮.০	II	০.৬৮	১০০.০

পাট রপ্তানীর তুলনামূলক চিত্র

সময়	মোট রপ্তানী (কোটি টাকা)	পাট রপ্তানী (কোটি টাকা) (কাঁচা পাট এবং পাট পণ্য)	মোট রপ্তানীতে পাটের অংশ (%)
১৯৯৩-৯৪	৯৭৯৯	১২১২	১২.৩৭
১৯৯৪-৯৫	১৩১৩০	১৬২১	১২.৩৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৮৫৭	১৫৩৪	১১.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৬৫৬৪	১৮৬৮	১১.২৮
১৯৯৭-৯৮	২০৩৯৩	১৮১২	৮.৮৯
১৯৯৮-৯৯	২০৮৫১	১৪৩৮	৬.৯০
১৯৯৯-২০০০	২৪৯২৩	১৫০১	৬.০২
২০০০-০১	৩২৪১৯	১৬৭৬	৫.১৭
২০০১-০২	৩০৯৩৪	১৭৭৭	৫.৭৪
২০০২-০৩	৩৩২৪২	১৬৭৩	৫.০৩
২০০৩-০৪	৪০৫৮১	১৭২৫	৪.২৫
২০০৪-০৫	৫০৮৩৫	২২৪১	৪.৪১
২০০৫-০৬	৬২৬০১	৩০১৯	৪.৮২
২০০৬-০৭	৭৮৯৩১	৩৫৭৯	৪.৫৩
২০০৭-০৮	৮৬২৮৩	৩৬৩০	৪.২১

মজুরী-উৎপাদনশীলতা-রপ্তানী-জীবন জীবিকা একটি চক্রাকার প্রবাহ

মিলের শ্রমিকদের মজুরী কম বা না পাওয়া অর্থাৎ বকেয়া থাকার কারণে উৎপাদনশীলতা নিম্নমুখী। উৎপাদন কমার ফলে পাটজাত পণ্যের রপ্তানী কমবে। এ কারণে রপ্তানী আয় কমবে, মিলের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হবে। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। শ্রমিকেরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এটি একটি চক্রাকার প্রবাহ।

বকেয়া মজুরী [শ্রমিক অসন্তোষ [নিম্ন উৎপাদন [কম রপ্তানী [কম আয় [জীবন-জীবিকার সংকট [উৎপাদনে অনাগ্রহ [উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি [বকেয়া মজুরি।

৬/৭ কোথাও ৮ মাস বকেয়া।
এ সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবারে চলছিল নিরব দুর্ভিক্ষ।
প্রতিবাদে খোরা/থালা এবং ঝাড়ু মিছিল হয়েছিল।
বুভূক্ষু শ্রমিকেরা মহাসড়কে ঈদের নামাজ পড়েছিল।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বঞ্চনার শেষ কোথায়? কেউ জানে না

পাট শিল্পের সাথে শ্রমজীবি মানুষ অস্থায়ী, স্থায়ী মিলিয়ে যৌবন-জীবনের প্রায় সবটুকু শ্রম-ঘাম নিঃশেষ করেছেন, নিজের অর্জিত পি.এফ এবং গ্রাচুইটি বাবদ পাওনা কখন পাবেন, কীভাবে পাবেন, কার

বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত খুলনা-যশোর অঞ্চলের পাটকলগুলোর প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন শুরু, জাতীয়করণ এবং তাঁত সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (সাল)	উৎপাদন শুরু (সাল)	তাঁত সংখ্যা হেসিয়ান	তাঁত সংখ্যা সেকিং	তাঁত সংখ্যা সিবিসি	মোট
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১৯৫২	১৯৫৪	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১১৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৯৫৫	১৯৫৮	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
পিপল্স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯৫২	১৯৫৪	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৭	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
আলীম জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৮	১৬২	৮৮	-	২৫০
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৯৬৩	১৯৬৫	-	-	৮৬	৮৬
জেজেআই	১৯৬৬	১৯৭০	৩০০	১০০	৫৬	৪৫৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৯৫৬	১৯৫৮	৫৬০	২০০	-	৭৬০
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৯৫৪	১৯৫৫	১৭০	৮০	-	২৫০

* ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭ বলে সংশ্লিষ্ট পাটকলগুলো জাতীয়করণ করা হয়।

উপকরণ (পাট) মজুদ/ক্রয়ের বাস্তব অবস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দৈনিক পাটের চাহিদা	আজকের আমদানী (২০/০৪/২০১৫) (কুইন্টাল)	০১/০৭/২০১৪ থেকে ২০/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রয়	অর্জিত হার (ক্রয়ের হার)	২০/০৪/২০১৫ পর্যন্ত মজুত					
						মিল ঘাট		ক্রয় কেন্দ্র		সর্বমোট	
						পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	২৭,৯,৪৫৮ কুইনটাল	৯৩৬ কুইনটাল	৮০	৭১,৫৪৩	২৬%	৪,২৩৫	৫	১,২৭৬	১	৫,৫১১	৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২১,৭,৪৬৮ কুইনটাল	৭৫১ কুইনটাল	-	৫২,০০৫	২৪%	৩,৭৮৫	৫	১,৬৭৯	২	৫,৪৬৪	৭
পিপল্স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯,৮,৫২৯ কুইনটাল	৬৯২ কুইনটাল	-	৮৬,৩৭৭	৪৩%	১৬,৬৪৫	২৪	৩,০৩৭	৪	১৯,৭১৮	২৮
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৭১,৩২৭ কুইনটাল	২৫২ কুইনটাল	১৬০	২৪,২৭৫	৩৪%	১,৮১১	৭	৭২১	৩	২,৫৩২	১০
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৭,২৯৫ কুইনটাল	১৯৮ কুইনটাল	-	১১,৮৩৮	২০%	-	-	-	-	-	-
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩১,৩৭২ কুইনটাল	১১২ কুইনটাল	-	২২,২৯০	৭১%	১,৪৭৯	৫	৭৩	১	১,৫৫২	৬
জেজেআই	৯৮,৭৬৯ কুইনটাল	৩৩৫ কুইনটাল	-	২৬,২০০	২৭%	১,৭৯৭	৫	৪৪০	১	২,২৩৭	৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১,৩৮,০২৬ কুইনটাল	৪৭৭ কুইনটাল	-	৩২,০১৯	২৩%	৪,৭৪০	১০	২,৫২৮	৫	৭,২৬৮	১৫
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	৬১,১৮৯ কুইনটাল	২০৯ কুইনটাল	-	১৭,৭৫০	২৯%	৬৪৬	৩	৫৬১	৩	১,২০৭	৬

খুলনা অঞ্চলের মিলে পাট মজুদের অবস্থা হতাশাব্যাঞ্জক

ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিজেএমসি-র জুট মিলের পাট মজুত/ক্রয় পরিস্থিতির খতিয়ান:
(এপ্রিল ২০১৪ সময়ে হিসাব)

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	পাট মজুদের পরিমাণ (দিন)
চট্টগ্রাম	আমীন জুট মিলস্ লিঃ	৫ দিন
চট্টগ্রাম	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	৩১ দিন
চট্টগ্রাম	এম. এম জুট মিলস্ লিঃ	১৭ দিন
চট্টগ্রাম	বিডি সিএফ লিঃ	৩২ দিন
চট্টগ্রাম	গুল আম্মেদ জুট মিলস্ লিঃ	১৫ দিন
চট্টগ্রাম	আর আর জুট মিলস্ লিঃ	৪১ দিন
ঢাকা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	২৮ দিন
ঢাকা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	৬৪ দিন
ঢাকা	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	৫০ দিন
ঢাকা	ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ	৪২ দিন

মজুরীর অবস্থা	ক্যালরি হিসাবে খাদ্য গ্রহণ	শিক্ষার প্রবণতা	ক্রয় ক্ষমতা	চিকিৎসা সেবা	পোশাক পরিচ্ছদ	জীবন জীবিকার ঝুঁকি	সঞ্চয় প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	অপরাধ প্রবণতা
মজুরী কম/বকেয়া	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	বাড়বে
সঠিক মজুরী/নিয়মিত মজুরী	স্বাভাবিক	উর্ধ্বমূখী	বাড়বে	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	কমবে	উর্ধ্বমূখী	উর্ধ্বমূখী	কমবে

মাধ্যমে পাবেন, মৃত্যুর পর (?) এ অর্থের মালিক কে হবেন, ভোগইবা করবেন কে? তার হিসাব এখন মেলানো যাবে না। সবই অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা আর বাকী খাতার হিসাব।

এখানে শতকরা হিসাব হলো স্থায়ী, অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক যে শ্রমশক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকার কথা বাস্তবে তার কত ভাগ নিযুক্ত ছিল সেই হার। (কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ নষ্ট ইত্যাদি কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনি)

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের সংকটের কারণে আর্থ-সামাজিক প্রভাব

(পাট শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতি বিশেষ করে, পাট চাষীদের উপর প্রভাব)

মূলত পাট শিল্পের কাচাঁ মাল পাট। এক সময় পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হত। এখন বলা হয় সোনালী আঁশ কৃষকের গলার ফাঁস। কারণ পাট শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষসহ অন্যান্য কারণে পাট শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা কমছে। পাটের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

শ্রমজীবি মানুষের মজুরী ভোগান্তি চলছেই
(বকেয়া মজুরী/বেতনের হিসাব- আগষ্ট ২০০৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের)

প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকদের অপরিশোধিত সাপ্তাহিক মজুরী		কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতন		গত ০৬/০৭ সালের পাওনা
	সময়	টাকা	সময়	টাকা	ঈদুল আযহার উৎসব বোনাস
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১১ সপ্তাহ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ	৫ মাস	১ কোটি ৭৯ লক্ষ	২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
পিপল্স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৬ সপ্তাহ	৬ কোটি ৬ লক্ষ	৬ মাস	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯ সপ্তাহ	২ কোটি ২০ লক্ষ	৫ মাস	৭৫ লক্ষ	৫৬ লক্ষ টাকা
আলীম জুট মিলস লিঃ	২৭ সপ্তাহ	২ কোটি ৫১ লক্ষ	৮ মাস	৮৬ লক্ষ	৫৩ লক্ষ টাকা
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	১ কোটি ৪ লক্ষ	৪ মাস	৫২ লক্ষ	৩০ লক্ষ টাকা
জেজেআই	১৫ সপ্তাহ	২ কোটি ২৫ লক্ষ	৩ মাস	৬৭ লক্ষ	৯১ লক্ষ টাকা
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৫ কোটি ২১ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ১২ লক্ষ	১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

বিগত ০৪ (চার) বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের অবসরে যাওয়া শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ এবং গ্রাচুইটির বিবরণী:

ক) গ্রাচুইটি

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৭০	৩০১.৩৩	২৬.৯৫	২৭৪.৩৮	৫৮	২৬৪.৪৩	৪.০৮	২৬০.৩৫
কর্মচারী	৯	৭৭.৭৭	০.১৬	৭৭.৬১	১৫	৮৯.১৩	২.১৭	৮৬.৯৬
কর্মকর্তা	২	৩০.৫২	২.১২	২৮.৪০	০	০	০	০.০০
মোট	৮১	৪০৯.৬২	২৯.২৩	৩৮০.৩৯	৭৩	৩৫৩.৫৬	৬.২৫	৩৪৭.৩১

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৬৩	৩১০.৭১	০	৩১০.৭১	৭৭	৩৪৩.৮৯	০.০৭	৩৪৩.৮২
কর্মচারী	৫	৩৪.০৪	২.১২	৩১.৯২	১৬	১৪৭.০৯	০	১৪৭.০৯
কর্মকর্তা	০	০	০	০.০০	৩	৯১.৩৫	০	৯১.৩৫
মোট	৬৮	৩৪৪.৭৫	২.১২	৩৪২.৬৩	৯৬	৫৮২.৩৩	০.০৭	৫৮২.২৬

খ) পিএফ

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৪২	১৩৬.০১	৮১.৫৫	৫৪.৪৬	৪০	১২৫.৬৮	৫৪.২৯	৭১.৩৯
কর্মচারী	৮	৫৬.৬৭	২১.৫০	৩৫.১৭	১৩	৫০.৪৭	১৪.৭৯	৩৫.৬৮
কর্মকর্তা	০	-	-	-	০	-	-	-
মোট	৫০	১৯২.৬৮	১০৩.০৫	৮৯.৬৩	৫৩	১৭৬.১৫	৬৯.০৮	১০৭.০৭

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৫৩	১৪৪.১৩	২২.৫১	১২১.৬২	৭৩	২৩০.১৪	৬.৫৫	২২৩.৫৯
কর্মচারী	৬	২২.৫৫	৭.১০	১৫.৪৫	১১	৬৩.০৬	১.৫৫	৬১.৫১
কর্মকর্তা	২	১২.২৯	৪.৩০	৭.৯৯	৬	৪৭.৬২	১৮.৯০	২৮.৭২
মোট	৬১	১৭৮.৯৭	৩৩.৯১	১৪৫.০৬	৯০	৩৪০.৮২	২৭	৩১৩.৮২

উল্লেখিত মিলসগুলোর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত এবং বকেয়া গ্রাচুইটির বিবরণ:
(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/পরিশোধ	অবশিষ্ট/বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ	২৬৮	৪৫	৫	৩১৮	১৬৯০.২৬	৩৭.৬৭	১৬৫২.৫৯
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ	১৪৬	৩৩	-	১৭৯	৯২১.১৮	৭৬.৫৩	৮৪৪.৬৫
ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ	৩১১	৫৪	১৭	৩৮২	১৯৬১.৬৩	৫৭০.২০	১৩৯১.৪৩
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪০৬	৬৩	১৭	৪৮৬	২৭৯৬.৩১	২৫৫৪.২৫	২৪২.০৬

উল্লেখিত মিলগুলোর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত এবং বকেয়া পিএফ এর বিবরণ:
(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/পরিশোধ	অবশিষ্ট/বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ	২০৮	৩৮	৮	২৫৪	৮৮৮.৬২	২৩৩.০৪	৬৫৫.৫৮
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ	-	-	-	১৭৮	৯৬১.০০	৪১৬.৯১	৫৪৪.০৯
ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ	২২৪	২৭	১৭	২৬৮	৭৫৫.৯২	২৫৮.৮৩	৪৯৭.০৯
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪৩৭	৬২	২৪	৫২৩	১৩১০.৮৯	৭৫৩.৯১	৫৫৬.৯৮

উৎপাদনের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক (২০ এপ্রিল ২০১৫ এর পরিসংখ্যান)

প্রতিষ্ঠানের নাম	তাঁত হেসিয়ান, সেফিং, সিবিসি চালু থাকার কথা	চালু ছিল	চালু থাকার হার (%)	স্থায়ী শ্রমিক (কর্মরত) জন	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন	উৎপাদনের হার
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১০৬১	৫১৪	৪৮.৪৪%	৩৪৯৬	৮৯.১১ মেঃ টঃ	২৫.০৮ মেঃ টঃ	২৮.১৪%
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	৭৮৯	৫৪৬	৬৯.২০%	৩৩৪২	৭১.৫৫ মেঃ টঃ	১২.১০ মেঃ টঃ	১৬.৯১%
পিপল্স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	৬২০	৪৬৭	৭৫.৭২%	২৭৩৭	৬৫.৯১ মেঃ টঃ	৩১.১২ মেঃ টঃ	৪৭.২১%
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	২৩৩	১৪৭	৬৯.০৯%	১০৫৭	২৪.০১ মেঃ টঃ	১২.৩৪ মেঃ টঃ	৫১.৩৯%
আলীম জুট মিলস লিঃ	২০৬	৬০	২৯.১২%	৫৫৩	১৮.৮২ মেঃ টঃ	০৬.০৪ মেঃ টঃ	৩২.০৯%
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৬০ (শুধু সি.বি.সি)	৫২(শুধু সি.বি.সি)	৮৬.৬৬%	৫৯২	৯.৩৫ মেঃ টঃ	০৫.০১ মেঃ টঃ	৫৩.৫৮%
জেজেআই	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮%	১২৯৮	৩১.৯৩ মেঃ টঃ	০৭.৭১ মেঃ টঃ	২৪.১৪%
স্টার জুট মিলস লিঃ	৫৫৫	৩৯৫	৭১.১৭%	২১৭৬	৪৫.৪৬ মেঃ টঃ	১২.০৭ মেঃ টঃ	২৬.৫৫%
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৮৫	৬১	৩২.৯৮%	৫১১	১৯.৯২ মেঃ টঃ	০৬.৩৪ মেঃ টঃ	৩১.৮২%

স্থায়ী-অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের কর্মে নিযুক্তির খতিয়ান (২০/০৪/২০১৫ইং)

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত শ্রমিক		মোট	হার %	মন্তব্য
	স্থায়ী	অস্থায়ী/দৈনিক	(জন)		
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	৩১২৯	৩৬৭	৩৪৯৬	৭৫%	
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২৯১৫	৪২৭	৩৩৪২	৮৪%	
পিপল্স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	-	২৭৩৭	২৭৩৭	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৯৫৯	৭০	১০২৯	৮৪%	
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৫০	৩৪	৫৮৪	৬৫%	
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩৪৩	২৪৯	৫৯২	৯৬.৮৯%	
জে.জে.আই	১০০৮	২৯০	১২৯৮	৭১%	
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৭৮৯	৩৮৭	২১৭৬	৭৪%	
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	-	৫১১	৫১১	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।

অর্থকরী ফসল	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
পাট	১১ লক্ষ ২৮ হাজার একর	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মে.টন
চা	১ লক্ষ ২০ হাজার একর	৫৭ হাজার মে.টন
আখ	৪ লক্ষ ২ হাজার একর	৬৫ লক্ষ ২ হাজার মে.টন
তুলা	৫ হাজার একর	৫ হাজার মে.টন
তামাক	৭৫ হাজার একর	৩৮ হাজার মে.টন

পাট চাষীরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিচে পাট চাষাধীন জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হল।

পাট শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী এবং স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব

প্রকৃতপক্ষে, খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাট কলের উপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কতগুলো বাজার গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ৯টি পাটকলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ ও সেবাখাত সর্বোপরি, কৃষি পণ্য ও তার বাজার সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকরা মজুরী না পেলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে এবং অন্যান্য খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, শিল্প নগরী খুলনার প্রাণ খালিশপুর এখন নিরব-নিথর।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকুরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

	খাদ্য গ্রহণ (ক্যালরি)	কাজের নিশ্চয়তা	শিক্ষা	ক্রয় ক্ষমতা	স্বাস্থ্য	সামাজিক মর্যদা	সামাজিক সম্পর্ক	জীবন জীবিকার ঝুকি	গ্রামীণ শ্রম বাজারে চাপ	শহরের শ্রম বাজারে চাপ	অপরাধ প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	সঞ্চয় প্রবণতা
চাকুরিরত অবস্থা	১৭০০	৮০%	৯৫%	৮০%	৮০%	৮০%	৯০%	২০%	৬০%	৬২%	৫৫%	৭৫%	১০%
চাকুরিচ্যুত অবস্থা	১৪০০	৫০%	৫০%	৬০%	৪০%	৩০%	৩০%	৮০%	৮০%	৭৮%	৮০%	৫০%	০০%

কেস স্টাডি

শ্রমিকের নাম: কওসার বিশ্বাস (৪০)
পিতার নাম: ইব্রাহিম বিশ্বাস
নারায়নপুর, চৌগাছা, যশোর।

সে আলীম জুট মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে এ মিলে বদলি শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করে এবং তিন বছর পর স্থায়ী হয়। এখন সে চাকুরি হারা। এক ছেলে এবং দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের বাড়ী না থাকায় ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বর্তমানে পেশা পরিবর্তন করে দিন মজুর হিসাবে ১৭০-২০০ টাকা আয় করে। দিনমজুরের কাজও প্রতিদিন জোটে না। মিলের বকেয়া পাওনাও পায়নি। এ অবস্থায় অর্ধাহারে অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছে।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকুরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

মিল বন্ধের পর দেখা যায় খাদ্য গ্রহণ, কাজের নিশ্চয়তা, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। জীবন-জীবিকার ঝুঁকি, গ্রামীণ ও শহরে শ্রম বাজারে চাপ, অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।

পাটখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমহ্রাসমান

স্বাধীনতার পরে ৭৮টি জুটমিল পরিচালনার জন্য বিজেএমসি দায়ভার গ্রহণ করে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ এর মধ্যে ৪৪টি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং একটি একীভূত করা হয়। ফলে বিজেএমসির অধীন পাটকল দাঁড়াল ৩৮টি। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যংকের পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচীর ফলে ১১টি বন্ধ/বিক্রি ও একীভূত করা হয়। সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ এ। বর্তমানে চালু আছে ২২টি। অবশ্য বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত পাটকল এবং সহায়ক কারখানা ঢাকা অঞ্চলে ৬ টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০ টি, খুলনা অঞ্চলে ৯ টি।

রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রস্তাবিত দাবী, কর্মসূচি ও অভিঘাত: (জুলাই ২০১৪ তে উত্থাপিত দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচি এবং অভিঘাত)

দাবীসমূহ

১. বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কে হোল্ডিং কোম্পানীতে এবং এর অধীন মিলসগুলোকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।
২. সরকারিভাবে পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির ক্ষেত্রে ২০% ভূর্তকি প্রদান বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. বিজেএমসির আর্থিক দৈন্যতা দূর করার লক্ষ্যে পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণ আইন ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. পঞ্চাশ দশকে স্থাপিত মিলগুলোর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলগুলোকে বিএমআরই করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে।

৫. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর বিদ্যমান ১০% সাবসিডি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
৬. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর প্রাপ্য ডিউটি-ড্র ব্যাক বিজেএমসি কর্তৃক আদান সহজিকরণ করার জন্য ডেডো অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
৭. ১০০% রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির মিলসগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তক বিক্রিত মিলগুলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।
৯. সরকার কর্তৃক বেপজাকে হস্তান্তরিত আদমজী জুটমিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।
১০. শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(কর্মসূচি)	(অভিঘাত)
১. ০২/০৭/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০৫/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় গেট সভা করে ২ (দুই) ঘন্টা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ২. ০৬/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা রাজপথে ১ (এক) ঘন্টা মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। ৩. ০৭/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকার ১০.০০ ঘটিকা মিলের প্রধান কার্যালয় ২ (দুই) ঘন্টা ঘেরাও করা হবে। ৪. ০৮/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ১ (এক) ঘন্টা রাজপথ অবরোধ করা হবে। ৫. ০৯/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মিলের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে অনশন কর্মসূচী পালন করা হবে। ইত্যবসরে, ২৫/০৬/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০১/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মিলে দাবী আদায়ের স্বপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকবে এবং ২৬/০৬/২০১৪ ইং তারিখ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলোর ডিসি সাহেবকে স্মারক লিটি প্রদান করা হবে একই সাথে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মহোদয়কে ফ্যাক্স যোগে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

২৪ মার্চ ২০১৫ তে উত্থাপিত দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচি এবং অভিঘাতঃ

দাবীসমূহঃ

১।

(ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে, অবিলম্বে মিলগুলোকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজার দরে মান সম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে; পাট ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সবপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

(খ) পাট পণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট- ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাট পণ্য বহুধাকরণ করে; বিদেশী বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

(গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পাট শিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করে; ২০% বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলোকে বিএমআরই করতে হবে।

২।

(ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন বোর্ড গঠন করে একই দিন ও একই তারিখ হতে তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১লা জুলাই ২০১৩ তে ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা, যা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অবিলম্বে ঐ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এরিয়াসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পাট/কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরী কম দেয়া হচ্ছে যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ঐ সব শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) আলীম জুট মিলকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডসহ যে সব মিলে শ্রমিকদের চাকুরীর নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করে; ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর, জাতীয় জুট মিল ও কর্ণফুলি জুট মিল বিজেএমসি এর পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলগুলোর শ্রমিকদের বিজেএমসি এর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণসহ প্রাপ্যাদি প্রদান করতে হবে।

৩।

(ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিল সমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭০০০০০০(১৬১)০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি(বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩ যাহা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/(১৫)/১২৭, তারিখ-৭/২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) মিলের যে সকল শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরীতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয়/নিয়োগ করত; পূর্বের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিল প্রশাসনের নিকট ন্যাস্ত করতে হবে।

৪।

(ক) ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায় সংগত পাওনা পিএফ, গ্রাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যে সব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসাবে উত্তোলন করেছে/স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ঐ সকল টাকার লভ্যাংশ প্রদান করত; সমুদয় অর্থ স্ব স্ব ফান্ডে ফেরৎ দিতে হবে।

(গ) মজুরী কমিশন গেজেট ২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫।

(ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মারা গেলে মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্যমূলকভাবে প্রদান করা হয়। ফলে এ অনিয়ম দূর করে: সবাই প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টি.বি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

(খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করত; জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে বদলী শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

(গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি এবং এর অধিনস্ত মিলগুলোর সম্পদ ও পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

(কর্মসূচি)	(অভিঘাত)
১. ০৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় দাবী নামার স্বপক্ষে সকল রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলে একযোগে গেট সভা করা হবে। ২. ০৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলির জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। ৩. ০৮/০৪/২০১৫ ইং বুধবার শিফটে শিফটে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৪. ১০/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সব শিল্প এলাকায় পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করা হবে। ৫. ১২/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকর ১১ টা প্রত্যেক মিলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করত: বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে্ ৬. ১৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকার ১০.০০ থেকে ১১.০০ টা এক ঘন্টা রাজপথে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। ৭. ১৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সব শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ৮. ১৯/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকাল ১১ টা এক ঘন্টা রাজপথে বুকে লাল ব্যাজ ধারন করে: বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৯. ২১/০৪/২০১৫ ও ২২/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গল ও বুধবার শিফটে শিফটে মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ১০. ২৪/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বৃহৎ শিল্প এলাকায় জনসভার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্থ। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

সম্প্রতি পাটশিল্প শ্রমিকদের প্রস্তাবিত দাবীসমূহ এবং কর্মসূচি

দাবীসমূহ

১.

ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে, অবিলম্বে মিলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজার দরে মানসম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে; পাট ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সবপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

খ) পাট পণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট-২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাট পণ্য বহুধাকরণ করে; বিদেশী বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী

পাটশিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করে; ২০% বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলোকে বিএমআরই করতে হবে।

২.

ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন বোর্ড গঠন করে; একই দিন ও একই তারিখ থেকে তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ১ জুলাই ২০১৩ তে ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা, যাহা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অবিলম্বে ঐ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এরিয়ারসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) পাট/কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন যাবত উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরী কম দেয়া হচ্ছে যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ঐ সকল শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজেজ প্রদান করতে হবে।

ঘ) আলীম জুট মিলকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিমিটেডসহ যে সব মিলে শ্রমিকদের চাকুরীর নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করে; ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর,জাতীয় জুট মিল ও কর্ণফুলি জুট মিল বিজেএমসি এর পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলগুলির শ্রমিকদের বিজেএমসি এর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্থায়িকরণসহ প্রাপ্যদি প্রদান করতে হবে।

৩.

ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিলসমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭০০০০০০(১৬১)০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি (বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩ যাহা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/৭৩(১৫)/১২৭, তারিখ-০৭/০২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) মিলের যে সব শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরীতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয়/নিয়োগ করে; আগের মতো ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিল প্রশসনের নিকট ন্যাস্ত করতে হবে।

৪.

ক) ১ জুলাই ২০০৯ থেকে চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত পাওনা পিএফ, গ্রাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

খ) যে সব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসাবে উত্তোলন করেছে/স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ঐ সব টাকার লভ্যাংশ প্রদান করত; সমুদয় অর্থ স্ব স্ব ফান্ডে ফেরৎ দিতে হবে।

গ) মজুরী কমিশন গেজেট২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.

ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মারা গেলে মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্য আকারে প্রদান করা হয়। ফলে, এ অনিয়ম দুর করে; সবাইকে প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টি.বি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে বদলী শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেয়া এবং সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজিএমসি এবং এর অধিনস্ত মিলগুলোর সম্পদ ও পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

কর্মসূচি:

জুট মিলগুলোর এ অবস্থার কারণ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়ন না হওয়া।
- আন্তর্জাতিক বাজারে পেমেন্ট সিস্টেমের জটিলতা (বিশেষ করে আফ্রিকার দেশে)।
- নাইজেরিয়া, মালি, ঘানাসহ কিছু দেশে চাহিদা থাকলেও মূল্য (টাকা) পাওয়ার ঝুঁকির সম্ভবনা থাকায় রপ্তানী না করা।
- কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় আস্থার সংকট।

কর্মসূচিঃ

তারিখ	কর্মসূচি
২৮/০৩/২০১৬, সোমবার	সকাল ১০টায় রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলে গেট সভা
৩০/০৩/২০১৬, বুধবার	লাঠি মিছিল
০৩/০৪/২০১৬, রবিবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকায় স্কুলের ছাত্র/ ছাত্রীদের সমন্বয়ে মিছিল।
০৪/০৪২০১৬, সোমবার	বিকাল ৪ টায় সকল শিল্প এলাকায় পেশাজীবিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
০৫/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব মিলের প্রধান কার্যালয়ে ঘেরাও।
০৬/০৪/২০১৬, বুধবার,	স্ব স্ব মিলে শিফটে শিফটে মিছিল।
০৮/০৪/২০১৬, শুক্রবার	বিকাল ৪.০০ টায় রাজঘাট শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
১০/০৪/২০১৬, রবিবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকার রাজপথে খোরা মিছিল ।
১২/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্ব স্ব মিল গেটে নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে অনশন
১৮/০৪/২০১৬, সোমবার এবং পরের দিন ১৯/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজপথ, রেলপথ অবরোধের সমর্থনে লাঠি সহকারে বিক্ষোভ।
১৯/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজপথ, রেলপথ অবরোধ
২৫/০৪/২০১৬, সোমবার	সকাল ১০টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকায় কফিন মিছিল
২৬/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘন্টা মিল ধর্মঘট।
২৯/০৪/২০১৬, শুক্রবার	আটরা শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
০১/০৫/২০১৬, রবিবার	খালিশপুর শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
০৩০৫/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০টায় লাল পতাকা সহকারে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি পেশ।
০৪/০৫/২০১৬, বুধবার	খুলনাস্থ সকল শিল্প অঞ্চলে সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল।
০৮/০৫/২০১৬, রবিবার	সকাল ৬টা থেকে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত স্ব স্ব শিল্প এলাকায় রাজপথ ও রেলপথ অবরোধ।
১০/০৫/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০টা থেকে খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে ৭২ ঘন্টা অনশন।

- অত্যান্ত নিম্নমানের পাট ক্রয়।
- সঠিক সময়ে পাট ক্রয়ের টাকা ছাড় না হওয়া।
- প্রায় অনুপোযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের চেষ্টা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- সমন্বিত কৃষি ও শিল্প নীতির অভাব।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহের অভাব।
- শক্তি সম্পদের অভাব।

- উৎপাদন ব্যায় বৃদ্ধি।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান।
- বাজার সংকুচিত।
- পাট পণ্যের বিকল্প পণ্যের ব্যবহার।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব।
- লুটপাট ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি।

সৃষ্ট সমস্যা

- রাজস্ব আয় কমেছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব।
- জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বেড়েছে।
- শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে।
- ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা।
- কর্মের নিশ্চয়তা কমেছে।
- সঞ্চয় প্রবণতা কম।
- ভোগ প্রবণতা কম।
- বেকারত্ব বেড়েছে।
- শিক্ষার হার কমেছে।
- পুষ্টিহীনতা।
- কাপড়ের ব্যবহার কমেছে।
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি।
- অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।
- পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে।

সম্ভাবনা

- আন্তর্জাতিক বাজারে পাট পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি)
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়েছে।
- সরকারি খাদ্য গুদামগুলোতে ধান/চাল সংরক্ষণের জন্য পাটের বস্তার ব্যবহার বেড়েছে (উল্লেখ্য, গত বছর খাদ্য গুদামগুলো বিজেএমসি থেকে সোয়া ৩ কোটি পাটের বস্তা কিনেছে)।
- হেসিয়ান ক্লথ যা সম্প্রতি কনস্ট্রাকশন কাজে নিরাপত্তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি "সয়েল সেভার" মাটি ক্ষয় রোধের চটের ব্যবহার বেড়েছে (সওজ এবং এলজিইডিতে)।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী ভাঙ্গন রোধে সয়েল সেভার হিসেবে চটের ব্যবহার।
- পাট শিল্প এখন বস্তা, চট, দড়ি থেকে বেরিয়ে আকর্ষণীয় কার্পেট কারুকার্য সমৃদ্ধ জুট ম্যাট বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে।
- নতুন নতুন বাজার সম্প্রাসারিত হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

- পাট ও পাটকলে দক্ষ, যোগ্যতা সম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে বিজেএমসি ও মিল পরিচালনা করা।
- পাট মৌসুমে অর্থ ছাড় দেয়া এবং বাজার মূল্যে মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, সাথে সাথে পাট ক্রয়ে ও বিক্রয়ে দূর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা।
- ৫০ দশকের মেশিনগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে অবিলম্বে অন্তত প্রতিটি মিলে মিল সাইড বিএমআরই করা।
- ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট-২০১০ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা।
- প্রণীত শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী পাটকলকে কৃষিভিত্তিক শিল্প ঘোষণা করেঃ ২০% ভর্তুকী প্রদান।
- বিজেএমসি ও এর অধীনস্থ মিলসমূহের সম্পদ-পরিসম্পদ বিজেএমসিকে ফেরৎ ও ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পদের পূনর্মূল্যায়ন করা।
- সর্বোপরি অর্থায়নের পর মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাট শিল্পকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সময়োপযোগী পাট ও পাট শিল্প নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ-এর দূর্নীতি রোধ।
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো।
- সঠিক সময়ে ভাল মানের উপকরণ সরবরাহ।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান
- শক্তি সম্পদ বিশেষ করে বিদ্যুতের নিশ্চয়তা বিধান
- বেসরকারি চাতাল মালিকদের পাটের বস্তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে (এতে প্রতি বছর ৫০ কোটি বস্তা যোগানের প্রয়োজন হবে)।

উপসংহার

বিগত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা পাট শিল্প স্বাধীনতাত্তোর জাতীয়করণ করা হয়। প্রত্যাশা ছিল, এ শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে বিকশিত করবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান কম নয়। ১৯১৩-১৪ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভূক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিকটন ও রপ্তানী আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ও আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিগত প্রায় দেড়যুগ এ শিল্প কতগুলো সংকটের আবর্তে নিপাতিত। ফলে লেগে আছে শ্রমিক অসন্তোষ আর আন্দোলন। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা, ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় অর্থনীতি। এ সবই আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ১৯৭২ এর মূল সংবিধান সর্বোপরি, স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিহীন, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। এ অবস্থার অবসান

জরুরি। প্রশ্ন হলো, করবে কে? রাষ্ট্র না জনগণ? উত্তর রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। জনগণকে উদ্যোগী হতে হবে। রাষ্ট্র শুধু পাট শিল্প নয় সমস্ত শিল্প পরিকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে। যে আকাঙ্খায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। যে প্রত্যাশায় স্বাধীনতাত্তোর এ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার জন্য চাই পুনঃভাবনা, পুনঃসংগ্রাম।

তথ্য সূত্র

১. আবুল বারকাত, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছত বাংলাদেশ?

২. সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫।

৩. মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার, বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

৪. Nirmal Chandra Bhakta, Md. Mostafizur Rahman Sardar, Hasan Tareq Khan, Amitabh Chakroborty, JUTE INDUSTRY: GLOBAL SCENARIO & FUTURE PROSRECT FOR BANGLADESH.

5. Khalad Rab, Golden handshake to Golden fibre.

6. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পাট শিল্পের বর্তমান সংকট আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৫।

৮. মাহফুজ চৌধুরী, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষণ।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক- ২১.০২.০৭

১০. দৈনিক পূর্বাঞ্চল- ২২.০৩.০৭

১১. দৈনিক পূর্বাঞ্চল- ১৭.০৪.০৭ এবং ১৮.০৪.০৭

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ- ১৯.০৪.০৭

১৩. বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

১৪. দৈনিক যুগান্তর- ২৬.০৪.১৪

১৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১৮.০৪.১৫

১৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪

১৭. পাট সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।

১৮. পাটকল সংগ্রাম পরিষদ।

১৯. জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ।

২০. বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলস্ সিবিএ-নন সিবিএ ঐক্য পরিষদ।

২১. কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ।

২২. আইআরভি খুলনা।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 223-234
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১: শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*

সারকথা: *বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতিকে উপহার দিলেন 'ভিশন-২০২১'। ভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি বা দেখা। আর ভিশন -২০২১ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে একটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দিনবদলের পালা। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। মধ্যম আয়ের দেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায়। আর সেলক্ষ্যে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে US$ ২০০০ এবং প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ। রূপকল্প ২০৪১ এর মুখবন্ধে বলা আছে-'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ কে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। এ মানব পুঁজির যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তি দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চারিত হয়ে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়া যাবে।*

ভূমিকা

বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত- বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে। বঙ্গবন্ধু হলেন বিশ্বাস, ধ্যান ও জ্ঞানে মুক্তিকামী জনতার মূল-মন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতিকে উপহার দিলেন 'ভিশন-২০২১'। ভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি বা দেখা। আর ভিশন -২০২১ বলতে

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা

এখানে বুঝানো হয়েছে একটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দিনবদলের পালা। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। মধ্যম আয়ের দেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আর সেই লক্ষ্যে এই ভিশন বা রূপকল্পের ধারণা এসেছিলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে। বিতর্কিত ওয়ান-ইলেভেনের সময় জেলখানায় বন্দী অবস্থায় তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলাদেশকে নিয়ে। (১৩ জুলাই ২০১৫, দৈনিক ইত্তেফাক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী)। তিনি বলেন,"কারাগারে থেকেও আমি সময় নষ্ট করিনি। বাংলাদেশকে নিয়ে ভেবেছি। প্রতিদিন লেখালেখি করতাম। সঙ্গে করে একটি খাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে তা লেখায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর আরো একটি খাতা আনিয়ে নিয়েছিলাম। আমার লেখার বিষয়বস্তু ছিলো ভবিষ্যত বাংলাদেশকে নিয়ে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শিক্ষার হার কত হবে? খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আমাদের কি করণীয়? মৌলিক চাহিদা পূরণে আমাদের সরকার কি করতে পারে? ইত্যাদি।"

মধ্যম আয়ের দেশের পথরেখা

বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি', বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায়। আর সেলক্ষ্যে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে US$ ২০০০ এবং প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে সরকার। আর এ লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের এ মূল্যায়ন সরকারের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে মধ্যম আয়ের দেশের সংজ্ঞা

মধ্যম আয়ের দেশ - এই শ্রেণিকরণটি মূলত বিশ্বব্যাংকের। কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করতেই তারা দেশগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে। মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনআই) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের বিভাজন:

নিম্ন আয়ের দেশ – কমপক্ষে US$ ১০৪৫
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ- US$১০৪৬ থেকে US$৪১২৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ- US$৪১২৬ থেকে US$১২৭৪৫
উচ্চ আয়ের দেশ - US$১২৭৪৬ ডলারের বেশি।

প্রতিবছরের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক এই শ্রেণিকরণের তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংকের এই শ্রেণিকরণের আলোকে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। কারণ বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় US$ ১৪৬৬।

অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ রূপকল্প -২০২১

প্রথাগত সংস্কার এবং সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প নিয়ে বর্তমান সরকার এগুতে চায়। আগামী ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আর ২০২০ সাল হবে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। তারও আগে ২০১৫ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন

লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের সময়সীমা। আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে (মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ, বাজেট ২০০৯-২০১০)।

আমাদের রূপকল্প অর্জনের অভিযাত্রায় আমরা সামষ্টিক পর্যায়ে ২০২১ সাল নাগাদ যে মাইলফলকগুলো অর্জন করতে বদ্ধপরিকর তা হলো জাতীয় প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ধরে রাখা, জাতীয় আয়ে শিল্পের বর্তমান ২৮ শতাংশ হিস্যাকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা, গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোটায় উন্নীত করা, মাতৃ মৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫-তে কমিয়ে আনা। আমাদের লক্ষ্য হল বেকারত্বের হারকে ১৫ শতাংশে নামানো এবং দুর্ভাগা মানুষ যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকবে তাঁদের হারকে ১৫ শতাংশে অবনমিত করা।

রূপকল্প ২০৪১

রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য তৈরি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেন। রূপকল্প ২০৪১ এর শ্লোগান-শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০৪১ এর মুখবন্ধে বলা আছে-'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব'। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। রূপকল্প ২০৪১ এ ২৬টি লক্ষ্যের কথা বলা আছে। ইশতেহারের লক্ষ্য ও ঘোষণা অংশে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ, উচ্চপ্রবৃদ্ধির পথ নির্মাণ

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণমেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারো পূর্ণ মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের এ রায় সরকারের ওপর তাদের বিপুল আস্থারই এক অনন্য নজির। ২য় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে সরকার জনগণের স্বপ্নের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ এবং মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে সামিল হওয়া সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন

আনন্দের বিষয় হল, এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য হার ও এর ব্যবধান হ্রাস, অপুষ্ট শিশুদের আধিক্য কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এইচআইভি, যক্ষ্মাসহ বিভন্ন রোগ-ব্যাধি দমন ইত্যাদি পুরোপুরিই বর্তমান সরকারের অর্জন। অন্য দিকে, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুহার হ্রাস, টিকা দান কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি ও সংক্রামক ব্যাধি হ্রাসের ক্ষেত্রে হয়েছে লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) পদার্পণ

এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর (২০১৬) মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদন করেছে, যাতে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (goals) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (targets) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলই প্রথম ১১টি অভিষ্ট লক্ষ্যের ধারণা দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখান থেকেই ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উদ্ভব হয়। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজির এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সামাজিক খাত তথা সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা ও এমন এক প্রাণের নেতা যাঁর ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। এই দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহিদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন, যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকার রাষ্ট্রের তালিকায় শামিল হবে- সেই সব অপবাদ দূর করে আমাদের প্রিয় দেশটি এসমস্ত মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে স্ফিনিকস পাখির মত উঠে এসেছে। যারা সে সময়ে হতাশা ছড়িয়েছিলেন, তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বে নানা কোণ থেকে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ সামাজিক সূচকসমূহে হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন।
- ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। এর সুফল হলো শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হারে ব্যাপক হ্রাস এবং শিশু জন্মে প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা নার্সের উপস্থিতি।
- বর্তমানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে যথাক্রমে ১.৭ ও ৩৩ জনে নেমে এসেছে।
- গড় আয়ু ৭০.৭ বছর।
- দারিদ্র্য হার কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে।
- অতিদরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ১২.০৪ শতাংশে।
- বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক গতিশীলতা।
- এপ্রিল, ২০১৬-এর শেষে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ২০ লক্ষ ও ৬ কোটি ২০ লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ কে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার

পর্যায়ক্রমে এসকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ও জাতীয় সংসদে পাসকৃত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পূর্ণাঙ্গ বাস্তাবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল দর্শন

এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্ব দানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিক্যুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখস্থশিক্ষা তথা সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। আর সেলক্ষ্যে সকল শিক্ষকদের সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের অংশ হিসেবে প্রথমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ২০১৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। এই মাস্টার ট্রেইনারগণ দেশব্যাপী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ৭০০০০ শিক্ষককে সরাসরি শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। বিশ্বের কোন দেশে এত বই বিনামূল্যে বিতরণের কোন রেকর্ড নেই।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তিপ্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১ হাজার কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। এই ১ হাজার কোটি টাকার সীড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা হতে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।

- ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্বে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পীকার, ইন্টারনেট, মোডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২ টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডাইনামিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ইবুক ভার্সন উন্নয়ন করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসেবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রেণি পাঠদান সপ্তাহে তিন দিন সকাল ০৯:১০ মিনিট থেকে ১০:০০ পর্যন্ত বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

আমাদের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। জনমিতিক লভ্যাংশের এই সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এ লক্ষ্যে সরকার-

- ১০০টি উপজেলায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করবে।
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪ বিভাগীয় শহরে ৪ টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সকল বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করবে সরকার।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভগীয় পর্যায়ে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযৌগিতার মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

জেন্ডার সমতা

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে এখন রোল মডেল। শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অনুপাত ৫৩:৪৭। অর্থাৎ ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ৪৭ জন এবং ছেলে শিক্ষার্থী ৫৩ জন।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

- প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ হাজার ১৯৩ টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ।
- ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৭৬ শিক্ষককে আত্মীকরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।
- শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মান সম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ

- সরকারের উদ্ভাবিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবহার।
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ।
- উপবৃত্তি প্রদান- ৬ষ্ট শ্রেণি হতে স্নাতক পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছাত্রী।
- ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ

১৫-৪৫ বছর বয়সে নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে একটি সেক্টর কর্মসূচীপ্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সরকার অটিস্টিক একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন

তথাকথিত শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইভটিজিং প্রতিরোধ

ইভটিজিং বা ছাত্রীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে সর্বস্তরের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সারা দেশে র‌্যালী, কর্মশালা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইভটিজিং উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি মাধমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদ ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের পদ ১৩৮টি পদ, সহযোগী অধ্যাপকের পদ ২৪৪টি, সহকারী অধ্যাপকের পদ ৪২৪টি এবং প্রভাষকের পদ ৬৫৮টি এবং অন্যান্য ১৮৬টি পদসহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় জিডিপির মাত্র ২ শতাংশেরও কম। এটাই আমাদের শিক্ষাখাতে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাখাতে ডাবল-ডিজিট ব্যয় করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকএখনও অসৃজনশীল

আমরা সবেমাত্র ২০১০ সালে সনাতন মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছি। সর্বপ্রথম শিক্ষককে সৃজনশীল হতে হবে, তারপর হতে হবে বাবা-মাকে। তাহলেই আমাদের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও সৃজনশীল, মননশীল ও ইতিবাচক হবে।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখননও কুসংস্কারমুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে না বুঝে মুখস্থ করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য মনকে বিকশিত করা তথা দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করা । এ লক্ষ্যে এখনও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে শিক্ষককে হতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ শিক্ষক। তাকে হতে হবে রোলমডেল ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা

শিক্ষক হবে সমাজের ও দেশের রোলমডেল অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে মর্যাদা দিতে হবে। আর্থিক প্রণোদনাসহ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে এখন পর্যন্ত আমরা সামাজিকভাবে মর্যাদা দিতে পারিনি। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রণোদনা ও গবেষণা

শিক্ষকের কাজ জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ। এজন্য তার নেশা ও পেশা হবে শিক্ষাদান ও গবেষণা। তিনি সারাজীবন ধরে শিখবেন, শিখাবেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারিনি।

স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ

সরকার শিক্ষাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করে থাকেন। একটি দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার উদ্যোগ। তবে, এক্ষেত্রে সরকার নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলে ভালো হয়। তা না হলে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের সাথে নতুন যারা আত্মীকৃত হন তাদের সাথে সমস্যা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারিকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষায় মেধাবীকে আকৃষ্ট করতে হলে প্রত্যেকের স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেক্ষেত্রে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ:

- আনন্দের সাথে শিক্ষাদানের অভাব;
- সনাতন মূল্যায়ন পদ্ধতি;
- সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি;
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ঝরেপড়া সমস্যা;
- আলাদা বেতন-কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার অভাব;
- মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশনী প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ;
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের অভাব;
- শিক্ষক-কেন্দ্রিক সনাতন পাঠদান এখনো অব্যাহত;
- দলীয় অংশগ্রহণ, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন, তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদি কাজের অনুপস্থিতি;

- ক্লাসে দলীয় কাজের অভাবে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হচ্ছে না;
- কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি;
- সুপারভিশন, মনিটরিং, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব;
- শিক্ষার তিনটি ধারা এখনও অব্যাহত;
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় জেন্ডার অসমতা;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আশানুরূপ নয়;
- শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধি;
- শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণার অভাব;
- অবকাঠামোর অভাব;
- সাধারণ শিক্ষার আধিক্য বেশি;
- কারিগরি শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সুপারিশসমূহ

- আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ হতে হবে ডাবল ডিজিট তথা অন্ততপক্ষে ১০ থেকে ১২ শতাংশ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবককে সৃজনশীল হতে হবে। রূপকল্প ২০২১ এ উল্লেখ আছে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবনশীল ও সৃজনশীল বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হবে।
- দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন তথা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাড়াতে হবে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মুল্যবোধে উজ্জীবিত করে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে।
- দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী শিক্ষকের নিয়োগ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের মডেল অনুসরণ করতে হবে। সিঙ্গাপুর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সিঙ্গাপুর প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারা পৃথিবীতে রোলমডেল। পৃথিবী বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী গ্রাজুয়েট এনে সিঙ্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে।
- প্রণোদনা ও গবেষণা বাড়াতে হবে শিক্ষাখাতে। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনে সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল, সাহসী, উদ্ভাবনশীল ও রোলমডেল ব্যক্তিত্বকে নিয়োগ দিতে হবে।
- নতুন স্কুল-কলেজ সরাসরিভাবে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে প্রয়োজনে শিক্ষাকে সবার মাঝে কমমূল্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জাতীয়করণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য আলাদা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নে ব্যাপক বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার জরুরি। বছরে একটি পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন -এটি কখনো বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। উন্নত দেশগুলোতে ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষক সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করে। একে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলে।
- শ্রেণিকক্ষে দলীয় অংশগ্রহণ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ, ক্লাসে ব্যক্তিগত উপস্থাপনা, দলীয় উপস্থাপনা, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন, তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা গেলে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রতি

ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত করা যাবে। এর ফলে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছি- ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সহজ হবে।

উপসংহার

শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। এ মানব পুঁজির যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চার করে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০

২. রূপকল্প - ২০২১

৩. রূপকল্প- ২০৪১

৪. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০১০-২০২১

৫. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১১-২০১৫

৬. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৬-২০২০

৭. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সকল বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-১৭)

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০১৫, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা।

১০. রহমান, আতিউর। "বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তি", সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০১৬।

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_2021

12. http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/02/06/17446

13. http://archive.dhakatribune.com/politics/2013/dec/28/vision-2021-extended-2041

14. http://www.newstoday.com.bd/?option=details&news_id=2369338&date=2014-02-06

15. http://www.thedailystar.net/problems-with-our-education-sector-23954

16. http://rih.stanford.edu/rosenfield/resources/Primary%20Education%20in%20Bangladesh.pdf

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 235-264
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা
(ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারকথা: *বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি উৎপাদন মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর বেশী নির্ভরশীল; এগুলো হলো: মাটি, তাপমাত্রা/আলো এবং পানি। মাটি এবং তাপমাত্রা/আলোর উপর মানুষের হস্তক্ষেপ পানির তুলনায় কম। পানি ব্যবস্থাপনার উপর ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় এবং কৃষক আর কৃষি অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি মৌলিকভাবে নির্ভরশীল। সমগ্র বাংলাদেশ তো বটেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সম্পদের অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং নদী/খালের তলদেশ ভরাটজনিত সংকট। কৃষক এবং কৃষি পড়েছে হুমকির মুখে। এটি সত্যিকার অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা, ১৯৭২ এর সংবিধান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিকতার সাথে সঙ্গতিহীন। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি এবং পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভবদহের জলাবদ্ধতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ প্রবন্ধে কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি, উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। তাই, সঠিক নীতির প্রয়োগ আর যৌক্তিক বাস্তবায়নের মাধমে, এ দেশের মৌলিক কাঠামোগত ইতিবাচক এবং সুষম উন্নয়ন একমাত্র কৃষির মাধ্যমেই সম্ভব। এ ভূখণ্ডে কৃষি এবং সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর কৃষি এখনো পরিপূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়নি। এ দেশে কৃষির উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বেশী এবং সঙ্গতিহীন। কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যয় কাঠামো পানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষিতে পরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা এখনও সত্যিকার অর্থে গড়ে ওঠেনি। প্রকৃতি-নির্ভরশীলতা এক্ষেত্রে মূলকথা। কৃষিতে যদি পরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা সম্ভব হতো তাহলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাষযোগ্য ভূখণ্ডের পরিমাণ বাড়তো, শস্য নিবিড়তা এবং উৎপাদিত

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা।

শস্যের পরিমাণ ইতিবাচক হতো। উৎপাদন ব্যয় কমতো, শক্তি সম্পদের অপচয় রোধ এবং জ্বালানী সাশ্রয় হতো। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমতো, মান বাড়তো। কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হতে পারত। পানি ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি এ অঞ্চলের কৃষি এবং কৃষকের বঞ্চনা মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা, সংবিধান এবং গণমানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে অপ্রত্যাশিত, নীতিশাস্ত্রের (Ethics) সাথে সঙ্গতিহীন। মূলত এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. কৃষি উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনা এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)

এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কৃষি জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার হবে, উৎপাদনের উপকরণ, কলাকৌশল, প্রযুক্তি সহজ লভ্য হবে, পণ্য মূল্য জীবনমান উন্নয়নের সহায়ক হবে, কৃষির উন্নয়নের সাথে প্রজন্মের সামগ্রিক বিকাশের ধারা অব্যহত থাকবে এবং শক্তিশালী হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রণীত মূল সংবিধানের (১৯৭২) চার মূলনীতির মর্মবাণীও কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়নের নিরিখে প্রণীত। বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন বা মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায় ও সব মানুষের কল্যাণের দিকটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কৃষি জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার, কৃষিতে কৃষকের পরিপূর্ণ অধিকার, উৎপাদনের উপকরণে নিজের পরিপূর্ণ অধিকার, সঠিক পণ্যমূল্য প্রাপ্তির অধিকার, কৃষির উপর নির্ভর করে প্রজন্মের উন্নয়ন এবং বিকাশ সাধনের নিশ্চয়তা জরুরি। মাটি, পানির ব্যবহার কৃষি অর্থনীতির মৌলিক বিষয়। কৃষি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত এবং পানি সম্পদের প্রধান ব্যবহারকারী। মূলত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানি সম্পর্কিত তিনটি বিষয় বিবেচ্য।

২.১. পরিমিত পানি: জলাবদ্ধতা এবং পানি স্বল্পতা বা শুষ্কতা উভয়ই কৃষি উৎপাদনের অন্তরায়। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির পরিকাঠামোতে এ সংকটটি বিদ্যমান।

২.২. উপযোগী পানি: কৃষি উৎপাদনের জন্য দরকার কৃষি উৎপাদন উপযোগী, গুণমান সম্পন্ন পানি। লবণাক্ততা এবং বেশী আয়রন সমৃদ্ধ পানি স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

২.৩. সুষম পানি সরবরাহ: কৃষিতে সঠিক সময়ে চাষ এবং অধিক উৎপাদনের জন্য পানি সরবরাহ চ্যানেল বা ক্যানেল এবং এর সুষম ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি। এটি কৃষি, কৃষক এবং দেশের সঠিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও বাংলাদেশের কৃষিতে পানি সম্পর্কিত মৌলিক তিনটি দিক অর্থাৎ পরিমিত পানি, উপযোগী পানি এবং সুষম পানি সরবরাহ প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠেনি। এ কারণে বাংলাদেশের কৃষক বছরের পর বছর জলাবদ্ধতা এবং খরার কারণে জমিচাষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হচ্ছে; লবণাক্ততা এবং আয়রনযুক্ত পানির কারণে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। সুষম পানি ব্যবস্থাপনা সংকটের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। সর্বোপরি, কৃষিতে পানি সম্পর্কিত এ তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে কৃষি, কৃষক এবং কৃষি অর্থনীতিতে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, দূর্বৃত্তায়ন, কালো টাকার দৌরাত্ম, রেন্ট সিকারদের দৌরাত্ম, লুটপাট, শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্যের অপসংস্কৃতি যা চূড়ান্ত বিচারে বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের পবিত্র মৌলিক সংবিধান (১৯৭২) এবং মৌলমানবিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক যা কাম্য নয়।

৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলটা খুলনা বিভাগ কেন্দ্রিক। বলা যায় পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০টি জেলা আর ঐতিহ্যবাহী চির সবুজ ঐশ্বর্য, অনুপম সৌন্দর্য-মণ্ডিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশ নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ত, বাকী অধিকাংশ সমভূমি। কৃষি শস্যের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদিত হয়। এছাড়া, এ অঞ্চল রবি শস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র।

৩.১. ভৌগলিক অবস্থান

খুলনা বিভাগ এর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা রয়েছে। এটি নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি, ভৈরব ও কপোতাক্ষ। এছাড়াও অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান ২১$^{\circ}$৪০ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৪$^{\circ}$১২ উত্তর অংশে এবং৮৮$^{\circ}$৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৮৯$^{\circ}$৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমায়।

৩.২. মানচিত্র

৩.৩. জেলা উপজেলা, নদ-নদী ও জনসংখ্যা

জেলা	উপজেলা	নদ- নদী	জনসংখ্যা (২০১১আ: শু:)
চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর, আলমডাংগা, দামুরহুদা, জীবননগর	পদ্মা, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, মধুমতি, বলেশ্বর, কুমার,	১১,২৯,১১৫
মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর।	কাজলা, হরিণঘাটা, ইছামতি,	৬,৫৫,৩৯২
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খুকসা, মিরপুর, ভেড়ামার, দৌলতপুর	নবগঙ্গা, চিত্রা, কালিন্দি, কপোতাক্ষ, হাড়িয়াভাঙ্গা,	১৯,৬৪,৮৩৮
ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিনাকুন্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর।	রায়মঙ্গল, শিপসা, ভদ্রা, খোলপেটুয়া, রূপসা, ভৈরব,	১৭,৭১,৩০৪
মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর।	দড়াটানা, বাদুরগাছা, দেলুটি, সোনাই, মানকি, কাটাখাল,	৯,১৮,৪১৯
নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহগাড়া কালিয়া	বেগবতি, বেতনা, বুড়িভৈরব,	৭,২১,৬৬৮
যশোর	যশোর সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, শার্শা, চৌগাছা।	আঠারোবেকি, আত্রাই, ফটকি, পশুর, মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী, গ্যাংরাইল ইত্যাদি	২৭,৬৪,৫৪৭
বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট , মোল্লারহাট, চিতলমারী, কচুয়া, মোড়লগঞ্জ, শরণখোলা, রামপাল, মোংলা।		১৪,৭৬,০৯০
সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, তালা, আশাশুনি, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর।		১৯,৮৫,৯৫৯
খুলনা	রূপসা, তেরখাদা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা,		২৩,১৮,৫২৭

৪. কৃষি উৎপাদনের সাথে পানি ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

মূলত কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি, জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি যেমন জমি অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার মূল কারণ অন্য দিকে পানির অপ্রতুলতা মাটির শুস্কতাকে বৃদ্ধি করে, ফসল ধ্বংস হয়, পতিত জমির আধিক্য এর মৌলিক কারণ। এক পরিসংখ্যান দেখা যায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ বিলগুলোতে ৪০% জমি বেশি নিচু। ফলে, জলাবদ্ধতার জন্য সঠিকভাবে চাষাবাদ করা যায় না। আবার ঐ একই বিলের উচু ৩০% জমিতে পানিস্বল্পতার জন্য আশানুরূপ ফসল হয় না। বাকী ৩০% মোটামুটি সুষম পানি ব্যবস্থাপনার অধীন। এ অবস্থায় সুষম পানি ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সম্পূর্ণ জমি সঠিক চাষ উপযোগী করাসহ ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি সম্ভব।

পানি ব্যবস্থাপনার ধরন	বয়সভিত্তিক ফসল উৎপাদন (দিন)	ফসল নিবিড়তা	জমি ব্যবহারের হার
অপরিকল্পিত	২১০	১	৫৮%
আধা পরিকল্পনা/বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ	১৫০ + ১৮০	২	৯০%
পরিকল্পিত	৬৫ + ১২০ + ১৫০	৩	৯২%

৫. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) জমির কাঠামোগত বিন্যাস।

৫.১. জমির পরিমাণ (হেক্টর)

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) মোট আবাদযোগ্য জমি	১৫১১৮০	১৪৯২৫৪	২২৯৬০৭	৭৮৩৬৬	৬০৮৪০৭
খ) আবাদী জমি (বর্তমান আবাদে আছে এমন জমি)	১৩৪১৮৮	১৪০৫৯৬	১৮৮৬২৬	৭৬৬০৬	৫৪০০১৬
গ) অনাবাদী জমি	২৪৯৭৬০	২৪৭৫৫৮	১৯৩১০৩	২০৯৪৫	৭১১৩৬৬
ঘ) স্থায়ী পতিত (আবাদযোগ্য কিন্তু আবাদে যায়নি)	২৫৭৫৭	১৫৫৬	৪০৯৮১	১০০৫	৬৯২৯৯
ঙ) জলাশয় (সাং বাৎসরিকভাবে পানির নিচে থাকে)	২২২৬৮	৪৮৩২	৩১৩৪	৩৪২২	৩৩৬৫৬
চ) স্থায়ী ফলবাগান	৯৩১৯	১৬২৫৭	৩২৩৮	২৭৩৯	৩১৫৫৩
ছ) স্থায়ী বনভূমি/বনাঞ্চল	১৬১৩৬৩	১৮৬৮৯১	১৩২২৬৫	২১০৪	৪৮২৬২৩
জ) শহর অঞ্চল	৪২০২	২৫৯৮	৬৩৩	৭৬৬	৮১৯৯
ঝ) বাড়ীঘর (গ্রামের)	২৩৪৩৩	২৪০১৪	৯২৭০	৮০৩০	৬৪৭৪৭
ঞ) রাস্তা অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা	৩৪১৮	১২৫৯৮	৩৫৮২	২৮৭৯	২২৪৭৭
মোট (খ+গ)	৩৭৫১৮৩	৩৮৯৪৪৫	৩৮১৭২৯	৯৯৩১১	১২৪৫৬৬৮

৫.২. কৃষক পরিবারের সংখ্যা

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৩১০৪৭৪	২৪৪৯৭০	৩৮৫১৭৪	১৪১৪৬০	১০৮২০৭৮
খ) ভূমিহীন চাষী	৫৫৮৮৫	৩২৯৪৪	৬৭২৮৭	১১৬৭২	১৬৭৭৮৮
গ) প্রান্তিক চাষী	৯৬২৪৭	৭৪৯৯২	১৪৫৯০৫	৫২৬২৩	৩৬৯৭৬৭
ঘ) ক্ষুদ্র চাষী	৯৩১৪২	৮৫৬১৬	১১২৮৮৮	৫৬৬৫১	৩৪৮২৯৭
ঙ) মাঝারী চাষী	৫২৭৮১	৪১৫৬৭	৪৪৭৮১	১৬৯২৭	১৫৬০৫৬
চ) বড়চাষী	১২৪১৯	৯৮৫১	১৪৩১৩	৩৫৮৭	৪০১৭০

৫.৩. জমির পরিমাণ

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
নীট ফসলী জমি	১৩৪১৮৮	১৪০৫৯৬	১৮৮৬২৬	৭৬৮০৬	৫৪০২১৬
এক ফসলী জমি	৩৩৩০০	৬৬৯৬৮	৩৯৫২৩	১৩৮৮১	১৫৩৬৭২
দুই ফসলী জমি	৬৫১২৫	৫৪০৮০	১০৩০৬৩	৪২০৬৪	২৬৪৩৩২
তিন ফসলী জমি	৩৫৭৬৩	১৯০৬৩	৪৫০২৫	২০৯২১	১২০৭৭২
তিন ফসলের অধিক জমি	০০	৪৮৫	১০১৫	০	১৫০০
মোট ফসলী জমি	২৭০৮৩৯	২৩৪২৫৭	৩৮৪৭৮৪	১৬০৪৭২	১০৫০৩৫২
ফসলের নিবিড়তা (%)	২০২%	১৬৭%	২০৪%	২০৯.৪৭%	

৫.৪. কর্ষণ যন্ত্রের সংখ্যা

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ট্রাক্টর	১৭	০	৬৬	৬৫	১৪৮
পাওয়ার টিলার	৩১৩৮	২৪৮৭	৪২১০	২৯৪৩	১২৭৭৮

৫.৫. আবাদ যোগ্য ভূমির শ্রেণিবিন্যাস (হেক্টর)

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
উচু জমি	৮১৮৩	২২২০৭	৫১৬৩৯	১৬০১০	৯৮০৩৯
মাঝারী জমি	১১৮৪৬৫	৭৩০২৩	১২৮২৫৭	৩১১২০	৩৫০৮৬৫
মাঝারী নিচু জমি	২১১৬৫	৪০৯৩০	২৭১৩৫	২০৭৩৪	১০৯৯৬৪
নিচু জমি	৩৩৬৭	১১১৬০	২২৫৭৬	৯২৩৯	৪৬৩৪৫
অতি নিচু জমি	০	১৯৩১	০	১২৬৩	৩১৯৪
মোট =	১৫১১৮০	১৪৯২৫৪	২২৯৬০৭	৭৮৩৬৬	৬০৮৪০৭

৬. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস ও খাদ্য পরিস্থিতি

৬.১. শস্য বিন্যাস

ক্রঃ	শস্য বিন্যাসের বিবরণ			জমির পরিমাণ (হেক্টর)					বিন্যাসের
নং	রবি মৌসুম	খরিপ-১	খরিপ-২	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট	শতকরা হার
১	বোরো	পতিত	রোপা আমন	১৬৯০১	১৫৯০০	৬২২৫০	১৩০০০	১০৮০৫১	২০.৩৩%
২	বোরো	মাছ	মাছ	২০১২০	০	০	০	২০১২০	৩.৮০%
৩	বোরো	বোনা আমন		৬৬৫	২৩৮০	০	১১০০০	১৪০৪৫	২.৬৪%
৪	বোরো	আউশ	রোপা আমন	৭২৪	০	১৩৭৩০	০	১৪৪৫৪	২.৭২%
৫	বোরো	আউশ	পতিত	১৮৯৬	৪৩৪০	০	৩০০০	৯২৩৬	১.৭৩%
৬	বোরো	পতিত	পতিত	৩৮৭৯	২৬৫০০	১০০০	১৪০০০	৪৫৩৭৯	৮.৫৪%
৭	সরিষা	পাট	রোপা আমন	০	০	২৯১০	৩০০০	৫৯১০	১.১১%
৮	সরিষা	পতিত	রোপা আমন	৩৭০	৫২৫০	০	০	৫৬২০	১.০৫%
৯	ডাল জাতীয়	পাট	পতিত	০	০	০	৯০০০	৯০০০	১.৭০%
১০	ডাল জাতীয়	পাট	রোপা আমন	০	০	১৬৮০	৬০০০	৭৬৮০	১.৪৫%
১১	ডাল জাতীয়	পতিত	রোপা আমন	৩০৭	৯১৯০	০	০	৯৪৯৭	১.৮০%
১২	সবজি	সবজি	সবজি	৩৭৭৫	৩০৭০	৬২২০	২৫০০	১৫৫৬৫	২.৯৩%
১৩	পতিত	পতিত	রোপা আমন	২৩৫১১	৪২২৫০	১৮০৭০	০	৮৩৮৩১	১৫.৭৬%
১৪	পতিত	মাছ	রোপা আমন	২৭৩৫২	০	০	০	২৭৩৫২	৫.১৫%
১৫	পতিত	তিল	রোপা আমন	৯৬৪৬	০	০	০	৯৬৪৬	১.৮২%
১৬	পতিত	আউশ	রোপা আমন	৫০০	৪৫৪০	০	০	৫০৪০	১.০০%
১৭	অন্যান্য			০	১০৬৮৬	৫৩৪	৩৬০৭	১৪৮২৭	২.৮০%
১৮	জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে বর্তমানে আবাদ হচ্ছে না			০	০	৬০৫০০	০	৬০৫০০	১১.৩৮%

৬.২. খাদ্য পরিস্থিতি

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) জনসংখ্যা	২৩৭৪৬৭৪	১৫০৪০৩৬	২০৪৮২৯০	৭৬০৭৩৩	৬৬৮৭৭৩৩
খ) খাদ্য প্রয়োজন (৪৮৭ গ্রাম/জন/দিন) মেঃটন	৪২২১১০	২৬৭৩৫০	৩৬৪০৯৪	১৩৪৬৫০	১১৮৮২০৪
গ) বীজ গো-খাদ্য ও অপচয় বাবদ- (খাদ্য প্রয়োজনের ১১.৫৮%) মেঃ টন	৪৮৮৮০	৪৪১১৯	৪২১৬২	৩১২২১	১৬৬৩৮২
ঘ) মোট খাদ্য চাহিদা	৪৭০৯৯০	৩১১৪৬৯	৪০৬২৫৬	১৬৫৮৭১	১৩৫৪৫৮৬
ঙ) মোট খাদ্য উৎপাদন (চাউল + গম)	৪৯৩২৫৩	৩৮০৯৯০	৫৯৩১৬৯	২৬৯৬১৪	১৭৩৭০২৬
চ) উদ্বৃত্ত(+) ঘাটতি(-) মেঃটন	+২২২৬৩	+৬৯৫২১	+১৮৬৯১৩	+১০৩৭৪৩	+৩৮২৪৪০

৭. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) সেচ ব্যবস্থাপনা

৭.১. ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে রোপা আমনে সম্পূরক সেচ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	রোপনকৃত জমি হেক্টর	ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা										রোপা আমন চাষে অর্জিত জমি		মন্তব্য
			গভীর			অগভীর			এল এল পি			অন্যান্য	মোট জমির পরিমাণ (হেঃ)	সেচের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ)	
			বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	খুলনা	৯০৮৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৯০৮৬০	০	
২	বাগেরহাট	৬৪৬৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬৪৬৬০	০	
৩	সাতক্ষীরা	৮২৫৯৫	৬	১৮	২৪	১২০	২২৩০	২৩৫০	০	৯০	৯০	০	৮৩৫৯৫	৪৮৩৫	
৪	নড়াইল	৩০৩১৫	০	০	০	২৫	৩২৫০	৩২৭৫	৩	৭১	৭৪		৩০৩১৫	৮৮০৫	
	মোট	২৬৯৪৩০	৬	১৮	২৪	১৪৫	৫৪৮০	৫৬২৫	৩	১৬১	১৬৪	০	২৬৯৪৩০	১৩৬৪০	

৭.২. ২০১৫-১৬ বোরো মৌসুমে বোরো ধানে সম্পূরক সেচ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা									অন্যান্য	সেচকৃত জমির পরিমাণ হেক্টর									অন্যান্য	সর্বমোট সেচকৃত জমি হেঃ
		গভীর			অগভীর			এল এল পি				গভীর			অগভীর			এল এল পি				
		বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট		বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
১	খুলনা	৩	৬	৯	১৪৫৭	১৩৬৫০	১৫১০৭	১০	১৪২১০	১৪২২০	০	৫	১০	১৫	৩৪৫২	২৫৫৩৮	২৮৯৯০	৩৫	২২০৮০	২২১১৫	০	৫১১২০
২	বাগেরহাট	২	০	২	১৩৩৩	৪৫৫৩	৫৮৮৬	৩৩	১৪২২৩	১৪২৫৬	১৬৬০	৫৫	০	৫৫	৪৫৯৫	১০৮১৫	১৫৪১০	৩৪৫	৩৪৩৮০	৩৪৭২৫	৯৭০	৫১১৬০
৩	সাতক্ষীরা	৩৩৭	৪১০	৭৪৭	৩৫৯২	৫১১৮৫	৫৪৭৭৭	৩১	২৫১৫	২৫৪৬	১১৬০	৫৯৩৫	৫১২৫	১১০৬০	৯৪৯৩	৪৯১১৬	৫৮৬০৯	৬৩	৩৪৪৩	৩৫০৬	২৭০	৭৩৪৪৫
৪	নড়াইল	০	০	০	১২৯	১৭৯৫৫	১৮০৮৪	৩৭	৬২৫	৬৬২	০	০	০	০	৫০৫	৩৬২৫০	৩৬৭৫৫	৩০০	১৬২৫	১৯২৫	০	৩৮৬৮০
	মোট	৩৪২	৪১৬	৭৫৮	৬৫১১	৮৭৩৪৩	৯৩৮৫৪	১১১	৩১৫৭৩	৩১৬৮৪	২৮২০	৫৯৯৫	৫১৩৫	১১১৩০	১৮০৪৫	১২১৭১৯	১৩৯৭৬৪	৭৪৩	৬১৫২৮	৬২২৭১	১২৪০	২১৪৪০০

৭.৩. ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ফসলওয়ারী (বোরো ব্যতিত) সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)

ক্র: নং	জেলার নাম	গম	আলু	সরিষা	সবজী	ভুট্টা	ফলবাগান	পিয়াজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	খুলনা	৬৯০	৫০২	২৭৫	৫৪৮৬	৫০	০	৯৫	৩২	৭১৩০
২	বাগেরহাট	৫৩২	৫৯১	৪৬০	৩২৬২	১৬২	৮০৫	৯৩	৫৩৭	৬৪৪২
৩	নড়াইল	২১৩৩	৩৪৫৫	৮৯০৪	৯৭৫৫	১৬৫	৩০৫০	৬৫৫	২৮২২	৩০৯৩৯
৪	সাতক্ষীরা	৬৩০০	২০	২২৫০	২৩১৭	৩	২৫০	৫৯৫	৫২৫	১২২৬০
	মোট	৯৬৫৫	৪৫৬৮	১১৮৮৯	২০৮২০	১৮০	৪১০৫	১৪৩৮	৩৯১৬	৫৬৭৭১

৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) জলাবদ্ধ এলাকার চিত্র

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাবদ্ধ এলাকার নাম	জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ (হেঃ)	জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমি উদ্ধার (হেঃ)	মন্তব্য
	খুলনা	তেরখাদা	ভুতিয়ার বিল।	৬১৭০	৬১৭০	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		রূপসা	বড় জালা বিল, শিয়ালী বিল, নর্নিয়ার বিল, গোয়াড়া বিল, ডোবা বিল।	২০২৫	২০২৫	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		ডুমুরিয়া	মাগুরঘোনা।	২২৫	২২৫	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		মোট ঃ		৮৪২০	৮৪২০	
	বাগেরহাট	সদর	কাঠি, নোনাডাঙ্গা, সুলতানপুর, মুখক্ষাইট, কোড়ামারা, কুরশাইলচাপা, তলা, সৈয়দপুর, বড়পাইকপাড়া, খানপুর, হকিমপুর, বাদোখালী, পশ্চিমডাঙ্গা, সায়েড়া, শ্রীঘাট, হাড়িখালী।	২৩৮১	২৩৮১	
		ফকিরহাট	সাতবাড়িয়া, মৌভোগ, বারশিয়া, আট্টাকী, সাতশৈয়া, পিলজংগ, শ্যামবাগাত, খাজুরা, ভবনা, মাসকাটা, ঘনশ্যামপুর, তেকাটিয়া।	৮২০	৮২০	
		মোল্লাহাট	গাওলা, চকদা, মাটিয়াবগতি, কেন্দুয়া, সারুলিয়া, রাঙ্গামাটি, কাচনা, ধবলিয়া, মন্ডলগাতি, মোল্লারকুল, ঘাটবিলা, রাজপাট, গাংনী, বেতবাড়িয়া, কামরগ্রাম, আটজুড়ি, ভান্ডারখোলা।	২৭১০	২৭১০	
		রামপাল	গৌরম্ভা, কাপাস, মুরুলিয়া, প্রসাদ নগর, ভৈরবডাঙ্গা, আদাঘাট, আলুকাদিয়া, চিত্রা, সোনাকুড়, কদমদি, সোনাতুনিয়া,রাজনগর, পেড়িখালী, ভোজপাতিয়া, মল্লিকের বেড়, বাশতলি।	১৫৫৫০	১৫৫৫০	
		চিতলমারী	চিলতমারী, শিবপুর	১২৫	১২৫	
		মোট ঃ		২১৫৮৬	২০৭৬৬	
		সদর	বাঁশদহা, কুশখালী, বৈকারী, ঘোনা, শিবপুর, ভোমরা,			বোরো, রোপা আমন

চলতি পাতা

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাবদ্ধ এলাকার নাম	জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ (হেঃ)	জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমি উদ্ধার (হেঃ)	মন্তব্য
	সাতক্ষীরা		আলীপুর, ধুলিহর, ব্রক্ষরাজপুর, আগরদাড়ী, ঝাউডাংগা, বল্লী, লাবসা, ফিংড়ী, পৌরসভা।	৬৫৮০	৬৫৮০	
		কলারোয়া	লাঙ্গলঝাড়া, রুদ্রপুর, মুরারীকাটি, গোবিনাথপুর, জালালাবাদ, জয়নগর, যুগিখালী, কশোডাংগা, দেয়াড়া	১৪৪৫	১৪৪৫	বোরো, রোপা আমন
		তালা	ধানদিয়া, নগরঘাটা, সরুলিয়া, খালিশখালী, তালা, তেতুলিয়া, জালালপুর, মাগুরা, ইসলামকাটি, কুমিরা।	১১৮৫০	১১৮৫০	বোরো, রোপা আমন
		আশাশুনি	কাদাকাটি, দরগাহপুর, কুল্যা।	৪৫০	৪৫০	রোপা আমন
		শ্যামনগর	আবাদচন্ডিপুর।	৮০	৮০	রোপা আমন
		মোট ঃ		২০৪০৫	২০৪০৫	
	নড়াইল	সদর	চাঁচুড়ি বিল, বেনাডোপ, বিজয়পুর, ঘড়িভাংগা, নলামারা, দুধপাতলা, কান্দর, শোলোয়ার বিল।	৮৫	৮৫	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		লোহাগাড়া	ইছামতি বিল, কুমড়ি বিল/চাঁচুড়ি বিল।	২৫০	২৫০	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		কালিয়া	যোগনিয়া, পাখিমারা, বি এফ কে পি বিল।	১৫০	১৫০	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		মোট ঃ		৪৮৫	৪৮৫	
		অঞ্চলের মোট ঃ		৫০৮৯৬	৩৯২৭৫	

৯. জলাবদ্ধ ভবদহ প্রসঙ্গ

৯.১. ভবদহের পরিচিতি

ভবদহ, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জলাবদ্ধ এলাকার নাম। এটি গাঙ্গেয় প্লাবন দ্বারা গঠিত, অপেক্ষাকৃত নবীন এবং নদী বিধৌত এলাকা। প্রকৃতঅর্থে, যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার সংযোগস্থল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। ভবদহ স্লুইসগেট সংশ্লিষ্ট যশোরের অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, খুলনার ফুলতলা, ডুমুরিয়া, সাতক্ষীরার তালা কেন্দ্রিক এর ব্যাপ্তি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে এলাকার নদীসমূহের প্রবল গতিপ্রবাহ ছিল। উজানের নদীসমূহের সাথে অবাধ সংযোগ ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। অসুবিধা ছিল দিনে দুইবার জোয়ারের লবণাক্ত পানি, আর বন্যা। ঐ সময় পলি প্লাবন ভূমিতে পড়ে ভূমি গঠনের কাজ এবং নদীর প্রবাহ অক্ষুন্ন ছিল। ভূমি গঠন শেষ হওয়ার পূর্বেই উপকূলীয় বাঁধ তৈরি হয় (গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে) এবং উজানের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে ২৭ বিল এবং পরোক্ষভাবে আরো ২৬ বিলের জল নিস্কাশনের জন্য ১৯৬১ সালে ভবদহ স্লুইসগেটের জন্ম। প্রথমত: স্লুইসগেটের সুফল লক্ষণীয়। কিন্তু, পলি জমে ধীরে ধীরে ভরাট হতে থাকে নদীর তলদেশ। গত শতাব্দীর ৮০ এর দশকে দৃশ্যমান হয় জলাবদ্ধতা, এখন তার পরিণতি ভয়াবহ। মূলত ২৩টি ইউনিয়নের ২১৮টি গ্রাম এবং ৩৩০ বর্গ কি:মি: ভবদহের সংশ্লিষ্ট এলাকা বলা যায়। এ জলাবদ্ধতার কারণে বলা হচ্ছে ভবদহের বাঁধ মানুষের মরণ ফাঁদ। সমাধানের জন্য মুক্তির লড়াই হয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভূক্তভোগী জনতা এবং সরকার। স্থায়ী সমাধান হয়নি। ভবদহের জলাবদ্ধতার জন্য এ এলাকার কৃষককূল দীর্ঘদিন কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। সুষম পানি ব্যবস্থাপনার দ্বারা এখানে কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল করা সম্ভব।

৯.২. পটভূমি/প্রাককথন

বিশ্ব মানচিত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: আয়তনের নদী মাতৃক ছোট দেশ, আমাদের ভূখণ্ড এ বাংলাদেশ। সুদূর অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ অঞ্চল প্রধানত পলিমটি-গঠিত ভূভাগ আর এর গঠন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যেখানে আজ আমাদের অবস্থান, যা এক সময় সমুদ্র গর্ভে বিলীন ছিল। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে আসা (বিধৌত) পলি মাটি বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবহমান, আবার জোয়ারকালীন এর উত্থিত গতির মিথষ্ক্রিয়ায় (জোয়ার-ভাটার চক্রাবর্তনে) নিপতিত পলি এ ভূ-খণ্ড সৃষ্টির ইতিকথা।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর শুধুমাত্র সুন্দরবনের জৈববর্জ্য থেকে ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন পলি তৈরি হয়ে এ অঞ্চলের নদ-নদী ও নদীতীরবর্তী ভূমিতে অবক্ষেপিত হয়। খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, জেলা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গঠিত (অবশ্য ফরিদপুর এবং বরিশালকে যুক্তকরে যে গঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল যা গঙ্গাবিধৌত পলিদ্বারা গঠিত। প্রকৃত অর্থে, নদীসমূহের পলিবাহিত জোয়ার ভাটা, লবণাক্ত এবং স্বাদু পানি সমন্বিত এ অঞ্চল পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতের গঙ্গা, সে দেশের নদীয়া জেলার করিমপুর হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুরে প্রবেশ করে। গতিপথে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহমান। চলমান ধারায় পদ্মার শাখা ভৈরব–মাথাভাংগা মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী, হরি, তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাংগার সাথে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

এখানে দুটো বিষয় সহজে জানা দরকার: (এক) গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগরের এধারা এক সময় বাধাহীন ছিল জলাবদ্ধতা ছিল না। (দুই) এই ধারার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় (যা পরের আলোচনায় সন্নিবেশিত) মুক্তেশ্বরী–টেকা-শ্রী হরী নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকাই বর্তমানে সমস্যাগ্রস্ত ভবদহের জলাবদ্ধ অঞ্চল। মূলত ৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পারামর্শ-উদ্বুদ্ধ সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির আওতার অধিক ফসল ফলানোর কৌশলের অংশ হিসেবে ইউএসএ, আইডি'র সহায়তায় এবং এডিবি'র ঋণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ৩৯টি পোল্ডার, ১৫৬৬ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ এবং ২৮২টি স্লুইসগেট দিয়ে ফসলের প্রলোভনে এ অঞ্চলের মানুষ ও তার প্রকৃতি পরিবেশকে দীর্ঘ মেয়াদী সংকটের যাতাকলে ফেলে দেয়া হয়।

অবশ্য উপকূল রক্ষা বাঁধ দেওয়া উষালগ্নে কয়েক বছর বাম্পার ফলন হয়। স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্যমতে এ জন্য তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সোনার কাচি উপহার দিয়েছিল। এরই মধ্যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। বাঁধ দেয়ার ফলে পলি অবক্ষেপণের প্লাবন ভূমি আটকা পড়ল, ভূমি গঠন বাধাগ্রস্ত হলো। একদিকে কৃষি জমি হারাতে থাকল পলি অন্য দিকে জোয়ারে আসা এ পলি নদী তীর এবং তলদেশে জমা হতে থাকল। ফলশ্রুতিতে নদীর বুক উঁচু এবং বিলের তলদেশ সে তুলনায় নিচু থেকে গেল। বিলসমূহ পরিণত হলো পানির পকেটে। এ কারণে গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকে মূলত ১৯৮২ সাল নাগাদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আড়াই লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতার রূপ নেয়। ভবদহ অঞ্চলের ২৭টির অধিক বিল এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পড়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে। উল্লেখ্য অভয়নগর, কেশবপুর, মনিরামপুরের কৃষি জমির সঙ্গে সংলগ্ন শ্রী-হরি নদীকে দুই ভাগ করে, ভবদহ নামক স্থানে ২১ ভেন্ট ও ৯ ভেন্টের দুইটি স্লুইসগেট দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে মুক্তেশ্বরী, হরিহর, ভদ্রা ও কপোতাক্ষ নদীর জল অপসারিত হয়।

বিলের হিসাব বিশ্লেষণ করলে প্রত্যক্ষভাবে ২৭টি এবং পরোক্ষভাবে আরো ২৬টি বিলের পানি নিস্কাশিত হতো এ ভবদহ স্লুইসগেট দিয়ে। প্রকৃতির নিয়মে স্লুইসগেটের ভাটিতে পলি জমতে থাকে সর্বোপরি, ২০০৫ সালে টানা ৪৮দিন ভবদহ স্লুইসগেট বন্ধ থাকে, সংকট আরো ঘনিভূত হয়। আসলে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ভাটিতে পোল্ডার স্লুইসগেট ও বাঁধ নির্মাণ, উজানে নদীর প্রবাহ ক্ষীণ করা, কোথাও কোথাও অবকাঠামো নির্মাণ দ্বারা নদীর গতি বন্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতির গতিকে রোধ করা হয়েছে। আর প্রকৃতির প্রতিশোধই হচ্ছে ভবদহের বর্তমানের দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ জলাবদ্ধতা।

৯.৩. সম্পর্কিত পরিভাষা

ক) ক্রুগ মিশন: একথা অস্বীকার করার উপায় নেই খাল বিল জল জলা, জঙ্গল জানোয়ারের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনাচার, জীবিকার নিবিড় সম্পর্ক আর বন্ধন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে। বাস্তবতা হলো এ জল যখন স্থায়ী অস্থায়ী জলাবদ্ধতার রূপ পরিগ্রহ করে জীবন জীবিকা তখন দুর্বিসহ, মুক্তির লড়াই তখন অনিবার্য এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যা ছিল বন্যা আর লবণাক্ততা। এর সমাধানের প্রয়াস চলেছে, বছরের পর বছর। ১৯৫৪-৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পর জাতিসংঘের সুপারিশে পূর্ববাংলার বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য একটা কমিশন গঠন করা হয় যা ক্রুগমিশন নামে খ্যাত। ক্রুগমিশন এ অঞ্চলের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য একটা সুপারিশ পেশ করেন।

খ) অষ্টোমাসী বাঁধঃ গতশতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিলে ফসল করার উদ্দেশ্যে, বাঁধ দিয়ে লোনা পানি ঠেকিয়ে আবাদ করতেন। আবাদ শেষে বাঁধ কেটে জোয়ারের পলিযুক্ত পানি বিলে তুলে বিল উঁচু করতেন। এভাবে চলত ফসল উৎপাদনের সাথে ভূমি গঠন। আর এ বাঁধের নাম অষ্টমাসী বাঁধ। মাঘী পূর্ণিমার বাঁধ দিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় খুলে দেয়া হতো। এতে নদীর নাব্যতা বজায় থাকত। নদী দিয়ে পানি সহজে নিষ্কাষিত হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না।

গ) পোল্ডারঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী বেষ্টিত ভূমির নদী তীর বরাবর চতুর্দিকে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর লবণাক্ত পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয় এবং বিলের ভিতরে অবস্থিত খালের মুখে স্লুইস গেট নির্মাণ করে বিলের ভিতরের আবদ্ধ পানি নিষ্কাষণের পথ সুগম করা হয় যা পোল্ডার নামে অভিহিত। ১৯৫৯ সালে সাবেক ইপি. ওয়াপদা গঠন হওয়ার পর এ লবণ পানি বাধা দেওয়া এবং অধিক ফসল ফলানোর জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

ঘ) জোয়ারধার (TRM): TRM এর পূর্ণরূপ Tidal River Management বাংলার নদীর জোয়ার ব্যবস্থাপনা। মূলত জলাবদ্ধতা নিরসন, ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের উদ্ভাবিত নদী পরিচর্যার সমন্বয়ে ফসল ফলানোর এক কৃষি পদ্ধতি যা পরবর্তীতে গবেষকদের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা পেয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার ভাটা চলমান মূল নদী সংলগ্ন যে কোন উপযুক্ত বিলে তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ দিয়ে নদী সংলগ্ন অবশিষ্ট দিকের উপযুক্ত স্থান উন্মুক্ত করে জোয়ার ভাটা চালু রাখা। ফলে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি বিলে প্রবেশ করে পলি অবক্ষেপণ করবে। পরে ভাটার সময় স্বচ্ছ পলি নদী দিয়ে সাগরে ফিরে যায় এ প্রক্রিয়ায় বিল উঁচু এবং নদী খনন কাজ সম্পন্ন হয়। এতে ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে জলাবদ্ধতা দূর হবে।

ঙ) পেরিফেরিয়াল বাঁধঃ একটা বিলে পরিকল্পিত জোয়ারাধার (টিআরএম) সৃষ্টির লক্ষে তিন দিকে বাঁধ দেয়া এবং একদিকে খোলা রেখে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি তোলা এবং ভাটিতে স্বচ্ছ পানি বের করে দেয়া। উদ্দেশ্য হলো পলিযুক্ত লবণ পানি বাইরে না যায়। কারণ, এ পানি বাইরে গেলে প্রাণী ও প্রকৃতির ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত, পলিমাটি যা জমিতে পড়ে উঁচু হবে এবং স্বচ্ছ পানি বের হয়ে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।

চ) কাটিং পয়েন্টঃ পেরিফেরিয়াল বাঁধের যে দিকটা খোলা রাখা হবে, জোয়ারের পানি (পলিযুক্ত) বিলে প্রবেশ এবং পলিবিহীন স্বচ্ছ পানি বের করার জন্য সেই দিকটাকে কাটিং পয়েন্ট বলে।

৯.৪. ভবদহ সংশ্লিষ্ট নদীপ্রবাহ (গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগর)

মুক্তেশ্বরী নদী ভৈরবের দক্ষিণমুখী শাখা গঙ্গা বিধৌত ব-দ্বীপের এই প্রধান প্রবাহ ভৈরব। নদীয়া জেলার করিমপুর থানা দিয়ে মেহের পুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহমান। গঙ্গানদীর এর প্রধান উৎস। ৫০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে ৩কি.মি দূরে ভারতের অভ্যন্তরে হাগনা গাড়ি নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। চূর্ণী নদীর সাথে এই প্রবহের সংযোগ।

পদ্মার শাখা মাথাভাংগা ভৈরবের আর এক প্রবাহ মুখ। উল্লেখ্যে, ইংরেজরা মাথাভাংগা নদীর উৎপত্তি স্থলে মাটি বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে মাটি ভরাট করায় এর স্রোত অনেকটা ক্ষীণ। মাথা ভাঙ্গা সুবলপুর-রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর-হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষ ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বুকভরা বাওড় থেকে হালসার খাল কেটে হরিহরে মিশলে ভৈরব ও মুক্তেশ্বরীতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি ভৈরব থেকে। যশোর কালীগঞ্জ চৌগাছার বিস্তৃত এলাকার বিশাল বাওড় মজ্জাতের বাওড়ের বিপরীত পাশে মুক্তাধা নামক স্থান থেকে প্রবাহমান ভৈরবের দক্ষিণ পাশ থেকে মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি। সুদীর্ঘ ও এককালের খরস্রোতা এখন মৃত প্রায়। যশোর শহর ও ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণপাশ দিয়ে সতীঘটা মনিরামপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। ঢাকুরিয়া পার হয়ে ডুমুর বিলের ভিতর দিয়ে সম্বন ডাঙ্গা বিলের পাশ দিয়ে পাঁচবাড়িয়া মুক্তেশ্বরী কলেজ ও হাজির হাটের বাজারের উত্তর পাশ দিয়ে লেবুগাতী হয়ে বিল বোকড়ে প্রবেশ করে অভয়নগর ও মনিরামপুরের সীমানা বরাবর মশিয়াহাটী, কুল্টিয়া ও লখাইডাঙ্গার পাশ দিয়ে বিল কেদারিয়ায় প্রবেশ করে। হেলার ঘাট ও লখাইডাঙ্গার ব্রিজের নিচ দিয়ে এর অবস্থান। টেকার ব্রিজ পেরিয়ে ভবদহ স্লুইসগেটে টেকা নদী নামে এসে মিশেছে শ্রী ও হরি নদীর সাথে। অতীতে ভৈরব, হরিহর ও কপোতাক্ষের বহু মিলন ধারার অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে আমডাঙ্গার খাল (২০০৬ এ নতুন করে স্বেচ্ছাশ্রমে কাটা) ছাড়া তার কোনো সংযোগ নেই।

ভবদহের ভাটিতে মুক্তেশ্বরী হরি নদী নামে খুলনা ডুমুরিয়া ও যশোর কেশবপুরের সীমানা বরাবর প্রবাহমান। নিচের অংশে তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাংগার সাথে সাগরে মিলেছে। হরিহরের নিম্নমুখী অন্য ধারাটি আপার সালতা হয়ে ঝপঝপিয়া ও কাকবাছা নদীর দুই ধারা নিয়ে পশুর নদীর সাথে মিশে মালঞ্চের সাথে সাগরে মিলেছে।

মুক্তেশ্বরীরর দুই পাড়ে অসংখ্য গ্রাম ও হাট-বাজার। যশোর শহরের পর (যশোর শহর মূলত ভৈরবের দুই পাড়) সতীঘাটা, ঢাকুরিয়া, উত্তরপাড়া, বারপাড়া, সুবলাকাঠি, ভোমরদহ, কাটাখালি, হাজরাইল, পাচবাড়িয়া, পাচকাটিয়া, কুমারসীমা, লেবুগাতী, ১৮ পাকিয়া, সুন্দলী, পোড়াডাঙ্গা, মশিয়াহাটী, কুলাটিয়া, লখাইডাঙ্গা, বালিধা, পাচাকড়ি, বারান্দী, দামুখালী, দত্তগাতি, ভবদহের পরে কপালিয়া, মান্দ্রা, দহাকুলা, শোলগাতিয়া, আগরহাটি, ভায়না, খর্ণিয়া, শোভনা প্রভৃতি।

৯.৫. "ভবদহের জলাবদ্ধতা আর সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের গতি পথের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য"

একটা বিষয় খুব পরিষ্কার বোঝা দরকার, আমাদের উজানে হিমালয় আর ভাটিতে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তো বটেই এর মাঝখানের প্রায় সমগ্র ভূভাগ জলরাশি/নিম্নভূমি থেকে নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বলা যায় নদীর বুক থেকে এবং নদী বাহিত পলি দ্বারা এ ভূখণ্ডের জন্ম, আর এ অর্থে নদী হলো জননী। তাই বলা হয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ নদীসমূহের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ভূমিগঠন এবং প্রকৃতির নিয়মে জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখে। এর ব্যত্যয় হলে মানুষ এবং প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের উৎপত্তি ও গতিপথ বিশ্লেষণ দরকার। আমরা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ মূলত ভৈরব- মাথাভাংগা নদীকাঠামোরই অংশ।

মূলত উপরোক্ত নদীগুলোর জলপ্রবাহ বাধাহীন হলে ভবদহসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। নদীগুলোর প্রবাহহীনতাই আজকের জলাবদ্ধতার মৌলিক বিষয়।

৯.৬. জলাবদ্ধতার কারণ জানতে যে বিষয়গুলো ভাবা দরকার

ক) জলাবদ্ধতার জনক উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিশ্ববাজার ভাগাভাগীর পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ক্রুগমিশনের রিপোর্ট স্থগিত হয়। পূর্ব বাংলায় বন্যা সমস্যার সমাধানের দায়িত্বে নিযুক্ত হয় ওয়াপদা সংস্থা। ওয়াপদা পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যা তদন্তপূর্বক লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশকে অন্যতম প্রধান

উৎপত্তিস্থল	নদ-নদী/নদ-নদীসমূহ
ভৈরব এবং মাথাভাঙ্গা	ইছামতি, বেত্রাবতী (বেতনা), কপোতাক্ষ, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, ভদ্রা, চিত্রা, বেগবতী, ফটকী, কাজলা, নবগঙ্গা
তাহিরপুর, চৌগাছা, যশোর	কপোতাক্ষ-ভৈরবের শাখা
ঝিকরগাছা, যশোর	হরিহর-কপোতাক্ষের শাখা
ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোর	ভদ্রা-কপোতাক্ষের শাখা
মহেশপুর, ঝিনাইদহ	বেত্রাবতী-ভৈরবের শাখা
কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, যশোর সদর ও চৌগাছা উপজেলা সংলগ্ন মজ্জাতের বাওড়ের দক্ষিণ প্রান্ত	মুক্তেশ্বরী-ভৈরবের শাখা
দর্শনা	চিত্রা ভৈরবের শাখা
মথুরাপুর, ঝিনাইদহ	বেগবতী/ফটকী নদী, নবগঙ্গার শাখা
চুয়াডাঙ্গা শহরের পাশে মাথাভাঙ্গা	নবগঙ্গা
ভৈরব, কপোতাক্ষ, মুক্তেশ্বরী ইত্যাদির নিম্নপ্রবাহ।	খোল পেটুয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, শিবসা, মরিচ, হরি, শ্রী, গ্যাংরাইল, শোলমারী, ময়ুর।

সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। সর্বোপরি, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদীরা সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক বিক্রির বিশ্ববাজার সৃষ্টির লক্ষে, সবুজ বিপ্লবের নামে অধিক শস্য ফলাও শ্লোগানকে সামনে নিয়ে আসে। জোয়ারের লবণ পানি প্রতিরোধে উপকূল জুড়ে বেড়ী-বাঁধ এবং স্লুইসগেট প্রকল্পের ফর্মূলা উপস্থিত করে। এই ফর্মূলার প্রেক্ষিতে ১৯৬০-৬৭ সালের মধ্যে শুধু খুলনা অঞ্চলে ৩৪টি পোল্ডার ১৫৬৬ কি.মি. বেড়ি-বাঁধ ও ২৮২টি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। উপকুল জুড়ে এ পোল্ডার ভেড়ি বাঁধ আর স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে বিল অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশ বন্ধ হয়। সবুজ বিপ্লবের শ্লোগানে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়ে। শুরু হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। জোয়ারের পানির সাথে সাথে আগত পলিও বিলের ভিতর প্রবেশে বাঁধাগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পোল্ডারের ভিতরের নিচু জমির ভূমি গঠন প্রক্রিয়া। এ পলি প্লাবনভূমি না পেয়ে জমা হতে থাকে নদীর তলদেশে। অন্য দিকে উজানের জল প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে উজান থেকে প্রবহমান নদীসমূহ প্রবাহহীন হয়ে পড়ে। ফলে লবণ পানির প্রবাহ এবং পলিপ্রবাহ উজানে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়ে, শুরু হয় পরিবেশ বিপর্যয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক নদীর তলদেশ, বিলের তলদেশের তুলনায় উঁচু হয়ে যায় নিস্কাশন পথ

বন্ধ এবং নেতিবাচক পথ ধরে সমায়ান্তে জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে ভবদহসহ তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

খ) বাধাগ্রস্ত উজানের প্রবাহ

এক: গঙ্গা বিধৌত ব-দ্বীপের এ অংশের প্রধান প্রবাহ ভৈরব। যা ভারতের নদীয়া জেলার করিমপুর থানা দিয়ে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রবহমান। মূলত গঙ্গা নদীই এর প্রধান উৎস। গত শতাব্দীর ৫০ এর দশকে বাংলাদেশ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে ভারতের অভ্যন্তরে হাগনাগাড়ি নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। চুর্নী নদীর সাথে এই প্রবাহের সংযোগ।

পদ্মার শাখা, মাথা ভাংগা ভৈরবের আর এক প্রবাহ মূখ। ইংরেজরা মাথা ভাংগা নদীর উৎপত্তি স্থলে মাটি বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে মাটি ভরাট করার ফলে এর স্রোত কিছুটা ক্ষীণ হয়। মাথা ভাংগা সুবলপুর রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষে ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ফলে এর ভাটিতে মুক্তেশ্বরী তার দুর্বল প্রবাহ নিয়ে টেকা শ্রী-হরি গ্যাংরাইল নামে বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে প্রবাহিত। এর দুর্বল প্রবাহ ভবদহ অঞ্চলের পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ নয়।

দুই: অবকাঠামো নির্মাণে নদীর উপর হস্তক্ষেপ: ১৮৫৯ সালে আসাম-বাংলা রেললাইনের কাজ শুরু হয়। ১৮৬১ সালে কোলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়। রেললাইনটি স্থাপন করা হয় চিত্রা নদীর পূর্ব তীর বরাবর। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভৈরব নদের ওপর একটি সংকীর্ণ রেলসেতু নির্মাণ করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালে চিত্রার খাত পুরোপুরি ভরাট করে কেরু অ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল নির্মাণ করা হয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদ-নদীতে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও দর্শনার রেলসেতুর নিচ দিয়ে সামান্য পরিমাণ পানি আসতো। কিন্তু ১৯৬০ সালে জিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মাগুরায় নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি স্লুইসগেট নির্মাণের কারণে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

৯.৭. সমস্যা যেভাবে শুরু

আশির দশকের শুরুতে স্লুইসগেটের বাইরে পলি জমে বাঁধের বাইরের নদী ও ভেতরের নদী ভূমি থেকে উঁচু হয়ে যায়। নাব্যতা হারায় মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী ও হরি নদী। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানি নিষ্কাশনের পথ। বৃষ্টির পানি আটকা পড়ে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। ১৯৮৪ সাল থেকে এই জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। বৃষ্টির পানি বিলে আটকা পড়ে পরে তা উপচিয়ে বিল সংলগ্ন গ্রামগুলো প্লাবিত হয়। পানিবন্দী হয়ে পড়েন মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন ভুক্তভোগী মানুষ। আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ১৯৯৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ২৫৭ কোটি আর্থিক সহায়তায় শুরু করে খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (কেজেডিআরপি)। ২০০২ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। শ্রী, হরি ও টেকা নদীর পলি অপসারণ, খাল খনন এবং বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার নির্মাণ করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়। আপাত অবসান হয় জলাবদ্ধতার।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় বিএনপি নেতা বর্তমানে মনিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজমুস সাদাতসহ আরও ৪৮৩ ব্যক্তি বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড মার্চ মাস থেকে ৪৮ দিন ভবদহ স্লুইসগেট বন্ধ রাখে। এতে পলি জমে নদীর বুক উঁচু হয়ে পড়ে। ওই বছরের অক্টোবর মাসের টানা বর্ষণে পুনরায় পানি জমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এরপর ২০০৬ সালের চারদফা অতিবর্ষণে অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও যশোর সদর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নের ১৮৪টি গ্রাম তলিয়ে যায়। পানিবন্দী হয়ে পড়েন চার লক্ষাধিক মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে 'ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির' নেতৃত্বে শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। তীব্র আন্দোলনের মুখে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওই বছর ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্রী, হরি ও টেকা নদী পুনর্খনন করা হয়। কেশবপুর উপজেলার বিল খুকশিয়ায় জোয়ারাধার চালু এবং অভয়নগর উপজেলার আমডাঙ্গা খাল সংস্কার করা হয়। শুরু হয় পানি নিষ্কাশন। দূর হয় জলাবদ্ধতা।

৯.৯. ভবদহসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম

TRM (Tidal River Management) মূলত মূল নদী সংলগ্ন যে কোন একটি নির্বাচিত (একাধিকও হতে পারে) বিলের তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ করে (উন্মুক্তও হতে পারে) অবশিষ্ট দিকের ভেড়িবাঁধের একটি অংশ উন্মুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা হয়। এটাই টিআরএম বা জোয়ারধার নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে সাগর থেকে জোয়ারের সাথে আসা পলি বিলে থেকে যায়। পরে স্বচ্ছ পানি ভাটি আকারে ফিরে যায়। ফলশ্রুতিতে জোয়ারে আসা পলি বিল/নিম্নভূমি উঁচু করে আর ফিরে যাওয়া স্বচ্ছ পানির প্রবাহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে প্রকৃতির নিয়মে নদী খনন কাজ চলে। এভাবে ভূমিগঠন জলাবদ্ধতা নিরসন এবং নদী খনন কাজ সম্পন্ন হয়।

ক) অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এর সমীক্ষা: ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গ প্রলয়ংকারী বন্যায় কবলিত হয়। সেই সময়ের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন। তার সেই সমীক্ষায় বন্যার কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। এ সমীক্ষায় ঐ বন্যার প্রবণতা, বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাঁধের কার্যকারিতা সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা ছিল। প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯২৭ সালে তিনি বললেন, "উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রধান কারণ সেখানকার বিলসহ নিচু এলাকায় পানি ঢুকলে সহজে বের হতে পারে না। বন্যার প্রবাহকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা।" প্রশান্ত মহলানবীশ তার বিশ্লেষণে আরো বলেন পলিযুক্ত পানি অবাধে চলতে দিলে পলির স্তর পড়ে নিচু ভূমি ক্রমাংশ উঁচু হয়ে উঠবে, বন্যার প্রকোপ কমবে। এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ, সেকারণে নিকট ভবিষ্যতে বন্যা হতে থাকবে। সমাধান সূত্রে তিনি বললেন, নদীর তীরে বাঁধ তৈরি করে বন্যাকে ঠেকানোর প্রচেষ্টা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কারণ এতে আবদ্ধ বন্যার জলে সঞ্চিত পলিমাটি পড়ে নদীতল ক্রমে ভরাট ও উঁচু হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিচু এলাকায় চারিদিকে বাঁধ নির্মাণ দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এর তথ্য (উত্তরবঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত) আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ ও সমাধানের সাথে অনেকটা সংগতিপূর্ণ।

৯.৮. ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকার মানচিত্র

(ক) সংশ্লিষ্ট পোল্ডারসমূহ

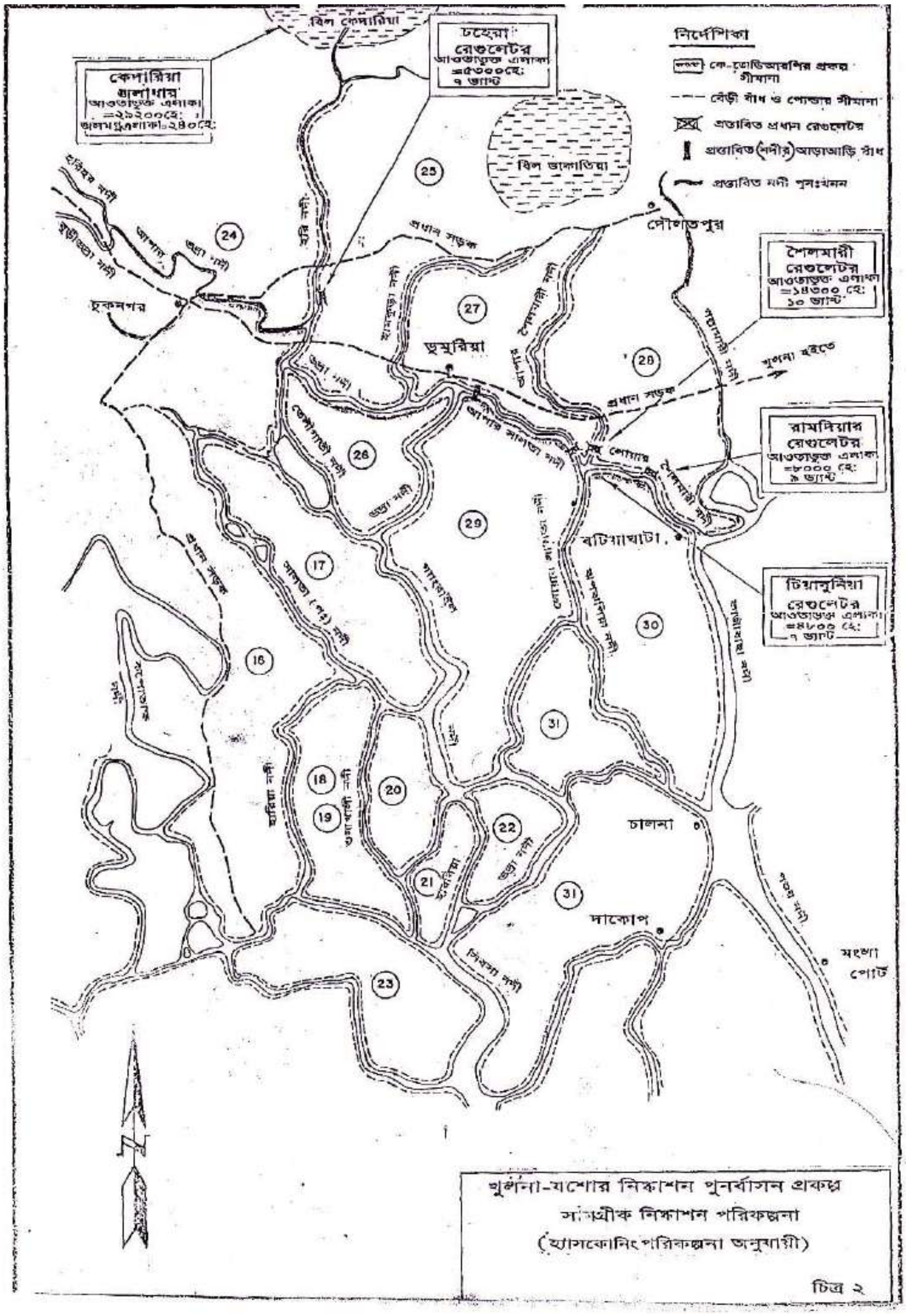

৯.৮. ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকার মানচিত্র

(খ) ২৪ নং পোল্ডার (জলাবদ্ধ)

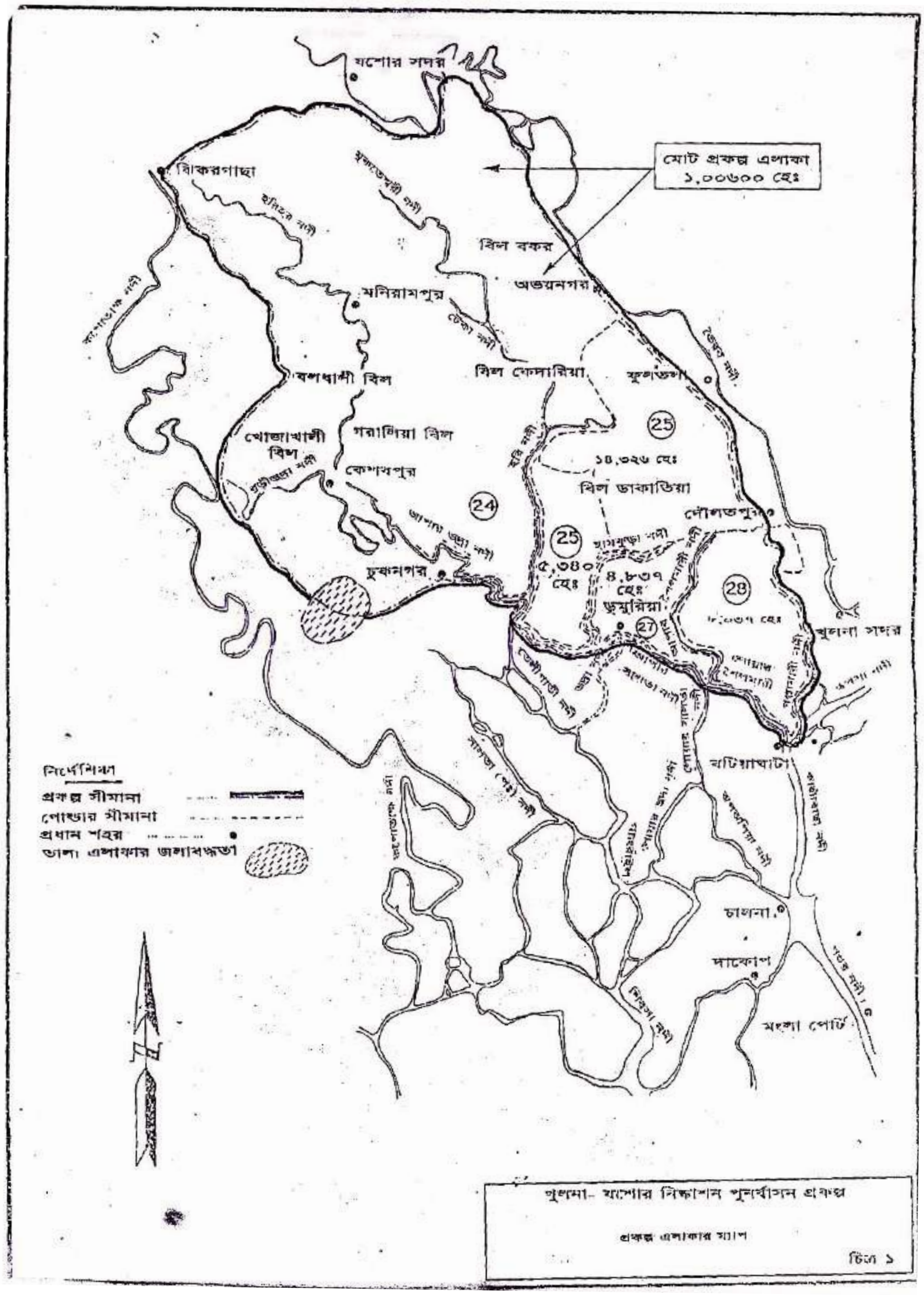

খ) টিআরএম এর স্বীকৃতিঃ আসলে অতি প্রাচীন লোকজ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিক রূপ টিআরএম। গত শতাব্দীর ৮০ দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা শুরু হলে, তা নিরসনের লক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নামে আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ (এ আন্দোলনের প্রায় সবগুলোর পুরোধায় ছিল বাম প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যাক্তি) বাঁধ কাটা, গেট ভাংগা অবাধ পানি প্রবাহের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে এডিবি-ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (২২,৮৬৮,১৬ লক্ষ টাকা) কেজিডিআরপি (Khulna Jessore Drainage and Rehabilitation Project) এর অধীন হ্যাসকোনিং ও হেলক্রো সামগ্রিক নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এ কর্মসূচির আলোকে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাবেক উপকুলীয় বাঁধের সম্প্রসারণ করতে চাইলে গণপ্রতিরোধে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইজি আই এস-এর জাতীয় কর্মশালায় পানি বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সর্বস্তরের জনগণ গবেষণালব্ধ ৪টি বিকল্পের মধ্যে ৪র্থ নম্বরের নদীর পরিকল্পিত জোয়ার ভাটা ব্যবস্থাপনা যা বর্তমানে টিআরএম এর স্বীকৃতি দেয়।

সময়	বিল	কার্যক্রম
১৯৮৩	ভর্তের বিল/ সিঙ্গিয়ার বিল	বাঁধ ভাঙ্গা
২২ জুলাই, ১৯৮৮	ডহুরী	বাঁধ কাটা
১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০	বিল ডাকাতিয়া	বাঁধ কাটা
২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭	ভরত-ভায়না	বাঁধ কাটা

গ) টিআরএম পূর্ব বাঁধকাটা/ভাঙ্গা কার্যক্রম (বিক্ষুব্ধ জনতা/আন্দোলনকারী সংগঠন)

ঙ) টিআরএম এর ব্যর্থতার কারণ

১। হীন রাজনৈতিক স্বার্থ (টিআরএম এর পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান)
২। খাস জমি ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা।
৩। টিআরএম এর বিরুদ্ধে ঘের মালিক ও লীজ গ্রহীতাদের অবস্থান।
৪। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি এবং বোর্ডের প্রতি জনগণের অনাস্থা।
৫। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষতা এবং আন্তরিকতার অভাব।
৬। পেরিফেরিয়াল এবং গ্রামরক্ষা বাঁধ সংক্রান্ত প্রশ্ন।
৭। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তিতে ব্যাপক হয়রানি, অব্যবস্থাপনা এবং সীমাহীন দুর্নীতি।

ঘ) এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন/চলমান টিআরএম এর খতিয়ান

বিলের নাম	সংশ্লিষ্ট নদ-নদী	ধরন (মুক্ত/পরিকল্পিত)	সময়কাল	কততম	উদ্যোক্তা	ক্ষতিপূরণ	প্রধান অন্তরায়/ পরিবেশের উপর প্রভাব	মূল্যায়ন
ভরত ভায়না	হরিনদী	অপরিকল্পিত, উন্মুক্ত	১৯৯৭, ২৯ অক্টোবর থেকে ২০০১	১ম	আন্দোলনকারী স্থানীয় জনগণ	ব্যবস্থা ছিল না।	গাছপালা, মাছ, প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি। লবণাক্ততার ফলে গো-খাদ্যের সংকট	বিলের তলদেশ ৫-৬ ফুট ভরাট, ৭৫% ভরাট, হরিনদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়।
বিল কেদারিয়া (৬০০ হেক্টর)	হরিনদী	পরিকল্পিত (৬০০ হেক্টর জমির চারিদিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ ছিল)	জানুয়ারি ২০০২ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত	২য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল না।	পরিবেশের উপর তেমন বিরুপ প্রভাব ছিল না। ২০০৫ সালে উঁচু অংশের জমির মালিকেরা জমির চাষ করে, নিচু অংশ নিচু থেকে যায়। আরও কিছুদিন টিআরএম দরকার ছিল। কিন্তু হয়নি। ২/৩ অংশ ভরাট হয়। অভ্যন্তরীন দ্বন্দ শুরু হয়। সামগ্রিক ক্ষতি ভবদহ অঞ্চলের নদী ১৭ কিলোমিঃ পলি দ্বারা ভরাট হয়। ফলে ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতা হয়।	হরি নদীর নাব্যতা বজায় ছিল।
পূর্ব বিল খুকশিয়ায় (৮৪৬ হেক্টর)	হরিনদী	পরিকল্পিত	২৭ এপ্রিল ২০০৬ থেকে ২০১০+	৩য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল।	ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সবাই পায়নি। ১০৮২ জন জমির মালিকের মধ্যে ৪৪৬ জন ক্ষতি পূরণ পেয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৮৫,২৩,৩৩২/- (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত বত্রিশ) টাকা মাত্র। (পানি উন্নয়ন বোর্ড ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,৪০,০০,০০০/- (তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করেন।	নির্ধারিত সময়ে টিআরএম কার্যক্রম শেষ না হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়। টিআরএম করা কালীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

৯.১০. ভবদহের চলতি জলাবদ্ধতায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

উপজেলার নাম	মোট ইউপির সংখ্যা	অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের নাম ও সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গকিঃমিঃ)	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি (সম্পূর্ণ/আংশিক)
মনিরামপুর	১৭টি	ঢাকুরিয়া, হরিদাসকাঠি, খেদাপাড়া, হরিহরনগর, ঝাপা, মশ্মিমনগর,চালুয়াহাটি, শ্যামকুড়, খানপুর, দুর্বাডাঙ্গা, কুলটিয়া, নেহালপুর, মনোহরপুর = ১৩টি	১২০টি	২০৬.০০	৩০,০০০	১,২০,০০০	১,৫০০
অভয়নগর	০৮টি	প্রেমবাগ, সুন্দলী, চলশিয়া, পায়রা = ৪টি পৌর = ১টি	৫৫টি	১২০.০০	১৪,৮৯৫	৬৫,০০০	১৪,৮৯৫
কেশবপুর	১১টি	কেশবপুর সদর = ১টি পৌর = ১টি	৮৫টি	১২১.৯০	১৭,৩৪৯	৮২,৫১১	১৭,৩৪৯

অস্থায়ী/স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত পরিবার	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি: সম্পূর্ণ (হেক্টর)	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি: আংশিক (হেক্টর)	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি: টাকায় ক্ষতি	ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য সম্পদ: হেক্টর	ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য সম্পদ: টাকায় ক্ষতি	ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মসজিদ	ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মন্দির/শ্মশান	ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক (পাকা/কাঁচা)
৪২টি	৪০০০টি	৪১৫২.০০	৬৫৩৭.০০	৬৭৬.৩৫ কোটি	৭০১৩	১৯৪.০০ কোটি	২৪টি	০৮টি	৪৫কিঃ মিঃ
২৬টি	৭২০টি	৫৭৫৩.০০	-	৬০.৬৫ কোটি	৩৫০০	১২৪.০০ কোটি	১১টি	২০টি	৩৩কিঃ মিঃ
২০টি	২৩২৯টি	৫,৩০০	৩৯৪				৩০টি	১০টি	৪৪.৪৬কিঃ মিঃ

ক্ষতিগ্রস্থ বাধ	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: প্রাথমিক	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদ্রাসা	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: কলেজ	ক্ষতিগ্রস্ত মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (গভীর/অগভীর)	ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার: পুকুর	ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার: ঘের/ বাওড়/ হ্যাচারী (হেক্টর)	ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি ক্লিনিকট	মৃতের সংখ্যা
০১ কিঃ মিঃ	৫১টি	৩৬টি	০৮টি	০৬টি	১০১টি	১২০টি	১৮০০০	৬০০০	২৫০০	০৮টি	০৭জন
-	২৭টি	০৮টি	০৩টি	০২টি	৪০টি	৫০টি	৪০০০	৪৫০০	৩৫০০	-	১২জন
	৭০টি	৪০টি	৩০টি	৮টি	১৪৮টি	২০৮টি	৯৮৩	১,১১৩	২,৯৪৭		৩জন

৯.১১. জলাবদ্ধ এলাকায় চলমান আর্থ-সামাজিক সংকট ও অভিঘাত

সংকট	অভিঘাত
স্যানিটেশন ব্যবস্থা নষ্ট	দূষণের বিস্তার
দুষিত জল	চর্মরোগের প্রাদূর্ভাব
জলাবদ্ধ বসতভিটা	সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের আক্রমণ
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ	পানীয় জলের সংকট
গো-খাদ্যের অভাব	গবাদি পশু কমমূল্যে বিক্রি/স্থানান্তর
জলাবদ্ধ কমিউনিটি ক্লিনিক	চিকিৎসার সমস্যা
বন্ধ স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঝরে পড়ার আশংকা
দীর্ঘমেয়াদী জল	ইরি-বোর চাষের অনিশ্চয়তা
কৃষিজ ফসল (ধান, পাট, শাক-সবজি আবাদ নষ্ট)	পেশার পরিবর্তন
জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ	দূর্নীতির মহোৎসব
ত্রাণ বিতরণ (যৎসামান্য)	সুদখোর বেসরকারি সংস্থার অনুপ্রবেশ
হাইওয়ে রাস্তায় জল ও জলযান (খুলনা-যশোর, নওয়াপাড়া-মনিরামপুর, নওয়াপাড়া-মশিয়হাটী)	পরিবহন ও যোগাযোগ সংকট, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তির আশংকা
উন্মুক্ত (জল, জলা, জলজ সম্পদ)	জলজ সম্পদ (মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি), খাস জমির দখলদার, বড় ভূ-স্বামীদের পুনঃদখল
কারেন্ট জালের বিস্তার	জলজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত
বনজ সম্পদ ধ্বংস	পরিবেশ বিপর্যয়
গবাদি পশু, মানুষ, খাবার ঘর যৌথ (রাস্তার উপর)	দূর্বল আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন
জ্বালানী সংকট	খাদ্যের অনিশ্চয়তা
কর্মহীনতা	হাহাকার
বসতভিটাসহ শেষ সম্বল নষ্ট	শহরমূখী প্রবণতা, বস্তিয়ায়নের আশংকা

৯.১২. আশু করণীয়

১। চলমান স্কেভেটর এর কার্যক্রমে গতি আনয়ন।
২। নতুন করে অধিক স্কেভেটরের এর ব্যবস্থা করা।
৩। স্কেভেটর বন্ধ না রেখে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা।
৪। উত্তোলিত পলি তীরে না রেখে দুরে অপসারণের ব্যবস্থা, ফলে নদীতে পুনরায় গড়িয়ে পড়ার হার কমবে।
৫। ভবদহের ২১ ও ৯ গেটের মাঝ দিয়ে ভবদহের উজান এবং ভাটির সরাসরি সংযোগ স্থাপন।
৬। আমডাংগা খালের সংস্কার করা।
৭। নিহালপুরের দাইয়ের খাল সংস্কার ।
৮। মনিরামপুরের দুর্বাডাঙ্গার বাকার খাল সংস্কার করতে হবে।

৯। উভয় পাশের জল প্রবাহ সংযোগের যে পুল-ব্রিজ ছিল তার উভয় পার্শ্বের প্রবাহ নিশ্চিত করা।
১০। বিল অভ্যন্তরের নিষ্কাশন খালসমূহ বাধাহীন করা।

৯.১৩. স্থায়ী সমাধান/সুপারিশ/যা ভাবতে হবে

প্রকৃতপক্ষে ভবদহের জলাবদ্ধতার সমাধান একক কোন পদ্ধতি বা কৌশলে সম্ভব না। মূলত টিআরএম এবং বাধাহীন উজানের জলপ্রবাহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাবনাগুলো হলোঃ

১। পরিকল্পিত এবং সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে পর্যায়ক্রমে এলাকার সব বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন করা।
২। টিআরএম-কে নিরবিচ্ছিন্ন করা। মূলত একটা টিআরএম শেষ না হতেই অন্যত্র তা চালু করার ব্যবস্থা করা।
৩। আমডাংগা খাল সংস্কারের মাধ্যমে সংকটের সহায়ক নিস্কাশন পথ তৈরি করা।
৪। মাথা ভংগা, ভৈরবের সাথে মুক্তেশ্বরী ও কপোতাক্ষসহ ভাটির সব নদীর অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির নিশ্চিত ব্যবস্থাপনা।
৫। জলাবদ্ধ এলাকাকে ঘিরে জল প্রবাহ সার্কেল তৈরি করা। সংশ্লিষ্ট সব নদী, খাল সংস্কার (কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক উপায়ে) এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
৬। কৃত্রিম সব বাঁধ, বাধা অপসারণ করা। প্রাচীন নিয়মে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া।
৭। মৌলিকভাবে ভূমি কৃষি, জল-জলা সংস্কার (টিআরএম চলাকলীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম)
৮। নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে জল প্রবাহ পরিকল্পিতকরণ।
৯। উজানে ব্যারেজ নির্মাণ করে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ।
১০। উজানের জলপ্রবাহ পর্যাপ্ত এবং নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের প্রশ্নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও
কার্যক্রম পরিচালনা।
১১। ভবদহ, কাটেঙ্গাঁ, জামিরা, বিল ডাকাতিয়া, আফিল জুট মিল এবং জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর মাঝ বরাবর গিলাতলা সংলগ্ন ত্রিমোহনা (ভৈরব- মুজতখালী) সংযোগ চ্যানেল তৈরি।
১২। পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাস্তবমুখী জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন।
১৩। ভূমি, কৃষি, জলা সংস্কার ।
১৪। নদী, খাল-বিলে পরিকল্পিত ও অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করা।

১০. উপসংহার

আমাদের উজানে হিমালয় আর ভাটীতে বঙ্গোপসাগর। মধ্যবর্তী পললভূমি আমাদের আবাসন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একেবারে নির্মূল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঝূঁকি কমানোর কৌশল বের করা সম্ভব মাত্র। সম্ভবত বাংলাদেশে ১২৩/১২৫টি পোল্ডার আছে। মূলত লবণাক্ততা, জোয়ার-ভাটা এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে এর জন্ম। আর জলাবদ্ধতার গোড়ার কথাও এখানে। শুধু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল নয়, পোল্ডারভূক্ত প্রায় সর্বত্র এ জলাবদ্ধতার সংকট বিদ্যমান। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে আলোচিত ভবদহ এবং ঐ সংলগ্ন এলাকায় সংকটের উত্থান, আশির দশকে বিকাশ আর সম্প্রতি এর চরম পরিণতি। প্রতি বছর মোটামুটি ২৪০ কোটি টন পলি এ ভূ-খণ্ডে উজান এবং ভাটী থেকে প্রবাহিত এবং নিপতিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশে রেইন কাট পলির বিষয়টি ভাবলে বলা যায় বন্যা এবং বৃষ্টির তারতম্যে এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এর ব্যবস্থাপনা মূখ্য বিষয়। প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে প্রকৃতির নিয়মে দিনে দুই বার (জোয়ার ভাটা) প্লাবন ভূমিতে এ পলির বিক্ষেপন যেমন ভূমি গঠন করবে, স্বচ্ছ পানি ফেরার পথে নদীর প্রবাহ সচল রাখবে। এর ব্যত্যয় হলে নদীর, খালের তলদেশ ভরাট হবে। এর প্রমাণ মাত্র দেড় মাসে ভবদহের স্লুইসগেটের ভাটিতে ১৫ কিঃ মিঃ পলি দ্বারা ভরাট হওয়া। এর বিকল্প কি? যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পলি ব্যবস্থাপনা নদীর সংস্কার তা তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশে কতটুকু সম্ভব ভাবনার বিষয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীসমূহ মূলত দক্ষিণ-পূর্বমূখী আর এর পলি ১০০% মিহি প্রায় কাঁদা যুক্ত (উল্লেখ্য দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নদী দক্ষিণ-পশ্চিমমূখী এবং তার পলি খসখসে পাথরকুঁচি যুক্ত)। প্রাকৃতিক নিয়মে এর অপসারণের জন্য জলপ্রবাহ বেগবান হওয়া জরুরি। গতি ঘন্টায় নূন্যতম ৩ কিলোমিটার। উজানের প্রবাহ বন্ধ থাকায় এটা ব্যাহত হচ্ছে। সেটি আর একটা বড় প্রশ্ন। সংকট উত্তরণে টিআরএম-ই ভরসা। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক। চূড়ান্ত সমাধানে শুধু দরকারই নয়, ভূমি কৃষি, জল, জলা, জঙ্গলে মৌলিক ব্যবস্থাপনা এবং যৌক্তিক সংস্কার নিশ্চিত জরুরি। এর জন্য চাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এর কোন বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র

১। আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬।

২। আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি জলা সংস্কার: দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে সবচেয়ে অমীমাংসিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়'।

৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

৪। কৃষক, ক্ষেতমজুর, সংগ্রাম পরিষদ, খুলনা-যশোর সমন্বয় কমিটি, 'জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিকল্প ভাবনা ও প্রস্তাবনা'।

৫। অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত, 'একটি ছোট্ট অপারেশন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম'।

৬। ফারুক আলম, 'টিআরএম অনিশ্চিত: সংকটাপন্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল'।

৭। ফারুক আলম, 'মুক্তেশ্বরী নদী'।

৮। আফসার আলী, 'ভৈরব নদের সংস্কার ও খনন: দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভবিষ্যৎ, গণ-কনভেনশনের উত্থাপিত পত্র।

৯। আশরাফ-উল-আলম টুটু, সংকলিত 'খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প'।

১০। আফসার আলী, 'ভবদহ জলাবদ্ধতা ও নিরসন প্রস্তাবনা', ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত গণ কনভেনশনে উত্থাপিত পত্র।

১১। রাজিব নূর ও মাসুদ আলম, 'ভবদহের জলাবদ্ধতার পদধ্বনি', প্রথম আলো।

১২। মাসুদ আলম, 'ভবদহের কান্না', প্রথম আলো।

১৩। হিউম্যানিটি ওয়াচ, 'ভবদহের সার্বিক পরিস্থিতি'।

১৪। বাবর আলী, 'গোলদার আপার ভদ্রা ও হরিনদী অববাহিকার জলাবদ্ধতা, পরিস্থিতি ও করণীয়'।

১৫। মাসুদ করিম ও দীপক কুমার সরকার, 'পূর্ববিল খুকশিয়ার জোয়ারাধার (টিআরএম) বাস্তবায়ন'।

১৬। হাসেম আলী ফকির, 'হরি অববাহিকায় জলাবদ্ধতায় নিরসন ও টিআরএম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রস্তাবনা'।

১৭। এম. আর খায়রুল উমাম, 'ভবদহ জলাবদ্ধতার সমস্যা এবং আমাদের করণীয়'।

১৮। প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা।

১৯। দৈনিক প্রথম আলো।

২০। দৈনিক আমাদের সময়।

২১। গ্রাফোস ম্যানের ভূচিত্রাবলী, কেজেডিআরপির প্রকল্প ম্যাপ।

২২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা। অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর (যশোর)।

২৩। ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির সভার বক্তব্য এবং যারা ভূক্তভোগী ও মতামত দিয়েছেন এমন অভিজ্ঞজন।

- ইকবাল কবির জাহিদ, রণজীত বাওয়ালী, বৈকুণ্ঠ বিহারী রায়, নাজিমউদ্দিন, জাকির হোসেন হবি, অরুণা চৌধুরী, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আঃ হামিদ গাজী, প্রভাষক সুকুমার ঘোষ, প্রভাষক জোবায়ের হোসেন, প্রভাষক চৈতন্য পাল, প্রভাষক তাপস কুমার, মহিরউদ্দিন বিশ্বাস, লিটু মন্ডল বিশ্বাস, অভিমূন্য বাওয়ালী, ইমরান হোসেন, রাকিবুল প্রমূখ।

২৪। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, 'ভবদহের জলাবদ্ধতা বাস্তবতা ও করণীয়'।

Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 265-284
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

হান্নানা বেগম*

সারকথা: *সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যানারি সভায় ২০১৫ সাল পরবর্তী জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নতুন চিন্তার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সব রাষ্ট্রপ্রধান একটি বিষয়ে একমত হন যে, জাতিসংঘই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত, সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক, বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিরা খোলামেলাভাবে উন্নয়ন বিষয়ে মতামত তুলে ধরতে পারেন, যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে পারেন। এ থেকেই সূত্রপাত ঘটে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goal-SDG) নামে পরিচিত।*

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশেষ সম্মেলনে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান এতে অংশগ্রহণ করেন। টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির এ উদ্যোগ হিসেবে সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা।

এসডিজি'র লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন (No poverty), ক্ষুধামুক্তি (Zero hunger), সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে সবার জন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ, ***জেন্ডার সমতা****, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সবার জন্য টেকসই জ্বালানি, সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান, শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, দেশের ভিতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস, মানুষের বাসস্থানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ ও টেকসই করে গড়ে তোলা, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, সমুদ্রের সুরক্ষা, ভূমির সুরক্ষা (ভূমির উপরিস্থ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ ও বন্ধ করা, ভূমিক্ষয় রোধ করা, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা, শান্তি ও ন্যায় বিচার (টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা), টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।*

* সাবেক অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা; সাবেক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে: ৫.১ সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ। ৫.২ পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ। ৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর চর্চা বিলোপ। ৫.৪ সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায়-দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ। ৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ। ৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ। ৫.৭ জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কার সাধন। ৫.৮ নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি। ৫.৯ সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা হলো সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার, বৈষম্যমূলক আইনের পরিবর্তন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো, এবং তা দেখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠসূচী ও টেক্সটবুক পর্যালোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সব স্তরে এবং নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে শতকরা ৩৩ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, আদিবাসী, গ্রামীণ সংখ্যালঘুসহ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তবে মনে রাখার বিষয়, এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

ভূমিকা

২০০০ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত United nations millinium summit-এ একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং ন্যায্য বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হয়। গৃহীত হয় ৮টি লক্ষ্য সম্বলিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। লক্ষ্য পূরণের জন্য অগ্রগতি পরিমাপের সুনির্দিষ্ট সূচক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা, এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ কমিয়ে আনা, নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যানারি সভায় ২০১৫ সাল পরবর্তীকালে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নতুন চিন্তার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সব রাষ্ট্রপ্রধান একটি বিষয়ে একমত হন যে, জাতিসংঘই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত, সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক, বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিরা খোলামেলাভাবে উন্নয়ন বিষয়ক মতামত তুলে ধরতে পারেন, তর্ক-বিতর্ক করতে পারেন। এ থেকেই সূত্রপাত ঘটে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goal-SDG) নামে পরিচিত।

UN Development Group ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে জাতীয় পর্যায়ে ১১টি কনসালটেশন সভার আয়োজন করে। যেসব ইস্যুতে সংলাপ এবং কনসালটেশন করা হয় সেগুলো হচ্ছে: অসমতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন প্রক্রিয়া, দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, ক্ষুধা, পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা, জনসংখ্যা, জ্বালানি এবং পানি সম্পদ।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ইউএনডিপি ‘A Million Voice: The World we want’ নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জাতিসংঘের ১৯৪টি দেশের ১০.৩ মিলিয়ন মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি Sam Kuesta ২০১৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে বলেন যে, এখনো বিশ্বের প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। এছাড়াও, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য আরো অনেক বেশি উদ্যোগ প্রয়োজন। এবং, এক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগ দ্বিগুণ করা অপরিহার্য।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশেষ সম্মেলনে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান এতে অংশগ্রহণ করেন। টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা।

আমাদের মনে রাখার বিষয়– সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আটটি লক্ষ্যের মধ্যে জেন্ডার সমতা একটি উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে বিবেচিত ছিল। কিন্তু, ক্ষমতায়নের রয়েছে বহুমাত্রিকতা। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত হলো তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ এবং এর অধিকার ভোগ করার সক্ষমতা। এমডিজি ক্ষমতায়নের এ বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি ছিল ধনী দাতাদের অনুগ্রহের বেড়াজালে দরিদ্র গ্রহীতাদের বন্দী করার এক রূপকল্প।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সিএসডব্লিউ-এর ৫৯তম সভায় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বান কি মুন যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাহলো, “To be truly transformative, the post-2015 development agenda must priotize gender equality and women’s empowerment. The world will never realize 100 percent of its goals if 50 percent of its people cannot realize their full potential.”

Dr. Phumzile Mambo-Ngcuka, Under-Secretary General Executive Director, UN Women বলেছিলেন, বাস্তব সত্য হল জেন্ডার সমতা রক্ষা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের

অন্যান্য অর্জনের জন্য জেন্ডার সমতা অর্জন অপরিহার্য। একই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল: আমরা যদি আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতিকে টেকসই করতে চাই তবে জেন্ডার সমতা হবে এর মৌল বিষয়।

প্রবন্ধের তিনটি অংশ

(ক) এসডিজি'র লক্ষ্য এবং এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ।

(খ) চলমান সময়ে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা- এসডিজি'র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের নীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বর্তমান কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়।

(গ) এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা।

(ক)
এসডিজি'র লক্ষ্য
জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা

এসডিজি'র লক্ষ্য

১। দারিদ্র্য বিমোচন (No poverty)
২। ক্ষুধামুক্তি (Zero hunger)
৩। সুস্বাস্থ্য
৪। মানসম্মত শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে সবার জন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ
৫। **জেন্ডার সমতা**
৬। বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
৭। সবার জন্য টেকসই জ্বালানি
৮। সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান
৯। শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
১০। দেশের ভিতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাসকরণ
১১। মানুষের বাসস্থানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ ও টেকসই করে গড়ে তোলা
১২। সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ
১৪। সমুদ্রের সুরক্ষা
১৫। ভূমির সুরক্ষা (ভূমির উপরিস্থ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ ও বন্ধ করা, ভূমিক্ষয় রোধ করা, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা)
১৬। শান্তি ও ন্যায় বিচার (টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা)
১৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

এসডিজির পঞ্চম লক্ষটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা। লক্ষ্য করার বিষয়, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী অসমতা অন্য সব অসমতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয় এর বহুমাত্রিকতার কারণে। এসডিজি'র প্রতিটি লক্ষ্য- দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশণ,

ব্যয়সাধ্য টেকসই জ্বালানি, সবার জন্য উন্নতমানের কাজ, শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, বৈষম্য হ্রাসকরণ, টেকইসই নগর ও কমিউনিটি, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিরোধ, সমুদ্রের সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব প্রত্যেকটি জেন্ডার সমতার সাথে সম্পর্কিত।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

৫.১ সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

৫.২ পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সব ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সব প্রকার ক্ষতিকর চর্চা বিলোপ।

৫.৪ সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায়-দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ।

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সব পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

৫.৭ জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কার সাধন।

৫.৮ নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫.৯ সকল পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

(খ)

চলমান সময়ে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

(এসডিজি-এর প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের নীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ, বর্তমান কার্যক্রম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ।)

জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মানবসম্পদ প্রতিবেদন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিস্ট ফোরামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নানা কারণে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে আছে এবং এগিয়ে চলেছে। এটি সম্ভব হয়েছে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন প্রায়শই তাঁর লেখায় ও বক্তব্যে বাংলাদেশের বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। আমরা জানি নারী যখন এগিয়ে যায়, তখন পরিবার, সমাজ এবং দেশও এগিয়ে যায়। নারীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে, বাধা দেয় এমন যা কিছু তা শুধু নারীকে নয় দেশের অগ্রগতিকেও ব্যাহত করে।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। এদেশের নারীরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত রাখছেন, শস্য ভাণ্ডার পূর্ণ করছেন, সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহ এবং সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছেন। দুর্যোগ মোকাবেলা করছেন। নারী নিজে স্বপ্ন দেখছেন, নারী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। নারীর এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটছে রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজ জীবনে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে।

তবে মনে রাখার বিষয়, বাংলাদেশে এ দৃশ্যের উল্টো পিঠে আছে নারীর অসহায়ত্বের, বঞ্চনার, বৈষম্যের আর নির্যাতনের ছবি। বাংলাদেশে চলমান সময়ে নারী নির্যাতন সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার বিপরীতে কাজ করছে নানা চ্যালেঞ্জ। আর চ্যালেঞ্জসমূহই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের পথে পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা।

এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের নারীনীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বর্তমান কার্যক্রম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ

লক্ষ্যমাত্রা-৫.১: সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়	কর্মসূচি	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ
• মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।	• সিডও রিপোর্ট এর কনক্লোডিং রিমার্কস এর বাস্তবায়ন। • মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সিডও অন্তর্ভুক্তকরণ।	• সিডও সনদের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন জাতিসংঘের সিডও কমিটিতে উপস্থাপন।	• নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ (সিডও)। • বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন ১৯৯৫। • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.২: পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়	কর্মসূচি	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	নীতি
• মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।	• ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা। • মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আইন, ২০১২-এর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	• ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার। • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি। • নারী পাচার নিরোধ সেল "ওমেন সাপোর্ট সেন্টার"।	• মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২। • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ২০১০) • পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২। এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন।	কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩: শিশু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতির চর্চা বিলোপ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন	• নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ২০১০) • পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ • এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন।	• ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল। • ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি	• বাল্যবিবাহ প্রবণ এলাকা সনাক্ত করা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ও স্কুলভিত্তিক প্রচারভিযান চালানো। • ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা	• স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৪: সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায় দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।	• শ্রম আইন, ২০০৬ • এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন	• শ্রম আইনের যথার্থ প্রয়োগ।	• কৃষি, গার্হস্থ্য শ্রমসহ সবক্ষেত্রে নারীদের অবদানের আর্থিক মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় আয়ে উল্লেখ করা।	• অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৫: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচারমাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।	• জেলা পরিষদ আইন ২০০০। • স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯। • স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯। • স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯	• জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। • প্রতিটি উপজেলায় ১জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন।	• রাজনীতিতে সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি। • জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যগণের উন্নয়ন কাজে অধিক হারে সম্পৃক্তি ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	• বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। • নির্বাচন কমিশন • এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৬: জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা এবং এসব কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা	• জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১। • স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১১-১৬। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• তথ্যসমৃদ্ধ ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান এবং সম্ভাব্য নতুন রোগসমূহের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।	• সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।	• স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৭: জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কারসাধন এবং তা নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।	• সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪০, ২০(১), ১৯(১), ১৯(২)। • সিডও ১৯৭৯।		• সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীদেরকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রচারণা চালানো। • ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৮: নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।	• জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১১। • জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯।		• নারীদের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহিত করা। • তথ্য ও প্রযুক্তি মেলায় নারীদের অধিকহারে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৯: সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

এটি একটি কঠিন লক্ষ্যমাত্রা। এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন নেই বললেই চলে। আবার কখনও আইন আছে; কিন্তু, সঠিক বাস্তবায়ন নেই। অথবা বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে।

(গ)

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা

সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার

সরকার বিভিন্ন সময়ে সাময়িক প্রতিবেদনে বলে এসেছে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। খুব শীঘ্রই এটি প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু, এবার বলা হয়েছে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করলে ধর্মীয় মৌলবাদ বা জঙ্গীরা বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাই সরকারকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এছাড়া আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শরীয়া আইন প্রচলিত না থাকা এবং শতকরা অন্তত ১০ ভাগের বেশি নাগরিক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সুকৌশলে এড়ানোর জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বলা হয়েছে, সরকার কুরআন বা সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কিছু করবে না।

বৈষম্যমূলক আইন

বিয়ে বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব, দত্তক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমান অধিকার দিয়ে একটি সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়নের কোন উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। সিডও প্রতিবেদনে সার্বজনীন পারিবারিক আইন অনুমোদন কিংবা বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনগুলো পর্যালোচনা ও সংশোধনে সরকারের কোন সময়সীমা বা পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

জেন্ডার সমতা সম্পর্কে অব্যাহত প্রচলিত ধারণা

উচ্চ আদালত নারীর সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু রুলিং জারি করেছে। সরকারি প্রতিবেদনে ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের রুলিং-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু, ফতোয়ার মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে মানুষকে শাস্তি দেয় তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথম বারের মত একটি জরিপ পরিচালনা করেছে যা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উদ্বেগের বিষয় হলো, নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও নির্যাতনের ঘটনা ও ধরণ বেড়েই চলেছে এবং আইনের প্রয়োগও এক্ষেত্রে দূর্বল। জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়াগুলো নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

পাচার ও যৌন শোষণ

২০১২ সালে প্রণীত পাচার দমন আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা এবং বিশেষ ট্রাইবুনাল না থাকায় পাচার ও যৌন শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

ক্ষমতার কাঠামোতে নারীর অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে। স্পীকার হিসাবে একজন নারীকে নির্বাচন, মন্ত্রী পরিষদে নারীর অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন সংসদীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ব্যক্তি ইচ্ছা বা দলীয় ইচ্ছায় এই ধরণের গৃহীত পদক্ষেপ স্থায়ী হবে না। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, রাজনৈতিক দলের সকল নীতি নির্ধারণী সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব, নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ এসবই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ নারী আন্দোলনের ফলে স্থানীয় সরকারের সব পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনে বিপুল সংখ্যক তৃণমূলের নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এখন পর্যন্ত একদিকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। অন্যদিকে, দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে আরো শক্তিশালী, জেন্ডার সংবেদনশীল ও কার্যকর সহায়ক করতে হবে।

বাজেট

বাজেটে নারীর জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়, শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় কি-না, হলেও নারীর উন্নয়নে তা কতটুকু প্রভাব ফেলে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা জানি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তা থেকে ৩৪ কোটি টাকার বেশি ছাড় করা হয়নি।

বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি তার ব্যবহার নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ কম নয়। তাই আমরা আশা করবো, নারীর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা যেন যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় এবং সেটা দেখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ প্রক্রিয়া ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবই পর্যালোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

কর্মক্ষেত্র

আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে এখনও নিম্নমানের কর্মপরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত নারী

প্রতিবন্ধী নারীর সংখ্যা, অবস্থা কিংবা তাদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে কোন জেন্ডার বিষয়ক তথ্য উপাত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

গত ২৪ নভেম্বর ২০১৬ সরকার বিয়ের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স হওয়ার শর্ত রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' অনুমোদন দিয়েছে। বিশেষ প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশ নিয়ে এবং বাবা-মায়ের সমর্থনে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও বিয়ের সুযোগ রাখা আছে এই আইনে।

অভিবাসী নারী

অভিবাসী নারীদের সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্তের অভাব রয়েছে। এটি হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮

জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সব স্তরে এবং নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে শতকরা ৩৩ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করার প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, আদিবাসী, গ্রামীণ সংখ্যালঘুসহ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

শেষের কথা

জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। আমাদের দেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সূচকে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে নারীসমাজের অভূতপূর্ব জাগরণ ও ক্ষমতায়ন নিঃসন্দেহে বড় একটি ভূমিকা রেখেছে। এর নেপথ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও নারী আন্দোলনের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। তবে এতে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই, কারণ সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলোকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই। আমাদের আইনি বৈষম্য ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনে অবশ্যই আরও অগ্রসর হওয়া দরকার। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, সব রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র সবাইকেই নারী মানবাধিকার নিয়ে সচেতন হতে হবে। গণতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়ন একে অন্যের পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ হয় অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে যাতে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারেও আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। সব স্তরে নারীর যথাযোগ্য

প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নেয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সম্পত্তিতে এবং রাজনীতিতে নারীর সমঅধিকার তথা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। এটি নারীর মানবাধিকার। এই মানবাধিকার বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এসডিজির সার্বিক সফলতা। এ ক্ষেত্রে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

তথ্যসূত্র

- টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ, হান্নানা বেগম, প্রকাশক: উন্নয়ন কথা, নভেম্বর, ২০১৪।
- নারীর সমঅধিকার: মহাজোট সরকারের উদ্যোগ ও আগামীর সুবর্ণরেখা, হান্নানা বেগম, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০১৩।
- টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ; হান্নানা বেগম, স্মারক বক্তৃতা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২৩ এপ্রিল ২০১৫।
- উন্নয়ন পদেক্ষেপ-মার্চ ১ম সংখ্যা ২০১৬, মে, দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৬, স্টেপস্ টুয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১।
- জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, হান্নানা বেগম, প্রকাশক উন্নয়ন কথা, নভেম্বর ২০১৪।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 285-296
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

নারী নিগ্রহ, ন্যায্যতার সংকট এবং নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক*

সারকথা: *মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎসমূলে নারীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজের নারী-পুরুষ সবারই নিজেকে বিকশিত, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করে গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। কিন্তু, নারী তার পরিবারে, সমাজে এবং দেশে-বিদেশে বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্বীকার এবং প্রায়শ তার প্রাপ্য অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। নারীর প্রতি জবরদস্তি, হয়রানি, মানসিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিবার ছাড়াও রাস্তাঘাটে, বাজার-শপিং মলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে (ইন্টারনেটে, মোবাইলে) সংঘটিত হওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নারী ও মেয়ে শিশুরা যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা ও ধর্ষণের শিকার হন। নিরাপদে পথ চলতে নারীকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়া যথেষ্ট কঠিন। কর্মক্ষেত্রেও নারী তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। আর্থিক সক্ষমতার বিচারে ব্যক্তি মালিকানার অর্থনীতিতে পারিবারিক অর্থ-সম্পদে নারীর মালিকানা খুবই কম। ব্যাংক, বীমায় নারীর প্রত্যাশিত অভিগম্যতা নেই। সঞ্চয়-বিনিয়োগে স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। এসব কারণে নারীর অসহায়ত্ব বেশি। অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে নারীর মুক্তি যতদিন না অর্জিত হবে, নারীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করার প্রয়াস ততদিন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা ও নারীর জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি, সুসংহত এবং কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজন।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কারো প্রতি কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণে আইনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সংবিধান, আইন, ধর্মীয় অনুশাসনের উপস্থিতি সত্ত্বেও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশিতভাবে বদলায়নি। নারীর সুরক্ষার বিষয়টি পুরুষের (এবং সমাজের) চেতনায়, ধারণায়, জ্ঞানে, বিশ্বাসে, কর্মে ও জীবনচর্চায় স্থায়ী ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হলে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। যৌন হয়রানি, ধর্ষণ প্রতিরোধে অপরাধীকে আইনের

* উপ-সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার ও দণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। কেননা, বিচারহীনতা অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন, মর্যাদা বোধের উন্নয়ন, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। অনেক নারী পরিবারের সদস্য দ্বারা নির্যাতনের অথবা সহিংসতার স্বীকার হন। সে কারণে এ ধরনের পরিবারকে আগে নির্যাতনমুক্ত করা প্রয়োজন। নারীর মর্যাদা দানের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা পরিবার থেকেই অর্জন করতে হবে।

১. ভূমিকা

মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষে ব্যবধান নেই। মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎসমূলে নারীর অবস্থান সুদৃঢ়। নারী ব্যতীত পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ কল্পনা করা যায় না। তাই, সমাজের নারী-পুরুষ প্রত্যেক মানুষের নিজেকে বিকশিত, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করে গড়ে তোলার সর্বজনস্বীকৃত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার কোনো সমাজের বা দেশের নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিকভাবে যে কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য। সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সব মানুষ নিঃশর্ত ও বাধাহীনভাবে মৌলিক অধিকারসহ আত্মবিকাশের সকল অধিকার ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন ঘটলে তা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হয় এবং দেখা দেয় ন্যায্যতার সংকট। মানবাধিকারের ধারণাটি মানুষের স্বীকৃতি আর চর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক সত্তাকে ঘিরে উৎসারিত, অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসেবে একজন নারী তার নাগরিকত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করার দাবিদার। তাই তার আত্মবিকাশের সুযোগ অবারিত করার পাশাপাশি ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকারও নিশ্চিত করা জরুরি। এই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের, অন্যান্য ব্যক্তি (নারী কিংবা পুরুষ), পরিবার, পরিবারের সদস্য ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। বাস্তবে, নারী তার পরিবারে, সমাজে, দেশে-বিদেশে বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্বীকার এবং প্রায়শ তার প্রাপ্য অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। এ ধরনের অন্যায্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদের অভাব যে নিপীড়নমূলক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সহসা তা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয় না।

২. সংবিধানে নারী অধিকারের নিশ্চয়তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে বলা হয়েছে: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (অনুচ্ছেদ ১০)। আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমতা বিধানের জন্য বলা হয়েছে যে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭)। ধর্ম প্রভৃতি কারণে নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসনের নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন (অনুচ্ছেদ ২৮.২)। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৩)। সরকারি নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে

(অনুচ্ছেদ ২৯.১)। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৯.২)।

৩. নারীর ন্যায় বিচার ও অধিকার সংরক্ষণে আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হবার ফলে স্বাধীন দেশে নারী মুক্তির পথ সুগম হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীবর্ষ ঘোষিত হলে বিভিন্ন দেশে নারীবান্ধব কার্যক্রম সক্রিয় হতে শুরু করে। ১৯৭৬-১৯৮৫ সময়কালকে নারীদশক ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকারের বিষয়গুলো অনেকের নজরে আসে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রয়াসে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়, কালক্রমে তা জাতীয় মহিলা সংস্থা হিসেবে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন করেন। বর্তমানে নারীদের কল্যাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণে আইনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রচলিত আইনে নারীর কি কি আধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা সবার জানা প্রয়োজন। কোন নারী যদি নির্যাতনের স্বীকার হন সেক্ষেত্রে তার জন্য সুনির্দিষ্ট কি কি প্রতিকার রয়েছে সে সম্পর্কে তার অথবা তার পরিবারের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। কেননা, তথ্য বা ধারণার অভাবে প্রতিকার প্রাপ্তি বিলম্বিত অথবা অসম্ভব হতে পারে। নারী আধিকার সম্পর্কে দেশে প্রচলিত আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, মুসলিম বিয়ে বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধিমালা ১৯৭৫, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এবং নারীর অনুকূলে আইন-বিধি ও নীতিমালার মধ্যে সিডও সনদের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

৪. ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম ধর্মে নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদাসহ মানুষ হিসেবে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইসলামে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নারীরা মানুষ, তাদের কোন অপমান গ্রাহ্য করা হবে না, এটা নিন্দার্হ, কেননা তারা পুরুষের পরিপূরক এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নের অংশীদার। নারীর মর্যাদা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, কন্যা সন্তান ভাগ্যবানদের জন্য এবং কোনো পুরুষের ভালো হওয়াও তার স্ত্রীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। দাম্পত্য জীবনে স্বামী তার স্ত্রীর সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে দায়িত্ব পালনে চুক্তিবদ্ধ।

৫. নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের কিছু তথ্য

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চাকরি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতি, সেনা, নৌ, বিমান, আনসার, পুলিশ, প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক, গবেষক ইত্যাদি পেশায় সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপরও এখন পর্যন্ত যেভাবে সব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেভাবে তা ঘটেনি। কারণ, নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়ায় সমাজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে পারেনি। আর সেজন্যই নারীকে দমন, পীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। নতুন নতুন কৌশলে নারী নির্যাতনের চেষ্টা চলছে। নারীর প্রতি জবরদস্তি, হয়রানি, মানসিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিবার ছাড়াও রাস্তাঘাটে, বাজার-শপিং মলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে (ইন্টারনেটে, মোবাইলে) সংঘটিত হওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নারী ও মেয়ে শিশুরা যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা ও ধর্ষণের শিকার হন। সমাজে দৃশ্যমান কিছু সংকট যেমন বখাটেদের উৎপাত, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, গণধর্ষণ ও খুন পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান জরুরি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোহাগী জাহান তনু ২০ মার্চ ২০১৬ রাতে নৃশংষভাবে খুন হন। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী। কুমিল্লা সেনানিবাসের পাওয়ার হাউস এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তনু হত্যার প্রতিবাদে এ ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সারা দেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেন। দেশের ১৪টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আট বছরে ধর্ষণের শিকার ৪৩০৪ জনের মধ্যে ৭৪০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৮ সালে ধর্ষণের শিকার ৩০৭ জনের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ১১৪ জনকে। ২০০৯ সালে ধর্ষণের শিকার ৩৯৩ জনের মধ্যে ১৩০ জন, ২০১০ সালে ধর্ষণের শিকার ৫৯৩ জনের মধ্যে ৬৬ জন, ২০১১ সালে ধর্ষণের শিকার ৬৩৫ জনের মধ্যে ৯৬ জন, ২০১২ সালে ধর্ষণের শিকার ৫০৮ জনের মধ্যে ১০৬ জন, ২০১৩ সালে ধর্ষণের শিকার ৫১৬ জনের মধ্যে ৬৪ জন, ২০১৪ সালে ধর্ষণের শিকার ৫৪৪ জনের মধ্যে ৭৮ জন এবং ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার ৮০৮ জনের মধ্যে ৮৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় (প্রথম আলো, মঙ্গলবার ২৯ মার্চ ২০১৬)। একই উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিএনডব্লিউএলএ জানাচ্ছে, ২০১০ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের পর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ৪৪২৭টি। এর মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে ২৭৩৪টি। গত ছয় বছরে ধর্ষণের পর পাঁচ শতাধিক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। তবে হত্যা করার পর সব পরিবার মামলা বা আইনি আশ্রয় নেয়নি। এর মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ২৮০টি ঘটনার। আর ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ১৬৮ নারী এবং মামলা হয়েছে মাত্র ১১৩টি।

বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, (জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে) ২০০১ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হন ১৮১ জন গৃহকর্মী। তাদের মধ্যে ধর্ষণের পর মোট কতজনকে হত্যা করা হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান জানা না গেলেও সংগঠনটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার ১১ জনের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ৪ জন গৃহকর্মীকে।

দেশে ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ৫৫টি জেলায় নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্র্যাকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ৬৮ শতাংশই নথিভুক্ত হয় না। নারী নির্যাতন নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) করা "ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে" ২০১১ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্বামীর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হন দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের মোট মামলা ছিলো ১৭৭৫২টি। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২১২২০টি (প্রথম আলো, বুধবার ৩০ মার্চ ২০১৬)। স্থানীয়ভাবে নারী নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায় দিনাজপুরের ৮টি উপজেলার আদালতে দায়েরকৃত মামলার তথ্য বিবরণীতে (সারণি-১)।

সারণি-১

জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় নারী নির্যাতনের তথ্য

ক্রমিক	প্রকৃতি	সংখ্যা
০১	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৬৮
০২	জোর পূর্বক অপহরণ	২০
০৩	অপহরণ, মুক্তিপণ ও ছবিতোলা	০৭
০৪	প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ	০২
০৫	যৌন নিপীড়ন	১২
০৬	আটক ও মুক্তিপণ	০১
০৭	জোরপূর্বক ধর্ষণ	৩৮
০৮	অপহরণ ও ধর্ষণ	০৩
০৯	ধর্ষণ চেষ্টা	২০
১০	অপহরণ ও সহায়তা	১৫
১১	নারী পাচার	০১
১২	যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা	০৫
১৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতনে মৃত্যু	০২
১৪	শিশু পাচার	০১
১৫	শরীরে গরম দুধ ঢেলে দেয়া	০১
১৬	এসিড নিক্ষেপ	০১
১৭	বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ	০৬
১৮	জোর পূর্বক ধর্ষণের পর খুন	০১
১৯	মারপিট করে হত্যা	০১
২০	পর্ণোগ্রাফিসহ ধর্ষণ	০১
	সর্বমোট	২০৬

উৎস: পল্লী শ্রী, দিনাজপুর কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

নারী নির্যাতনের এই ঘটনাগুলো আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ। লিপিবদ্ধ নয় এমন নির্যাতনের চিত্র জনসাধারণের অগোচরে রয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনা। পত্রিকায় এ ধরনের খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বখাটে কর্তৃক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর ফেসবুকে ভিডিও প্রকাশ করা, ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে

আসা-যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করা, হোটেলে নিয়ে তরুণীর শ্লীলতাহানি করে মোবাইল ফোনে ভিডিওচিত্র ধারণ করে সেগুলো ফেসবুকে দেয়া, স্বামীর হাত পা বেঁধে স্ত্রীকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মিলে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা করে খালের ঝোপের ভিতরে ফেলে রাখা ইত্যাদি খবরের সাথে অনেকেই কম-বেশি পরিচিত।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার উপর একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী গত ১০ মাসে রাঙ্গামাটিতেই ৩৩টি আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ১টি ধর্ষণের পর হত্যা, ৯টি ধর্ষণ, ৭টি গণধর্ষণ, ২টি শারীরিক লাঞ্ছনা, ১২টি ধর্ষণ চেষ্টা ও ২টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা বিদ্যমান থাকলেও নারীর যৌন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন।

৬. নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও ন্যায্যতার সংকট

দেশ-কালভেদে নারী-পুরুষের প্রেম, ভালোবাসা, যৌন সম্পর্ক, বা যৌনাচার বিষয়ে সমাজ যা অনুমোদন করে তা মান্য করাই সদাচার। সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, প্রচলিত আইন এ ধরনের সামাজিক অনুমোদনের ভিত্তি। কোনো দেশের নাগরিকের জন্য প্রচলিত আইন, ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসন প্রতিপালন করা অপরিহার্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক। সমাজে এ ধরনের অনুশাসনের কার্যকারিতাকে ন্যায্যতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায়। তাই সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারীকে যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, ধর্ষণকে নীতি ও ন্যায্যতার সংকটরূপে বিবেচনা করা যায়। আইন না মানার প্রবণতা এবং বিচারহীনতা ন্যায্যতার সংকটের ফলস্বরূপ।

৬.১ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা

পৃথিবীর অনেক দেশে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, অবহেলা, দমন-পীড়ন, অপহরণসহ যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, নির্যাতনের পর হত্যা ইত্যাদি ঘটনার ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়। নারীত্ব ও সৌন্দর্য নারীর নিজস্ব সম্পদ। নারীর ব্যক্তিত্ব থেকে তাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, এই সৌন্দর্য তার মহাবিপদের কারণ হয়ে উঠবে কোনো সচেতন মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথচ, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে অনেকে আত্মবিস্মৃত পর্যন্ত হন। অন্যায়ভাবে নারীত্বকে অসম্মান করতে, নিজের অধিকারে অথবা নিয়ন্ত্রণে আনতে, নারীকে সম্পদে কিংবা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতে গিয়ে দুর্বৃত্তরা নারীর ব্যক্তিসত্তা, অধিকার, স্বাধীনতা ও পছন্দের কথা বিস্মৃত হন এবং তাদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত আইন ভঙ্গ করে নারীর প্রতি অবিচার ও নির্যাতন, অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, এমনকি খুন পর্যন্ত করে ফেলেন। এরপর যখন অপরাধীর বিচার কিংবা দণ্ড নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, তখন ভুক্তভোগীর অসহায়ত্ব ও হতাশার কোন শেষ থাকে না।

৬.২ নারীর প্রতি পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা

নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতন এদেশে নতুন বিষয় নয়। এই সহিংসতা ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহর-গ্রামে, শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান। পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর উপর শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক নির্যাতনের ঘটনা বহুকাল ধরে ঘটছে। বর্তমানেও এ

ধরনের ঘৃণ্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মঞ্জুরের কথা মনে করা যায়। মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী এই নারী দীর্ঘদিন ধরে বেকার স্বামীর নির্যাতন সহ্য করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয়েছিল। এভাবে কত নারী দিনের পর দিন স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, তার কয়টির আইনি সমাধান হয়েছে বা হবে অথবা এভাবে কোন ভয়ংকর পরিণতির মধ্যে দিয়ে কত জীবনের অবসান হয়েছে বা হবে, তার সব খবর জানা যাবে না। নারীর প্রতি ঘটমান নৃসংশতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা, জনসমক্ষে গাছে বেধে নির্যাতন, যৌতুকের জন্য পিটিয়ে হত্যা, চলন্ত বাসে নারী যাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা সভ্যতার অগ্রগতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

৬.৩ নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনো প্রত্যাশিতভাবে বদলায়নি। একজন নারী যদি কোনো পুরুষকে বাধতে না পারেন তাহলে তিনি যথেষ্ট নারীই নন এমন বিদ্রুপ নারীর প্রতি তার অজান্তেই আরোপিত হয়। বিয়ের জন্য পাত্রী পছন্দের বেলায় অধিকাংশক্ষেত্রে বরপক্ষ মেয়েটির বাহ্যিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়, আর অল্প ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় তার গুণ। তালাকপ্রাপ্ত নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো নেতিবাচক। কারণ যাই হোক, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে আড়ালে কেউ কেউ স্বামীর ঘর করতে পারেনি বলে উপহাস করতে ছাড়েন না। একইভাবে বিধবা নারীদেরকে সমাজ শুভ দৃষ্টিতে দেখে না। নির্যাতনের মুখে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা নারীরও ভাগ্যে কটাক্ষ ছাড়া ভালো কিছু জুটে না। স্বামীর ঘর করতে পারেনি বলে তাকে নানা অপবাদ শুনতে হয়। বিয়ের পর কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে মেয়েকে অলক্ষণা বলে দোষ দেয়া হয়। এসব ঘটনা যে শুধু নিরক্ষর, হতদরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। সমাজের অগ্রসর ও সচেতন মানুষের দলে যাদের নাম তাদের কারো কারো মধ্যেও রয়েছে নারীর প্রতি এ ধরনের অনেক অযৌক্তিক, বিরূপ ধারণা এবং নেতিবাচক মনোভাব। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা নারীর প্রতি সুবিচারের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘকালীন, সুসংহত এবং কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন প্রয়োজন। নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু, তা নিশ্চিত করা সমাজের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সমাজ নারীর প্রতি নানা প্রকার অবিচার করে। দেশের যৌনপল্লীগুলোতে অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক যৌনকর্মীর সংখ্যা বেশি। মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো। কিন্তু, এর চেয়ে কমবয়সী মেয়েরও বিয়ে হচ্ছে। মেয়ে শিশু পাচারসহ তাদের দিয়ে অন্যায্য অনেক কাজই করানো হয়। সামাজিক কাজকর্মে নারীর পারিশ্রমিক পুরুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। গৃহকর্মে নিযুক্ত নারীর কাজের পারিশ্রমিক হিসাব করার রীতি নেই। বিয়ের পর স্ত্রীর মোহরানা স্বামী কর্তৃক পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হলেও অনেকে তা করেন না। এই ব্যাপারে স্বামীর পরিবার তা আদায় করে দিতে সহযোগিতা করতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু, স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করার জন্য অনেকেই চতুরতার আশ্রয় নেন। যৌতুক আদায়ের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ বিশেষ করে, পাত্রের পরিবারের সদস্যরা অতি উৎসাহী ও তৎপর হলেও নববধূর মোহরানা পরিশোধের ক্ষেত্রে তারা অবিশ্বাস্যভাবে উদাসীন থেকে যান।

৬.৪ সংস্কৃতি ও চিত্রজগতে নারীর অবমূল্যায়ন

আধুনিক সংস্কৃতির বিস্ময়কর উৎকর্ষের যুগেও নারীর অধিকার হরণে অনেকে তৎপর। সাধারণভাবে একই ধরনের কাজে নারীর মজুরি পুরুষের চেয়ে কম বা সমান। কিন্তু, ম্যাক্সিকান অভিনেত্রী সালমা হায়েক এর

কথায় “একমাত্র পর্ণ ছবিতেই নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেয়ার চল রয়েছে।” চিত্র জগতে নারীর উপর নিপীড়ন নিয়ে বিশেষ প্রতিবাদ হয় না বলে তিনি মনে করেন। রূপালি পর্দায় নারীর অভিনয় দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার চেয়ে শরীর এবং শরীরী ভাষা উপস্থাপনকে একটি বাণিজ্যিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যাতে দর্শকেরা বিমোহিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে অনেকাংশে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে প্রায় সবাই পরস্পরের শুভকামনা করেন। অথচ, এমন দিনেও ঘটে ঘটেছে টিএসসিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা- যেখানে একজন নারীকে অগণিত মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কতিপয় দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। সংস্কৃতি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক এবং এটি মানব সত্তার সুকুমার বৃত্তিকে শাণিত করে। কিন্তু, কেবল আনুষ্ঠানিকতাই মানুষের প্রকৃত সংস্কৃতিবান হওয়ার প্রমাণ নয়। একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, মনোভাবের পরিবর্তন ও অনুশীলনের দ্বারা মানুষকে মনে-প্রাণে সংস্কৃতিবান হতে হয়। ফলে, সংস্কৃতিবান মানুষ এ ধরনের গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হন এবং সমাজের অন্য নাগরিকের চিন্তা চেতনার উপরও তার ধনাত্মক প্রভাব পড়ে।

৬.৫ কর্মক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা

একজন পুরুষ ঘরের বাইরে বেশ নিশ্চিন্তেই চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু, একজন নারী তা পারেন না। নিরাপদে পথ চলতে নারীকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। পথে-ঘাটে কোথায় কোন উপদ্রপ নারীর জন্য ওঁৎ পেতে থাকে তা কেউ জানে না। এজন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন এবং সতর্কতার। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কর্মক্ষেত্রেও নারী তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পারেন। নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা এক্ষেত্রে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীরা যাতে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, নিগৃহীত, অপদস্থ না হন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এর “২৭এ” অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারী নারী সহকর্মীর প্রতি কোনোভাবে এমন কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করতে পারবেন না, যা অনুচিত এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদা হানি হয়।

৬.৬ নারীর অর্থনৈতিক বঞ্চনা

অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত নারী নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মৃদু প্রতিবাদের সাথে অথবা বিনা বিবাদে সংসারে মানিয়ে চলার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ বঞ্চনা তাকে অল্পে তুষ্ট থাকতে প্রেরণা যোগায়। এক্ষেত্রে ন্যায্যতার প্রশ্নটি প্রাধান্য পায় না। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রকৃত রূপ যুগ যুগ ধরে অনুদঘাটিত থেকে যায়। দুঃখ করে কেনো কোনো নারীকে বলতে শোনা যায়, তার/তাদের নিজের কোনো বাড়ি নেই। তার বাপের বাড়ি, ভাইয়ের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, স্বামীর বাড়ি, ছেলের বাড়ি আছে। যিনি সারা জীবন গৃহসেবা করেন তার নিজেরই গৃহের অভাব! গৃহিণীই গৃহের মালিক সেই স্বীকৃতি আজও সমাজে নেই। অধিকাংশ নারীর জীবনে এরকম উপলব্ধির বাস্তবতা রয়েছে। আমাদের সমাজে খুব কম সংখ্যক নারীর নিজের নামে বাড়ি আছে। ব্যক্তি মালিকানার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পারিবারিক অর্থ-সম্পদে নারীর মালিকানা স্বল্প। ব্যাংক, বীমায় নারীর অভিগম্যতা কম। সঞ্চয়-বিনিয়োগে স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। এসব কারণে নারীর অসহায়ত্ব বেশি। নারীর কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করা গেলে

নারীর এই অসহায়ত্ব কমত। আইন অনুযায়ী একজন নারীর পিতা এবং স্বামীর সম্পদে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। পারিবারিক বিষয়-সম্পদে নারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। বাস্তবে অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে নারীর মুক্তি যতদিন অর্জিত না হবে, নারীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ততোদিন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

৭. নারী নিগ্রহ কমলে কল্যাণ বাড়বে

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় প্রচুর মামলা হয়। ঐ মামলা পরিচালনায় বাদি ও আসামী/বিবাদিদের যে সময় ব্যয় হয় তার আর্থিক মূল্য কম নয়। ঐসব মামলা পরিচালনায় সরকারের উল্লেখযোগ্য সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। মামলায় যারা জড়িত হন তাদেরও আদালতে উপস্থিতির জন্য প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হয়। আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও সংশ্লিষ্টদের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এসব খরচ, সময় ও ভিজিট কমানো গেলে জাতীয় অর্থনৈতিক সুবিধা ও কল্যাণ বাড়বে।

৮. প্রতিকারের উপায়

একটি যৌতুকমুক্ত সমাজ, বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ এবং নারী নির্যাতন মুক্ত বিশ্ব এখন সময়ের দাবি। নারীর বঞ্চনা- বৈষম্যের দায় কখনো পুরুষ, কখনো ধর্ম, কখনো শ্রেণি, কখনো সরকার, কখনো আইন-শৃঙ্খলার অভাব, কখনো প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু, বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কারো উপর নারী বঞ্চনার অভিযোগের দায় চাপিয়ে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। নারীর সুরক্ষার বিষয়টি পুরুষের (এবং সমাজের) চেতনায়, ধারণায়, জ্ঞানে, বিশ্বাসে, কর্মে ও জীবনচর্চায় স্থায়ী ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হলে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে এবং নারীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। যৌন হয়রানি, ধর্ষণ প্রতিরোধে বখাটেদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার, বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সুবিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত আইনি সুরক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, দেশে প্রচলিত আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগতি, বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি নারীর নাগরিক হিসাবে আইনি সহায়তা গ্রহণের সাহস, প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। কিন্তু, অনেকে টাকা-পয়সার অভাবে, ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন না থাকায় নির্যাতিত হলেও থানায় গিয়ে অভিযোগ করে আইনি সহায়তা গ্রহণে সক্ষম হন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা গ্রহণে কালক্ষেপণ ও অহেতুক হয়রানির ঘটনাও ঘটে। মামলা হলেও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মামলা দুর্বল হয়। বাদী-বিবাদীর মধ্যে মামলা চলাকালীন সময়ে আপোষ মিমাংসা হয়ে যাওয়াও একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রে বিচার প্রার্থীর আর্থিক সামর্থ্য ও লোকবলের অভাবে মামলা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা বা বিচার পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার ঘটনাও বিচার প্রার্থীকে নিরুৎসাহিত করে। আবার কখনো অপরাধী কোন প্রভাবশালীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ের কারণে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। এসব কারণে অপরাধীরা বিচারের আওতার বাইরে থেকে পুনর্বার অপরাধে লিপ্ত হয়। ফলে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। অপরাধী যেই হোক, তাকে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা যেতে পারে। নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরস্পরকে সম্মান করার ও মর্যাদা দানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ উভয়ের পোশাক ফ্যাশনে পরিমিতি বোধ, রুচিশীলতা ও শালীনতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বন্ধু নির্বাচনে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করা জরুরি। ছেলে-মেয়েদের বাড়ির বাইরে চলাফেরার সময় তাদের অবস্থান ও সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কে বাবা-মায়ের অবশ্যই ভালো ধারণা রাখতে হবে। পিতা বা স্বামী হিসেবে নিজ মেয়ে বা স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সব কাজে আইনের প্রতি অনুগত থাকার চর্চা করতে হবে। নারী শিক্ষার অগ্রগতি নারীর মর্যাদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

৯. উপসংহার

বিচারহীনতা অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। একটি সুখী পরিবার, সভ্য সমাজ, উন্নত দেশ গড়তে হলে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরি। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন, মর্যাদা বোধের উন্নয়নের মাধ্যমে তা করা যায়। সামাজিক দায়িত্বশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপরাধীর শাস্তি বা দণ্ড কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অনেক সময় নারী তার পরিবারের সদস্য দ্বারা নির্যাতনের অথবা সহিংসতার স্বীকার হন। তাই সে সব পরিবারকে আগে নির্যাতনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও সুবিচার করার চর্চা বিদ্যমান থাকলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা যাবে। নারীর মর্যাদা দানের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিজ নিজ পরিবার থেকে অর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

অমর্ত্য সেন, নীতি ও ন্যায্যতা, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৩)। (বাংলা সংস্করণ সম্পাদনা, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রাণা)।

গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি (ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬)।

মোঃ মোস্তফা কামাল (সম্পাদক), মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (ঢাকাঃ পানকৌড়ি প্রকাশন, ১৯৯৪)।

মুহম্মদ সাইফুল আলম, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক নিরোধ আইন (ঢাকাঃ ১৯৯৫)।

বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (ঢাকাঃ ১৯৯৬)।

————, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

————, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।

মোঃ আব্দুস সালেক, প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার (বগুড়াঃ ২০০০)।

সুলতানা কামাল, নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি (ঢাকাঃ ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ২০১০)।

দৈনিক প্রথম আলো, বিভিন্ন সংখ্যা।

দৈনিক সমকাল, বিভিন্ন সংখ্যা।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 297-304
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

চিকুনগুনিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি: আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এর অভিঘাত এবং কিছু নৈতিক প্রশ্ন

মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারকথা: *চিকুনগুনিয়া আমাদের দেশে প্রায় মহামারী আকার ধারণ করেছিল। এখনও আছে, তবে শুষ্ক মৌসুম শুরু হয়েছে বলেই কিছুটা কম। এ রোগে মৃত্যু হার অপেক্ষাকৃত কম হলেও, স্বাস্থ্যহানির আশংকা অত্যন্ত বেশী। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মানব পুঁজির ক্ষতির ঝুঁকি খুবই বেশী। বর্তমানে এ রোগটি ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে চিকুনগুনিয়ার আবির্ভাব এবং লক্ষণসমূহ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ডেঙ্গুর অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতে চিকুনগুনিয়া বহু বছর যাবত থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কেন এ রোগটি প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হলো না সেটি এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, এ রোগের স্থায়ী প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।*

ভূমিকা

চিকুনগুনিয়া একটি সংক্রামক রোগ। ১৯৫২ সালে প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের তানজানিয়াতে এ রোগটি ধরা পরে। সে কারণে এর নামটি এসেছে ঐ দেশটির মাকুন্দি জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত কিমাকুন্দি ভাষা থেকে। চিকুনগুনিয়ার অর্থ হচ্ছে "কুঁচিত হওয়া" বা "বাঁকা হয়ে যাওয়া"। আমাদের দেশে এ রোগটি প্রথম ধরা পরে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ঢাকার দোহারে এটি লক্ষ্য করা গেলেও এরপর আর এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। দীর্ঘদিন পর ২০১৭ সালের প্রথমদিকে সারা দেশে, বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীতে এ রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একটি বেসরকারি সংস্থার হিসেব মতে সারা দেশব্যাপী বারো লক্ষাধিক মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে মহামারী না বললেও প্রায় মহামারী বলা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এ রোগটির বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের একটি উদ্যোগ নিয়েছি এবং এর ভিত্তিতে কীভাবে আমাদের দেশকে চিকুনগুনিয়ামুক্ত করা যায় সে বিষয়ে আমাদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দেশকে চিকুনগুনিয়ামুক্ত করার প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে:

১। এ রোগটির প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করা;
২। প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা।

তথ্য পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় তথ্য মূলত প্রাথমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটের সাহায্য নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণে মূলত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। মোট ২০ জনের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার পরিধি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও সারা দেশের ও বিভিন্ন বয়স গ্রুপ এবং জেলার প্রতিনিধিত্বমূলক। সময় ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে বড় আকারের নমুনা নেয়া সম্ভব হয়নি। আর আমরা তা চাইও নি। কারণ আমরা মনে করি যা পেয়েছি তাতে মোটামুটি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা যায়।

চিকুনগুনিয়ার কারণ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

চিকুনগুনিয়া ভাইরাসবাহিত সংক্রামক রোগ। কারণ, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস যাকে সংক্ষেপে চিকভি (CHIKV) বলা হয়। এ ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে ছড়ায় মূলত দু'ধরনের মশা: এডিস আলবোপিকটাস (Aedes albopictus) এবং এডিস এজিপটি (aegypti)। এরা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। বেশ কিছু পশু-পাখীর মধ্যেও এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। অনেক সময় চিকুনগুনিয়াকে ডেঙ্গু ও জিকা জ্বরের সাথে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ প্রাথমিক লক্ষণগুলো প্রায় একই রকম। তবে পরবর্তী লক্ষণ দিয়ে একে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। একবার সংক্রমণ হলে পরবর্তীতে কামড়ালেও আর হবে না। শরীরে এন্টিবডি তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে এমন হয়। এ রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রতি হাজারে ১ জন মাত্র। তবে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর মত ঘটনা ঘটতেও পারে।

এবারে আমরা আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করবো। আক্রান্তদের জিজ্ঞাসাবাদে আমরা মোট ১৯টি লক্ষণের সন্ধান পেয়েছি (সারণী-১)। সারণী-১ এ উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী ১৯টির মধ্যে ৬টি লক্ষণ সবার মধ্যেই ছিল (১০০.০)। এগুলো যথাক্রমে ১০৩-১০৫ জ্বর, হাত-পাসহ গোটা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, হাত-পা ফোলা, গিরায় গিরায় ব্যথা, খাবারে অরুচি ও ভয়ানক ক্লান্তি। বাকীগুলো কারো হয়েছে কারো হয়নি। যেমন ২৫.০% রোগী বলেছে তাদের গায়ে র‍্যাস উঠেছে, ১০.০% বলেছে সমস্ত শরীর কালো হয়ে গেছে, ৬০.০% বলেছে প্রচণ্ড কোমর ব্যথার কথা, ১৫.০% ডান এর তুলনায় বাম হাত-পায়ের বেশী ব্যথার কথা, ০৫.০% উল্টোটা, অর্থাৎ বামের তুলনায় ডানের ব্যথা বেশী, ৬৫.০% হাত-পা জ্বলা ও চুলকানোর কথা বলেছে, ০৫.০% মুখে, ঠোঁটে ও জিহবায় ঘা এর কথা বলেছে, মাথার চুল পড়ার কথা বলেছে ০৫.০% এবং গোটা শরীর ফুলে যাওয়ার কথা বলেছে ০৫.০%। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রোগীদের রোগের লক্ষণগুলো ভিন্ন ভিন্ন। মাত্র ৬টি লক্ষণ সবার মধ্যে ছিল (কমন লক্ষণ)। বাকী লক্ষণগুলো কারও মধ্যে ছিল, কারও মধ্যে ছিল না। এর মানে রোগটা অনেকটাই আনপ্রেডিকট্যাবল।

সারণী ১

ফেব্রুয়ারি-আগষ্ট ২০১৭ সময়ে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তদের লক্ষণ অনুযায়ী বিভাজন

লক্ষণসমূহ	সংখ্যা	অংশ, %
১	২	৩
১। ১০৩°-১০৫° জ্বর	২০	১০০.০
২। হাত-পাসহ গোটা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে	২০	১০০.০
৩। হাত-পা ফুলেছে	২০	১০০.০
৪। গায়ে র‍্যাস উঠেছে	০৫	২৫.০
৫। গিরায় গিরায় ব্যথা হয়েছে	২০	১০০.০
৬। খাবারে অরুচি দেখা দিয়েছে	২০	১০০.০
৭। হাতের আঙ্গুল বাঁকা হয়ে গেছে	০২	১০.০
৮। মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে	০১	০৫.০
৯। মুখের ও চোখের ভেতরে র‍্যাস উঠেছে	০১	০৫.০
১০। হাতের তালু ও পায়ের পাতার চামড়া উঠেছে	০১	০৫.০
১১। সমস্ত শরীর কালো হয়ে গেছে	০২	১০.০
১২। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা	১২	৬০.০
১৩। ডান এর তুলনায় বাম হাত-পায়ের ব্যথা বেশী	০৩	১৫.০
১৪। বামের তুলনায় ডান হাত-পায়ের ব্যথা বেশী	০১	০৫.০
১৫। ভয়ানক ক্লান্তি	২০	১০০.০
১৬। হাত-পা জ্বালা করে ও চুলকায়	১৩	৬৫.০
১৭। মুখে, ঠোঁটে ও জিহবায় ঘা	০১	০৫.০
১৮। মাথার চুল পড়া	০১	০৫.০
১৯। গোটা শরীর ফুলে যাওয়া	০১	০৫.০

উৎস: প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত।

রোগের উপরে বর্ণিত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে সহজে বোঝা যায়, রোগটি অনেকটা প্রাণঘাতি না হলেও, যন্ত্রনায় শীর্ষে নিঃসন্দেহে। ভোগান্তির চিত্র আরও স্পষ্ট হবে রোগের স্থায়ীত্ব বিশ্লেষণে (সারণী-২)। সারণী-২ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ৩০.০% রোগী ১ থেকে ২ মাস পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিল, ৬০.০% ১ সপ্তাহ থেকে ১ মাস পর্যন্ত, আর বাকীরা অসুস্থ থাকলেও শয্যাশায়ী হতে হয়নি। বর্তমানে ১৫.০% সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে, আর ৮৫.০% আংশিকভাবে সুস্থ আছে, অর্থাৎ এদের কোন না কোন সমস্যা আছে। যেমন ৮৫.০% বলেছে শারীরিকভাবে দুর্বলতার কথা, ৫০.০% চলাফেরা করলে হাত-পা ফোলা ও ব্যথার কথা বলেছে এবং ১৫.০% বলেছে হাত-পা ফোলে এবং হাত-পা ও কোমরে ব্যথা হয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রোগীদের বয়স কাঠামো (সারণী-৩)। মজার ব্যাপার হলো, আমাদের নমুনায় আমরা সব বয়সের রোগী পেয়েছি। সারণী-৩ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ০৫.০% রোগীর বয়স ছিল ১৫ বছরের নীচে, ২০.০% এর ৩০ এর নীচে ও ১৫ এর উপরে, ৩৫.০% এর ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে, ১৫.০% ৪৫ থেকে ৬০ এবং ২৫.০% ৬০ থেকে ৭৫ বছর বয়সী। আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কম বয়সীরা (৪০ এর নীচে যাদের বয়স) তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু,

সারণী ২

রোগের স্থায়ীত্ব অনুযায়ী চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তদের বিভাজন, ফেব্রুয়ারি-আগষ্ট ২০১৭ সময়ে

দফাসমূহ	সংখ্যা	অংশ, %
১	২	৩
১। স্থায়ীত্ব যার মধ্যেঃ	০৬	৩০.০
ক) ১-২ মাস **শয্যাশায়ী**		
খ) ১ সপ্তাহ-১ মাস **শয্যাশায়ী**	১২	৬০.০
গ) অসুস্থ কিন্তু **শয্যাশায়ী** নয়	০২	১০.০
২। বর্তমান অবস্থাঃ	০৩	১৫.০
ক) সম্পূর্ণ সুস্থ		
খ) আংশিক সুস্থ	১৭	৮৫.০
গ) শারিরীকভাবে বেশ দুর্বল	১৭	৮৫.০
ঘ) চলফেরা করলে হাত-পা ফোলে ও ব্যথা হয়	১০	৫০.০
ঙ) চলফেরা করলে হাত-পা ফোলে এবং হাত-পা ও কোমড়ে ব্যথা হয়	০৩	১৫.০

উৎস: প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত

সবার ক্ষেত্রে আবার তা ঠিক নয়। অন্তত দু'জন পাওয়া গেছে যাদের ভুগতে হয়েছে অনেক বেশী এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা তারা বর্তমানেও ভুগছে, যদিও পূর্বের তুলনায় কম। আর চল্লিশোর্ধরা পুরোপুরি ভাল হননি। তারা বর্তমানেও ভুগছেন, তবে পূর্বের তুলনায় কম। এসব রোগীদের অন্যান্য অসুস্থতা বিশেষ করে আর্থ্রাইটিস জাতীয় এবং বার্ধক্যজনিত কিছু জটিলতা রয়েছে। আর এ জন্যে তাদের ঔষধও খেতে হচ্ছে নিয়মিত। চিকুনগুনিয়া এদের পূর্ববর্তী জটিলতা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

সারণী ৩

ফেব্রুয়ারি-আগষ্ট ২০১৭ সময়ে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তদের বয়স কাঠামো

বয়স শ্রেণি	সংখ্যা	অংশ, %
১	২	৩
০০-১৫	০১	০৫.০
১৫-৩০	০৪	২০.০
৩০-৪৫	০৭	৩৫.০
৪৫-৬০	০৩	১৫.০
৬০-৭৫	০৫	২৫.০
মোট	২০	১০০.০

উৎস: প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত

আমরা রোগীদের কাছ থেকে কোথায় তাদেরকে মশায় কামড়িয়েছে এবং তারা কোন জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এ রকম তথ্য নিয়েছি (সারণী-৪)। সে অনুযায়ী শতকরা একশো ভাগ রোগী বলেছে, তাদেরকে ঢাকায় কামড়িয়েছে আর এলাকাভিত্তিক বণ্টনে দেখা গেছে, ৩৫.০% করে যথাক্রমে বরিশাল, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জের এবং ০৫.০% করে যথাক্রমে কুমিল্লা ও চাঁদপুরের বাসিন্দা। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে,

সারণী ৪

ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২০১৭ সময়ে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তদের এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান ।

কোন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা			কোথায় কামড়িয়েছে		
এলাকার নাম	সংখ্যা	অংশ,%	এলাকার নাম	সংখ্যা	অংশ,%
১	২	৩	৪	৫	৬
১। কুমিল্লা	১	০৫.০	ঢাকা	১	০৫.০
২। চাঁদপুর	১	০৫.০	ঐ	১	০৫.০
৩। ঢাকা	৭	৩৫.০	ঐ	৭	৩৫.০
৪। নোয়াখালী	১	০৫.০	ঐ	১	০৫.০
৫। পাবনা	৩	১৫.০	ঐ	৩	১৫.০
৬। ফরিদপুর	১	০৫.০	ঐ	১	০৫.০
৭। বরিশাল	২	১০.০	ঐ	২	১০.০
৮। রাজশাহী	২	১০.০	ঐ	২	১০.০
৯। সিরাজগঞ্জ	২	১০.০	ঐ	২	১০.০
মোট	২০	১০০.০		২০	১০০.০

উৎস: প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত।

আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসেই এডিস মশার কামড়ে তারা চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসা ও ব্যয়

ডাক্তাররা বলছেন, এ রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নেই। জ্বর নামানোর জন্যে প্যারাসিটামল জাতীয় স্বল্প মাত্রার ঔষধ খেলেই চলবে। যাদের অন্যান্য সমস্যা রয়েছে তাদেরকে ডাক্তারী পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন ও ফিজিওথেরাপী নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তবে ডাক্তারদের মধ্যেও এর চিকিৎসা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ ঔষধ সেবন করতে একেবারেই নিষেধ করেন এবং কেউ কেউ খেতে বলেন যন্ত্রণা উপশমের জন্যে। নমুনার ২০ জনের মধ্যে অন্তত একজন পাওয়া গেছে যিনি তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য চারজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ডাক্তাররা তাকে এন্টিবাইওটিক ও প্রেডনিসোলনসহ প্রায় ৬-৭ ধরণের ঔষধ দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় তার মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল। মুখে ঘা পর্যন্ত হয়েছিল। শারীরিক ক্ষতি ছাড়াও তার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে উল্লেখ করার মত, প্রায় ৪০ হাজার টাকা। রোগীটি ২৯ বছর বয়সী একজন মহিলা। তিনি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করেন। মাত্র ২ সপ্তাহ ছুটি পেয়েছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই অফিস করেছেন। কারণ আর ছুটি দেবে না কর্তৃপক্ষ। আর একজন রোগী পাওয়া গেছে যিনি একজন ভাল মহিলা ডাক্তার। চাকুরী করেন একটি নাম করা হাসপাতালে। তিনি প্রায় ২ মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাকে ছুটি দিয়েছিল। এখনও তার শরীর ভাল না। আর একজন রোগী পাওয়া গেছে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক (লেখক স্বয়ং)। তিনি কমপক্ষে চারজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হন তীব্র ব্যথা থেকে মুক্তির জন্যে। তাকেও প্রেডনিসোলনসহ বেশ কয়েক ধরণের ঔষধ দেয়া হয়।

কিন্তু, কাজে আসেনি তেমন। প্রেডনিসোলন খাওয়ার পর ব্যথা ও ফোলা কমেছিল। ১২ দিনের কোর্স শেষে ঔষধ বন্ধ করার পর ফের পূর্বের অবস্থা শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ ব্যথা ও ফোলা আবার শুরু হয়। এতে

তার প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা বেড়িয়ে যায়। এভাবে দেখা যাচ্ছে, অর্ধেকের মত রোগী একাধিক ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন করেছে। কিন্তু কোনও উপকার পায়নি, বরং ক্ষতি হয়েছে। সর্বনম্ন ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে তাদের। মানসিক ক্ষতিটা আর্থিক ক্ষতির চেয়ে বেশী, আর স্বাস্থ্যহানি তো রয়েছেই। ৪০ শতাংশ বলেছেন, তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে এবং মানষিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব।

চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে করণীয়

আমাদের দেশ ঘন বসতির দেশ। আর চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাসবাহী রোগ। এডিস মশা এই ভাইরাস বহন করে একজন থেকে আরেক জনকে কামড়িয়ে এ রোগ ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। কাজেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না তুললে এ রোগটি এখানে মহামারী আকার ধারণ করতে পারে অতি সহজেই। এ রোগটি নির্মূল করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি:

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: যেহেতু আপাতত ঢাকা শহর থেকেই রোগটি ছড়াচ্ছে, সেহেতু ঢাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে সমঝোতার ভিত্তিতে। কারণ এটা নৈতিকতার প্রশ্ন; ডাক্তাররা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তারাই সিটি কর্পোরেশনকে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। পাড়ায়, মহল্লায় ও ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। কাউন্সিলরদের এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। ১৫ দিন পর পর প্রত্যেকটি বাড়ীর চারপাশ ও ছাদে অভিযান চালাতে হবে। এ কাজে কোনো প্রকার গাফিলতি সহ্য করা যাবে না। প্রয়োজনে এ কাজে বরাদ্দ চাইতে হবে, দিতে হবে।

২। টাস্কফোর্স গঠন বা পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন: সরকার একটি আইনি ভিত্তি দিয়ে পৃথক একটি কর্তৃপক্ষ বা টাস্এফার্স গঠন করতে পারে যাদের জন্যে পৃথক বরাদ্দ দিতে হবে। জনস্বাস্থ্য বলে কথা। বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকিতে, মানসিক ক্ষতির শিকার, লক্ষ লক্ষ কর্মঘণ্টা নষ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

৩। সর্বব্যাপী প্রচার চালাতে হবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। যেকোনো মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করতে এটা হবে গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

৪। ইদানিং ছাদ-বাগানের খুব প্রচলন হয়েছে। ঢাকার মেয়ররা এটাকে উৎসাহিতও করেছেন। তবে মশাবাহিত রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে এ ছাদ বাগান। এ ব্যাপারে মানুষকে ভালোভাবে সতর্ক করতে হবে যেন ছাদে কোথাও পরিষ্কার পানি জমে না থাকে।

উপসংহার

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জাতির উন্নতি বা অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। আমাদের দেশ বেশ জনবহুল। ঢাকা শহরে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস। আরও এক কোটি মানুষ সারাদেশ থেকে প্রতিদিন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা কাজে ঢাকায় আসে-যায়। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্র তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ভাবতেই হবে। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। অবহেলার সুযোগ নেই। অতএব, মশাবাহিত রোগের প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অতি উত্তম। স্বাস্থ্যবান জাতির জন্য চাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ।

তথ্যসূত্র

1. Caglioti C.; Lalle E.; Castilletti F.; Capbianchi M.R.; Bordi L. (July 2013) : "Chikungunya Virus : an overview", The New Microbiologica, 36 (3): 211-27.

2. Simon Fabrice; Jevelle Emile; Oliver Manuela; Leparc-Goffart Isabelle; Marimoutou Catherine (6 April 2011); "Chikungunya Virus Infection". Current Infections Disease Reports. 12 (3): 218-228.

3. Internet.

৪. দৈনিক প্রথম আলো।

৫. দৈনিক সমকাল।

6. The Daily Star.

Footnoting and writing style of the Bangladesh Journal of Political Economy

1. The Bangladesh Journal of Political Economy will be published in June and December each year.
2. Manuscripts of research articles, research notes and reviews written in English or Bangla should be sent in triplicate to the Editor, The Bangladesh Journal of Political Economy, Bangladesh Economic Association, 4/c Eskaton Garden Road, Dhaka-1000, Bangladesh.
3. An article should have an abstract preferably within 150 words.
4. Manuscript typed in double space on one side of each page should be submitted to the Editor. Submission of electronic version is encouraged.
5. All articles should be organized generally into the following sections: a) Introduction: stating the background and problem; b) Objectives and hypotheses; c) Methodological issues involved; d) Findings; e) Policy implications; f) Limitations, if any; and g) Conclusion (s).
6. The author should not mention his/her name and address on the manuscript. A separate page bearing his/her full name, mailing address and telephone number, if any, and mentioning the title of the paper should be sent to the Editor.
7. If the article is accepted for publication elsewhere, it must be communicated immediately. Otherwise, the onus for any problem that may arise will lie on the author.
8. The title of the article should be short. Brief subheadings may be used at suitable points throughout the text. The Editorial Board reserves the right to alter the title of the article.
9. Tables, graphs and maps may be used in the article. Title and source(s) of such tables should be mentioned.
10. If the Editorial Board is of the opinion that an article provisionally accepted for publication needs to be shortened or particular expressions deleted or rephrased, such proposed changes will be sent to the author of the article for clearance prior to its publication. The author may be requested to recast any article in response to the review thereof by any reviewer.
11. The numbering of notes should be consecutive and placed at the end of the artile.
12. Reference in the text and in the Reference list at the end of article should follow it as below:

   i. Book (one or more authors)

   - Start your full reference with the last name of the author(s) so it connects with the citation; then give initials or first name(s) of the author(s).
   - Year of publication comes next.

- Next, give the title of book: in italics or underlined (but be consistent throughout your list of references).
- Finally, give the place of publication and name of publisher.

Example

In-text citation:

(Wilmore 2000)

(Just cite the last name(s) of writer(s) and the year the book was published).

Full reference:

WILMORE, G.T.D. (2000). *Alien plants of Yorkshire.* Kendall: Yorkshire Naturalists' Union.

ii. Chapter from an edited book

- Start with the full reference entry with the last name of the chapter's author, followed by initials, then state year of publication.
- Then give name (s) of editor(s). The last name of an editor precedes his or her initials, to distinguish editor(s) from the name of the writer of the chapter. Indicate single editor by an abbreviation: (Ed.), or editors: (Eds.).
- State full title of book - in italics or underlined. It is helpful to then give a chapter number.
- Finally, give place of publication and name of publisher.

Example

Citation:

(Nicholls 2002)

(Cite the name of the writer of the chapter or section in the edited book).

Full reference:

NICHOLLS, G. (2002). Mentoring: the art of teaching and learning. In P. JARVIS (Ed.) *The theory and practice of teaching,* chap. 12. London: Kogan Page.

iii. Referencing journal articles

- Start with the last name of the author of the article and initials of author.
- Year of publication.
- Title of article (this can go in inverted commas, if wished).

- Name of the journal or magazine (in italics or underlined).
- Volume number and part number (if applicable) and page numbers.

References to journal articles dojroMnclude the name of the publisher or place of **publication** unless there is more than one journal with the same title, e.g. ***International Affairs (Moscow)*** *and* ***International Affairs*** (London).

Example

Citation:

(Bosworth and Yang 2000).

Reference:

BOSWORTH, D. and D. YANG (2000). Intellectual property law, technology flow and licensing opportunities in China. **Internationa! Business Review,** vol. 9, no. 4, pp.453-477.

The abbreviations, 'vol.' (for volume), 'no.' (for number) and 'pp' (for page numbers) can be omitted. However for clarity and to avoid confusing the reader with a mass of consecutive numbers, they can be included, but be consistent. Note how, in the example above, the initials of the first author follows his last name (Bosworth, D.), but precede the second named (D. Yang). This is the practice illustrated by British Standard in their guidelines with Harvard and both numerical-referencing styles, although you may find the guidelines at your institution may differ on this point.

iv. Example of referencing an electronic source

Example

Citation:

(Djxons Group 2004)

Reference:

D1XONS GROUP PLC (2004). ***Company report: profile.*** [Accessed online from Financial Analysis Made Easy (FAME) database at http://www.bvdep.com/en/FAME. html 13 Dec. 2005].

13. Reference mentioned in the text should be arranged in alphabetical order and provided at the end of the article.
14. The Bangladesh Economic Association shall not be responsible for the views expressed in the article, notes, etc. The responsiblity of statements, whether of fact or opinion, shall lie entirely with the author. The author shall also be fully responsible for the accuracy of the data used in his/her manuscript.
15. Articles, not accepted for publication, are not returned to the authors.
16. Each author will receive two complimentary copies of The Bangladesh Journal of Political Economy and 25 off-prints.

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

Bangladesh Economic Association
4/C, Eskaton Garden Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 934 5996, Fax : 880-2-934 5996
E-mail : bea.dhaka@gmail.com
Website : www.bea-bd.org